দেশভাগঃ স্মৃতিকথায় আত্মপরিচয়ের সন্ধান

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে পিএইচ.ডি উপাধির
শর্তপূরণে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

দেবযানী সেনগুপ্ত

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ডঃ সৌমিত্র বসু

প্রাক্তন অধ্যাপক, নাটক বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল অফ আর্টস

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা – ৭০০০৩২

২০২২

Certified that the Thesis entitled

দেশভাগ : স্মৃতিকথায় আত্মপরিচয়ের সন্ধান

Submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Prof. Soumitra Basu

And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

দেবযানী সেনগুপ্ত
17-12-2022

Countersigned by the Candidate:

Supervisor:

Dated: 17-12-2022

Dated: 17-12-2022

DR. SOUMITRA BASU
Sisir Kumar Bhaduri Professor
[illegible], Dept. of Drama
Rabindra Bharati University

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই গবেষণাকর্মটির জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক বিভাগ থেকে অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডঃ সৌমিত্র বসুকে। তাঁর অনুপ্রেরণা, উৎসাহ ও মূল্যবান পরামর্শ ছাড়া এই গবেষণাটি সম্ভব হতনা।

কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও অন্যান্য কর্মীদের — তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতার জন্য।

কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার প্রাক্তন কলেজ টাকি সরকারি মহাবিদ্যালয় ও বর্তমান কলেজ কন্যাশ্রী কলেজের সকল সহকর্মীকে তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য।

অধ্যায় বিভাজন

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা —	১-৯
বাংলা বিভাজন ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি : একটি বিধ্বস্ত সময়ের আখ্যান —	১০-৩৪
স্মৃতি, সত্য, সত্তা —	৩৫-৫১
বিষাদ ও বঞ্চনার স্মৃতি —	৫২-৮৭
আত্মসচেতন আত্মনির্মাণের স্মৃতি —	৮৮-১১৯
স্মৃতি ও সৃজন —	১২০-১৪৭
ডায়াস্পোরা ও দেশভাগের স্মৃতিকথা —	১৪৮-১৭০
উপসংহার —	১৭১-১৮৪
গ্রন্থতালিকা —	১৮৫-১৯০

ভূমিকা

বাংলাভাষায় 'দেশ' শব্দটি বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'দেশ'-এর একটি ব্যাখ্যা অবশ্যই ইউরোপ থেকে আগত। এক্ষেত্রে 'দেশ' মানে স্টেট-রাষ্ট্র, যা একটি রাজনৈতিক নির্মাণ এবং যা রাষ্ট্র নামক ভূখণ্ডে বসবাসকারী মানুষের একটি রাজনৈতিক পরিচয় নির্ধারণ করে। কিন্তু এছাড়াও 'দেশ' শব্দটি বাংলা ভাষাভাষী সাধারণ মানুষের কাছে একটি অন্য অনুভূতির সঙ্গেও সম্পৃক্ত। 'দেশ' মানে আজন্ম পরিচিত একটি অঞ্চল — যেখানে তার শেকড় প্রোথিত, যেখানকার প্রকৃতি, মানুষ, সমাজ-সংস্কৃতিতে তার বড় হয়ে ওঠা, যেখানে তার পূর্বপুরুষের ভিটা, যেখানে তার গৃহ। Rachel Weber বলেছেন "The concept of home conjures up images of family, warmth, security, emotion and stability."[1]। স্থায়ী নিবাস অথবা গৃহ যে অঞ্চলে, সেই অঞ্চলেই তাঁর সত্তার সম্পূর্ণ বিকাশ, তার সংলগ্নতা। 'দেশ' শব্দটির সঙ্গে যুক্ত থাকে মানুষের আত্মপরিচয়। সুতরাং বাঙালির কাছে দেশভাগ শুধুমাত্র রাষ্ট্রভাগ নয়, সেই চিরপরিচিত অঞ্চল ছেড়ে চলে যাওয়া। পরিচিত অঞ্চল ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে হলে তখন তার মনে অবশ্যই সংশয় জাগে। যেমন মান্টোর 'টোবা টেক সিং' গল্পের 'পাগল'দের মধ্যে প্রশ্ন জেগেছিল — কোথায় আছে হিন্দুস্তান? অথবা পাকিস্তান? মূল চরিত্রটি খুঁজছিল তার গ্রাম — তার আত্মপরিচয় — 'টোবা টেক সিং'। এটি কি গ্রামের নাম? অথবা মূল চরিত্রটির নিজের নাম? যাই হোক না কেন, সর্বস্ব যে তার হারিয়ে গেছে এবং সে তাই কেন্দ্রচ্যুত। সেই কেন্দ্রচ্যুত মানুষের আত্মসন্ধানকে কি পাগলামি বলে চিহ্নিত করা যায়? এই প্রশ্ন যাঁরা করেছিনেল, তাঁরা কি সত্যিই পাগল? প্রকৃতপক্ষে এই প্রশ্ন তীব্র যন্ত্রণায় কাতর ছিন্নমূল মানুষের অনির্ণীত অস্তিত্বের বেদনাকেই প্রকাশ করে। একদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষিত মানুষ — যাঁরা স্বাধীনতা-পূর্ব আধুনিক ভারতরাষ্ট্রের উত্থান সম্পর্কে অবহিত, দেশভাগের পর রাষ্ট্র-আনুগত্য ও জন্মভূমির সংলগ্নতার দ্বন্দ্ব তাঁদেরকেও দিশাহারা করেছিল। অন্যদিকে ভূমিসংলগ্ন জীবিকার মানুষরা হারিয়েছিল তাঁদের জীবিকা। দাঙ্গা ও তার আতঙ্ক যেমন তাঁদের মনে 'ট্রমা' তৈরী করেছিল, তেমনই বিতাড়িত হয়ে নতুন ভূমিতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামও ছিল তাঁদের ক্ষেত্রে ভয়াবহ।

বস্তুতঃ দেশবিভাজন ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে সবথেকে বড় মানবিক দুর্ঘটনা। কিন্তু অধুনা বাংলাদেশের মানুষের কাছে সেই দেশবিভাজন জাতিসত্তা আবিষ্কার ও নির্মাণের অনুঘটক ঘটনা। প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাস রাজনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে দেশবিভাজনের ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে সাধারণ মানুষের ব্যক্তিজীবনের বিষাদময় অভিজ্ঞতা, উদ্বাস্তু-চেতনা কোনকিছুই ধরা পড়ে না। ধরা পড়ে না ধর্ম-শ্রেণি-জাতপাত-লিঙ্গ ভেদে দেশভাগের 'হেতু' ও 'অভিঘাত'কে কে কেমনভাবে দেখেছেন, মনে রেখেছেন সেসব বিষয়ও। ব্যক্তিজীবনের এইসকল একান্ত অনুভূতির কথা ধরা পড়ে সাহিত্যে — অর্থাৎ গল্পে, উপন্যাসে, কবিতায়, স্মৃতিচারণায়। ভারতের পশ্চিম অঞ্চলের বিভাজনকে কেন্দ্র করে হিন্দী, উর্দু, ইংরাজীতে রচিত হয়েছে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস, গল্প, ইত্যাদি। কিন্তু পশ্চিমের সঙ্গে পূর্বপ্রান্তের দেশভাগবিষয়ক কথাসাহিত্যের একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। পশ্চিমের সাহিত্যে দাঙ্গা ও নৃশংসতার ভয়াবহ বাস্তব চিত্র উঠে এসেছে। কিন্তু পূর্বের সাহিত্য মূলতঃ বিষাদকাতর, নস্টালজিক। আবার কিছু গল্প ভেদাভেদের বাস্তবের ঊর্ধ্বে ভারসাম্যের আখ্যান হয়ে উঠতে চেয়েছে।

তবে পশ্চিমবঙ্গের বাংলাসাহিত্য দুর্ভিক্ষ নিয়ে যতটা কাতর, দেশভাগ নিয়ে ততোটা নয়। সুতরাং পূর্বপ্রান্তের দেশভাগ নিয়ে যে মহাকাব্য রচিত হওয়া উচিত ছিল, তা হয়নি। কিন্তু দেশভাগের অভিঘাত যে সাধারণ মানুষের জীবনে ছিল অতি তীব্র — সে সত্যকে তো অস্বীকার করা যায় না। দেশভাগ বদলে দিয়েছিল অসংখ্য উদ্বাস্তু মানুষের ব্যক্তিজীবনের ধারাকে এবং সামাজিক বিন্যাসকেও। আটের দশকে ঐতিহাসিক জ্ঞানেন্দ্র পান্ডে দেশভাগের 'হেতু' অপেক্ষা 'অভিঘাত'কে প্রাধান্য দিয়ে মানুষের দেশভাগ কেন্দ্রিক স্মৃতি সংগ্রহের উপর জোর দেন এবং এইভাবে দেশভাগের এক বহুমাত্রিক বয়ান নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ব্যক্তি মানুষের স্মৃতিচারণার মাধ্যমে তিনি দেশভাগকে দেখতে চেয়েছিলেন, তার কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন — "Part of my purpose is to underscore the point about how different the history of partition appears from different perspective."[2]। জ্ঞানেন্দ্র পান্ডে যে "Perspective" অর্থাৎ দৃষ্টিকোণের কথা বলেছেন, তা ধর্ম, শ্রেণি, জাত, লিঙ্গ, পেশা ভেদে স্বতন্ত্র

হয়ে যায়। বস্তুতঃ দেশভাগকে সামগ্রিকতায় ধরতে গেলে নিছক রাষ্ট্রবাদী ইতিহাসের আখ্যানের উপর নির্ভর করলে চলেনা। কারণ সেই বয়ান পরিসর ও প্রেক্ষিত অনুযায়ী উদ্বাস্তু-মনস্তত্ত্ব অথবা দৃষ্টিকোণের বহুমাত্রাকে বর্ণনা করতে পারে না। পক্ষান্তরে, স্মৃতিকথার মাধ্যমে ব্যক্তির, পরিবারের, বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর দেশভাগ সংক্রান্ত বিভিন্ন মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি, সংগ্রাম ও প্রাপ্তি, হারানোর বেদনা অথবা নতুন পরিস্থিতিতে নিজেদের নতুনভাবে গড়ে তোলার ভিন্ন ভিন্ন কাহিনি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে স্মৃতি সংগ্রহের মাধ্যমে দেশভাগ ও সত্তাপরিচয়ের সংকটকে বিভিন্ন পরিসরে দেখতে চাওয়া ও সেই অনুযায়ী জ্ঞানতাত্ত্বিক চর্চার ক্ষেত্র অনেকটাই প্রসারিত হয়ে গেছে। পূর্বপ্রান্তে সেই তুলনায় দেশভাগের স্মৃতিকেন্দ্রিক চর্চা ও তাৎপর্যপূর্ণ গবেষণার কাজ খুবই কম। দেশভাগের বেশ কিছু বছর পরে অন্নদাশংকরের 'যুক্তবর্ণের স্মৃতি' অথবা মণিকুন্তলা সেনের আত্মকথা অথবা এরকম আরও কিছু গ্রন্থে অবধারিতভাবে এসেছে দেশভাগের প্রসঙ্গ। এছাড়াও গতশতকের শেষ থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত বাংলাভাষায় বেশ কিছু দেশভাগকেন্দ্রিক স্মৃতিকথা অথবা টুকরো স্মৃতিকথার সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। অধুনা বাংলাদেশের মানুষের দেশভাগ কেন্দ্রিক স্মৃতি সংগ্রহের প্রচেষ্টা অতি স্বল্প। তবে আবুল মনসুর আহমদ, মুজিবুর রহমান, শামসুর রাহমান, এবং আরও কিছু মানুষের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ থেকে দেশভাগের হেতু, অভিঘাত ইত্যাদি প্রসঙ্গে তাঁদের রাজনৈতিক অবস্থান অথবা ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতি ইত্যাদি জানা যায়। আলোচ্য গবেষণাতে ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্বপ্রান্তের মানুষের স্মৃতিতে দেশ, সমাজ ও জীবনের সেই ভাঙা গড়ার রাজনীতি কেমনভাবে ধরা পড়েছে তাই দেখতে চাওয়া হয়েছে। স্মৃতি অবশ্যই তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাস নয়, স্মৃতি থেকে ইতিহাস উদ্ধারও এই গবেষণাকর্মের উদ্দেশ্য নয়। স্মৃতি এইকারণে তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ স্মৃতির অন্তরালে অজ্ঞানে অথবা সজ্ঞানে একধরণের নির্বাচন ও নির্মাণ ক্রিয়াশীল থাকে। এই নির্বাচন ও নির্মাণের পিছনে কথকের গোষ্ঠীগত অবস্থান ক্রিয়াশীল থেকে তার বয়ানকে স্বতন্ত্র করে তোলে।

ব্যক্তির রাষ্ট্রপরিচয়, ধর্মপরিচয়, জাতি (Caste) ও লিঙ্গ পরিচয় অথবা শ্রেণিপরিচয়, এমনকি পেশাগত পরিচয়ও তার মানসিক গঠনকে নির্মাণ করে, তার রাজনৈতিক অবস্থানকে নির্ণয়

করে — যা তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ন্যারেশনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ছাপ রেখে যায়। সত্তার এই সকল সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয় দেশভাগকেন্দ্রিক বয়ানের বিশিষ্ট ভাষাভঙ্গিমাও গড়ে তোলে। ভারতীয় উপমহাদেশের বর্ণহিন্দু ও মুসলমান গোষ্ঠীর যে আত্মপরিচয়ের রাজনীতি দেশভাগের সলতে পাকানোর কাজ করেছিল, বাংলাভাষার স্মৃতিকথাচর্চার মাধ্যমে তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়। কারণ বাংলা উপন্যাস-ছোটগল্পের তুলনায় স্মৃতির ভাষ্য প্রত্যক্ষ এবং অভিজ্ঞতাও বাস্তব। সেইকারণেই ব্যক্তির স্মৃতিকথার বয়ানে নিরপেক্ষতা ও অ-নিরপেক্ষতার ভারসাম্য অথবা ভারসাম্যহীনতা প্রতিফলিত হয় এবং ব্যক্তিকে ছাপিয়ে তা বিভিন্ন গোষ্ঠীর সামাজিক সম্পর্ককে আভাসিত করে তোলে। সুতরাং স্মৃতিকথায় আত্মসত্তা রাজনীতির আলোচনাটি একান্তভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

স্মৃতিচারণার সঙ্গে সত্তাপরিচয়ের সম্পর্ক নিয়ে দীপেশ চক্রবর্তী প্রথম আলোচনার সূত্রপাত করেন। দেশভাগের অব্যবহিত পরে ১৯৫০ সালে ''যুগান্তর পত্রিকায়'' দেশভাগ বিষয়ক কতকগুলি সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণা প্রকাশিত হয়েছিল। সেই স্মৃতিকথাগুলিই ১৯৭৫ সালে ''ছেড়ে আসা গ্রাম'' নামক গ্রন্থরূপে আত্মপ্রকাশ করে। দীপেশ চক্রবর্তী গ্রন্থটির আলোচনা করেছেন ইংরেজী ভাষায় লেখা অত্যন্ত মূলবান একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধতে। উক্ত প্রবন্ধটিতে তিনি বর্ণহিন্দুদের দেশভাগের স্মৃতিচারণার রাজনৈতিক অভিপ্রায়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। বাংলাভাষায় সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ''দেশভাগ স্মৃতি আর সত্তা'' গ্রন্থটিতে অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে স্মৃতি ও সত্তার সম্পর্কটি উল্লেখ করে এ বিষয়ে কিছু সূত্র নির্দেশ করতে চেয়েছেন মাত্র। সেমন্তী ঘোষ সম্পাদিত ''দেশভাগ স্মৃতি আর স্তব্ধতা'' গ্রন্থে অধ্যাপক বিশ্বজিৎ রায় ''ইতিহাসে পরিগ্রহণ : দেশভাগের স্মৃতিকথা'' প্রবন্ধে বহুত্ববাদী ইতিহাসচর্চার সঙ্গে দেশভাগের স্মৃতিচারণার সম্পর্কটি নির্ণয় করতে চেয়েছেন এবং সেই প্রেক্ষিতে দু-একটি স্মৃতিকথার প্রয়োগকৌশলকে অতি সংক্ষেপে বুঝতে চেয়েছেন। বিশ্বজিৎ রায়ের আলোচনা মূলত: তাত্ত্বিক, প্রায়োগিক নয়। অর্থাৎ টেক্‌স্ট হিসেবে স্মৃতিকথার আলোচনা ও তার সঙ্গে আত্মপরিচয়ের সম্পর্ক সন্ধান এবং এইভাবে দেশভাগের বহুমাত্রিক বয়ানকে নিয়ে বিস্তৃত গবেষণাধর্মী আলোচনা বাংলা ভাষায় ইতিপূর্বে হয়নি। জাত-পাত, শ্রেণি, লিঙ্গ, পেশা অথবা রাজনৈতিক মতাদর্শ ভেদে দেশভাগের স্মৃতিকথাগুলিতে আত্মপরিচয়ের

সন্ধান এই গবেষণাটির উদ্দেশ্য।

এই গবেষণাকর্মটিতে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সঙ্গে তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তান অথবা অধুনা বাংলাদেশের স্মৃতিকেও আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের স্মৃতিও সমসত্ত্ব নয়। বর্ণভেদে, পেশাভেদে, রাজনৈতিক আদর্শ ও লিঙ্গভেদে দেশভাগের প্রতিক্রিয়া স্বতন্ত্র। আবার পূর্ববাংলাতেও একই রকমভাবে বিভিন্ন স্বর স্মৃতিকথাতে ধরা পড়েছে। এপার বাংলার বয়ানে বিষাদ ও সংগ্রাম — প্রতিক্রিয়া সামগ্রিকভাবে মূলত নেতিবাচক। কিন্তু ওপার বাংলার মানুষ ১৯৪৭ থেকে ১৯৭২-এর ভিতর যেহেতু দুবার দেশভাগ হতে দেখেছেন, তাঁদের দেশভাগের স্মৃতিতে এক সচেতন আত্মনির্মাণের আনন্দ ধরা পড়ে এবং এইকারণেই বহুলাংশে তা ইতিবাচক। আবার ওপার বাংলায় থেকে গেলেন যে সকল ধর্মীয় সংখ্যালঘু, তাঁদের অভিজ্ঞতা বড়ই নির্মম। বস্তুতঃ ওপারে সংখ্যালঘুরা অথবা এপারের নিম্নবর্গ নিম্নবর্ণীয়রা সামাজিকভাবে প্রান্তীয় যেমন, তেমনই দেশভাগ বিষয়ক সাহিত্যতেও তারা প্রান্তীয় হয়েই থেকেছেন। আলোচ্য গবেষণা কর্মে তাই পশ্চিমবঙ্গে বর্ণহিন্দুর দেশভাগজনিত অভিজ্ঞতার সঙ্গেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে নিম্নবর্ণীয়দের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতাকে এবং বাংলাদেশের সংখ্যালঘু শ্রেণির সংকটের স্মৃতিকে। নারীর স্মৃতির বয়ানকেও বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। নারীর স্মৃতির বয়ানে নারী কেমনকরে শুধুমাত্র বিষয় হয়ে না থেকে বিষয়ী হয়ে উঠেছে, কেমনভাবে দেশভাগের স্মৃতিচারণায় নারীর নিজস্ব স্বর প্রকট হয়ে উঠেছে — সেই বিষয়টি নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

কিন্তু মনে রাখা দরকার প্রতিটি স্মৃতির নির্দিষ্ট সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান রয়েছে। প্রতি অবস্থান থেকে প্রতিটি স্বতন্ত্র স্বরকে প্রাধান্য দিয়ে আলোচ্য গবেষণাকর্মটি দেশভাগের বহুমাত্রিক জটিল রূপটিকে তুলে ধরতে চেয়েছে। উপনিবেশ স্থাপনের পূর্বে ভারতে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের যে সমান্তরাল অবস্থান উপমহাদেশের ভূমিতে ছিল, বিশশতকের প্রতিযোগিতামূলক ভোটের রাজনীতি ক্রমশঃ সেই গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়গুলিকেই আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতিযোগী করে তুলেছিল। দেশভাগের স্মৃতিকথাগুলিতেও উপনিবেশের সেই অপ্রীতিকর প্রভাব প্রবাহিত হয়ে এসেছে। সুতরাং স্মরণকর্তার বিশেষ অবস্থান থেকে তাঁর স্মৃতির বয়ানে ‘দেশ’, জাতীয়তাবাদ, উদ্বাস্তু জীবন, আত্মপরিচয় অথবা তার সংকটের অভিব্যক্তিগুলি

কেমনভাবে ধরা পড়েছে তা এই গবেষণাকর্মটিতে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করা হয়েছে। দেশভাগের রাষ্ট্রবাদী মহাআখ্যানকে সরিয়ে দিয়ে জটিল ও পরস্পরবিরোধী বহুমাত্রিক স্বরকে প্রাধান্য দিয়ে দেশভাগের 'হেতু' ও 'অভিঘাত' — উভয়ক্ষেত্রেই আত্মসত্তা রাজনীতির জটিল নকশাটিকে এইভাবে উজ্জ্বল করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। রাজনীতি শুধুমাত্র যে সামাজিক স্তরে আবদ্ধ থাকে না, ব্যক্তির নিজস্ব একান্ত অনুভূতি ও পর্যবেক্ষণকেও যে কম-বেশি প্রভাবিত করে — দেশভাগের স্মৃতিকথাগুলি সেই সত্যের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করে।

গবেষণাকর্মটিতে ভারতের পূর্বপ্রান্তের দেশভাগকেন্দ্রিক বহুমাত্রিক স্মৃতি ও স্মৃতিতে আত্ম পরিচয়ের প্রকাশ ও সংকট এই বিষয়টিকে সমস্যায়িত করা হয়েছে। এই গবেষণাকর্মটির অভিমুখ যেমন সমাজ থেকে ব্যক্তির দিকে, তেমনই ব্যক্তির থেকে সমাজের দিকেও। দেশভাগকেন্দ্রিক স্মৃতির চর্চায় তাই অবশ্যই মূল্য দিতে হয় দেশভাগের সামাজিক কারণগুলিকে। অথবা অবশ্যই চর্চার বিষয় হওয়া উচিত রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাঙালির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনেও কিভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল — সেই বিষয়টি। ব্যক্তি ও সমাজের সমবায়েই তো গড়ে ওঠে সাহিত্য এবং ব্যক্তির সত্তাপরিচয় স্বরূপে বোঝা সম্ভব নয়, যদি তার সামাজিক প্রেক্ষাপটের ইতিহাস পাঠ করা না হয়। বস্তুতঃ দেশভাগের কারণ যে সামাজিক ভেদবুদ্ধি — তা প্রকট হয়ে উঠেছিল ১৯০৫ সালের প্রথম বঙ্গভঙ্গ বিভাজনের সময় থেকেই। বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানের প্রতিস্পর্ধী রাজনৈতিক চেতনার উগ্রতা এরপর ক্রমশঃ বেড়েছে — ব্যতিক্রমী দু-একজন রাজনৈতিক নেতার সদর্থক সমাধান সন্ধান ছাড়া এই সমস্যা সমাধানের কোন উদ্যোগ রাজনৈতিক স্তরে দেখা যায় নি। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মুসলমান কৃষকের হিন্দু জমিদারের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-আন্দোলন। পারস্পরিক গোষ্ঠী-বিরূপতার মনোভাব থেকে স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ের বিখ্যাত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিরাও মুক্ত থাকতে পারেননি। দেশভাগের 'হেতু'র ইতিহাসকে এইভাবে না পাঠ করলে স্মৃতিকথায় আত্মসত্তার রাজনীতির সঠিক বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। আধিপত্যমূলক বয়ানের পাশে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ভেদবুদ্ধির এইরূপ ইতিহাসের বয়ান এক ভিন্ন তাৎপর্য বহন করে।

স্মৃতিকথা নিয়ে চর্চা করার ক্ষেত্রে একটি অসুবিধা হ'ল স্মৃতি তো আপেক্ষিক। সুতরাং স্মৃতির

ভাষ্যে কতটুকু সত্য এবং কতটুকু অতিরিক্ত এই প্রশ্নটি এসে যায়। যেহেতু নিছক ইতিহাস রচনা এই গবেষণা সন্দর্ভের উদ্দেশ্য নয়, সেইহেতু স্মৃতিকথার কোন্ অংশ তথ্য অনুযায়ী, কোন্ অংশ নয় — এই বিচার এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। পরন্তু বিশ্লেষণ করা দরকার, স্মৃতিকথা বর্ণনার ভঙ্গিটিকে। সত্য অথবা সত্যের অতিরিক্ত — যাই বিবৃত হোক না কেন, তার পিছনে সক্রিয় স্মরণকর্তার গোষ্ঠী-অবস্থানগত অভিপ্রায়টিকে বোঝা দরকার। সুতরাং এইরূপ বিশ্লেষণের জন্য অবশ্যই প্রয়োজন হয়ে পড়ে স্মৃতি, সত্য ও সত্তার সম্পর্ক নির্ণয়।

স্মৃতি ইতিহাসের নির্ভুল সাক্ষ্য নয়, স্মৃতিতে কল্পনার মিশেল থাকে। তাহলে এখানে একটি অবশ্যম্ভাবী প্রশ্ন ওঠে স্মৃতিকথা কি একপ্রকার সৃজন? কারণ সৃজনশিল্পের মূল প্রেরণা কল্পনা। কিন্তু সে কল্পনা সত্য-বিগর্হিত নয়, বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীনও নয়। বিশেষত দেশভাগকেন্দ্রিক বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পের কথা যদি ভাবি তাহলে দেখবো তার অভিমুখও স্মৃতি থেকে কল্পনার দিকে। কারণ দেশভাগ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। সেই ঘটনার পরে যিনি কল্পনার আশ্রয় নিয়ে আখ্যান রচনা করছেন — তাঁর স্মৃতি থেকেই যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও মানবিক সত্যের উপাদানগুলিকে সংগ্রহ করা হয়েছে — সে কথা বলাই বাহুল্য। ইতিহাস রাজনৈতিক ও সামাজিক সত্য বলে, গোষ্ঠীর জীবন বর্ণনা দেয়। সাহিত্য সেই ভিতের উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে এবং এক্ষেত্রে সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত অভিপ্রায় নিয়ন্ত্রিত সৃজনশীল কল্পনাই হয়ে ওঠে প্রধান কারিগর। স্মৃতিকথা-ও তো ব্যক্তিরই বাচন। কিন্তু ব্যক্তির সত্তানির্মাণ যেহেতু বিভিন্ন গোষ্ঠীসত্তার মিথষ্ক্রিয়ায় ঘটে, যেহেতু ব্যক্তির সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান তার দৃষ্টিভঙ্গির নৈতিক পরিসরটিকে নির্মাণ করে, সেইহেতু সাহিত্যের সঙ্গে এবং স্মৃতিকথার সঙ্গেও ইতিহাসের সংযোগ স্থাপিত হয়ে যায়। সুতরাং স্মৃতিকথায় সত্তাপরিচয়ের যে প্রসঙ্গ এই গবেষণাকর্মের মূল কেন্দ্রবিন্দু, তাকে বুঝতে গেলে স্মৃতিকথার পাশে দেশভাগের ছোটগল্প ও উপন্যাসের তুলনামূলক আলোচনাকেও সন্দর্ভের অঙ্গীভূত করা দরকার। সমালোচকের উক্তি এই প্রসঙ্গে এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে — "Both memoirs and fiction together articulate the totality of experience by combining the creative and confessional modes of expressions."[3]। সুতরাং দেশভাগকেন্দ্রিক উপন্যাস-ছোটগল্পের সঙ্গে স্মৃতিকথাগুলির সম্পর্ক আলোচনা না করলে

স্মৃতিকথাচর্চা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

বস্তুত দেশভাগ উদ্বাস্তু-চেতনা, রাষ্ট্র, জাতীয়তাবোধ প্রভৃতি আধুনিক ধারণাগুলি সম্পর্কে কতকগুলি মৌলিক প্রশ্ন তোলে। আধুনিক পৃথিবীতে এই প্রশ্নগুলি এখন বিশেষভাবে আলোচিত। সভ্যতার আদিকাল থেকে মানুষ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গাতে স্থানান্তরিত হয়। মধ্যযুগে ব্যবসায়ীরা ব্যবসার প্রয়োজনে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেত। রেনেসাঁ পরবর্তী সময়ে ইউরোপের বণিকরা নিজভূমি ত্যাগ করে ছড়িয়ে পড়েছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে এমনকি ভারতেও। আবার উপনিবেশ স্থাপনের পর বিজিত দেশ থেকে ক্রীতদাসদের তারা নিয়ে গেছে অন্যত্র শ্রমদানের জন্য। বর্তমান সময়ে ভারত উপমহাদেশ থেকে উচ্চাকাঙ্খী মানুষজন নিজের দেশ ছেড়ে উন্নত দেশগুলিতে গিয়ে নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন উন্নতর জীবনের আকাঙ্খায়। আধুনিক যুগে সমাজতাত্ত্বিকরা অভিবাসী এই সকল মানুষদের আত্মপরিচয় কেন্দ্রিক সংকটকে নিয়ে মূল্যবান আলোচনা করেছেন। এইভাবে আধুনিক জ্ঞানতাত্ত্বিক চর্চায় ডায়াস্পোরা থিয়োরী অথবা অভিবাসন তত্ত্ব প্রয়োজনীয় জায়গা করে নিয়েছে। অভিবাসী চেতনাকে জানবার ও বুঝবার জন্য সর্বাপেক্ষা বড় অবলম্বন অভিবাসী সাহিত্য — যা সৃষ্টি হয়েছে অভিবাসিত মানুষদের দ্বারাই। ভারতীয় বংশোদ্ভূত বেশ কয়েকজন উল্লেখযোগ্য অভিবাসী সাহিত্যস্রষ্টা আছেন। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অমিতাভ ঘোষ, ঝুম্পা লাহিড়ী। অমিতাভ ঘোষ প্রথম প্রজন্ম যিনি স্থানান্তরিত হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে, ঝুম্পা লাহিড়ী দ্বিতীয় প্রজন্ম — তাঁর বাবা ও মা পশ্চিমবঙ্গ থেকে পশ্চিমী দেশে প্রবাসী হয়েছিলেন। এঁদের লেখায় দেখবো ইউরোপ আমেরিকার সংস্কৃতি এবং পশ্চিমবঙ্গীয় বাঙালি সংস্কৃতি কেমনভাবে অভিবাসী মানুষদের মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব তৈরী করে, কেমনভাবে আত্মপরিচয়ের সংকট অভিবাসী চেতনার প্রধান লক্ষণ হয়ে ওঠে — এইসব। দেশভাগের পরে অসংখ্য মানুষ স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে ভয়ংকর দাঙ্গার পরে শিখ ও মুসলমান জনসংখ্যার সামগ্রিক বিনিময় হয়েছিল। পূর্বপ্রান্তে কিন্তু পূর্বপাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু আগমন দেশভাগের পরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বছর পর্যন্ত খুব বেশি সংখ্যায় হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকেও দেশভাগের পর বাঙালি মুসলমানরা পূর্বপাকিস্তানে চলে গেছেন। নিজ সত্তার সংলগ্নতা যে ভূমির সঙ্গে, সেই ভূমিকে ত্যাগ করে গিয়ে এই উদ্বাস্তু মানুষগুলির ভিতরেও

শেকড়হীনতা, অনিশ্চয়তা, বিচ্ছিন্নতার একটা বোধ তৈরী হয়েছিল — যা তাদের ভিতরেও একধরনের সত্তা পরিচয়ের সংকট তৈরী করেছিল। যদিও স্বেচ্ছায় স্থানান্তরিত মানুষদের সঙ্গে বিতাড়িত মানুষদের সত্তাসংকটের মৌলিক পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। দেশভাগের ফলে উদ্বাস্তু চেতনার আত্মপরিচয়ের সংকটকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করার জন্য অবশ্যই অভিবাসন তত্ত্ব অথবা অভিবাসন সাহিত্যের প্রসঙ্গ ও সত্তাপরিচিতির সংকটজনিত তুলনা আলোচনায় প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে একটি বড় প্রশ্ন হল দেশভাগকেন্দ্রিক লেখাগুলি, তা সে স্মৃতিকথাই হোক অথবা উপন্যাস - ছোটগল্পই হোক — সেগুলিকে কি অভিবাসী সাহিত্য হিসেবে আখ্যা দেওয়া যায়? অথবা দেশভাগের সাহিত্য — এইভাবে একটি স্বতন্ত্র প্রকরণ হিসেবে ভেবে নিয়ে আখ্যানগুলির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা দরকার কি? এইসব আবশ্যিক ও জটিল প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করা হয়েছে এই গবেষণা কর্মটিতে।

তথ্যসূত্র

1. Rachel Weber, “Re (Creating) the Home : Women’s Role in the Development of Refugee Colonies in South Calcutta”, *The Trauma and the Triumph,* Edt.- Jasodhara Bagchi and Subhoranjan Dasgupta, Stree, Kolkata, 2007, P-62
2. Gyanendra Pandey, *Remembering Partition,* Cambridge University Press, Cambridge, 2001, P-5.
3. Jasodhara Bagchi, and Subhoranjan Dasgupta, “Introduction” *The Truama and the Triumph,* ??? Stree, Kolkata, 2007.

বাংলা বিভাজন ও আত্মসত্তার রাজনীতি ঃ একটি বিধ্বস্ত সময়ের আখ্যান

প্রাক-ঔপনিবেশিক পর্বে বঙ্গদেশে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ অথবা দাঙ্গা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। কারণ সেই সময়ে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক এত সংঘাতময় ছিল না। কিন্তু উনিশ শতকের শেষ অথবা বিশ শতকের প্রথম থেকে বাংলায় হিন্দু মুসলমান গোষ্ঠী ক্রমশঃ পরস্পরের প্রতিস্পর্ধী শক্তি হয়ে উঠছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ঔপনিবেশিক শাসনপ্রণালী ভারত তথা বাংলায় সম্প্রদায় হিসেবে ধর্মের নতুন বোধ জাগিয়ে তুলেছিল শাসিত সাধারণ মানুষের মনে। এর ফলে ক্রমশঃ বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর মধ্যে — বলা ভাল, মূলতঃ হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘর্ষমূলক সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। শিক্ষা, চাকরি, সরকারি সুযোগ সুবিধা, স্থানীয় স্বশাসনমূলক সংস্থায় প্রতিনিধিত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারি নথি অনুযায়ী বঙ্গদেশের মুসলমানরা যেহেতু অনগ্রসর ছিল, সেইহেতু উনিশ শতকের শেষ থেকেই বাংলার মুসলমানরা নিজেদের বঞ্চিত ভাবতে শুরু করে।

মনে রাখতে হবে উনিশ শতকের বাংলায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে হিন্দু জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক চেতনা ক্রমশঃ সংহত হয়ে উঠেছিল, তার ভিত্তি ছিল এক সমসত্ত্ব হিন্দু জাতির ঐতিহ্যময় ইতিহাসবোধ-যা কল্পনা করেছিলেন তদানীন্তন হিন্দু চিন্তানায়করা। কিন্তু বাস্তবে, হিন্দুরা কোন সমসত্ত্ব সম্প্রদায় ছিল না, জাত-পাতের ভিত্তিতে হিন্দুসমাজ ছিল বহুধা বিভক্ত। ঠিক একইভাবে, ঔপনিবেশিক প্রভুরা জাতিগত বর্গীকরণের দ্বারা এক সমরূপ-সম্পন্ন মুসলমান সম্প্রদায়ের ধারণারও সৃষ্টি করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাংলার মুসলমান সমাজ তখনও এবং এখনও আশরাফ-আতরাফ, উর্দুভাষী-বাংলাভাষী, শাহরিক-গ্রামীণ প্রভৃতি বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। কিন্তু তবুও, উনিশ শতকের শেষ থেকে হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এবং উপনিবেশের প্রভুদের সৃষ্ট সম্প্রদায় ভিত্তিক ধর্ম পরিচয়ের দ্বারা চালিত হয়ে বাংলার মুসলমানরা একটি ধর্মীয় রাজনৈতিক সম্প্রদায় হিসেবে ক্রমশ সংহত হতে শুরু করে এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠে। বলা বাহুল্য, এই ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে তাদের

সবথেকে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল উচ্চবর্ণীয় হিন্দু 'ভদ্রলোক' শ্রেণি।

অন্যদিকে বৃটিশদের মূল উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু বাঙালির মধ্যে ক্রমশঃ প্রবল হয়ে ওঠা জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহী স্রোতধারাকে প্রতিহত করা এবং সেই রাজনৈতিক স্বার্থে মুসলমানদের জড়ো করা। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই বিশ শতকের প্রথমে লর্ড কার্জন বাংলা ভাগ করার পরিকল্পনা করেন। মুসলমান সংখ্যাধিক্য যে জেলাগুলিতে, সেগুলিকে নিয়ে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করার সরকারি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করেন লর্ড কার্জন। জাতীয়তাবাদী ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে ঔপনিবেশিক প্রভুদের এই দুরভিসন্ধির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ বাঙালির প্রবল প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের কথা। এই ইতিহাস থেকেই জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ হিন্দু ও মুসলমানের ঐক্যের কামনায় রাখিবন্ধন করেন। প্রচলিত ইতিহাসের বয়ানকে চরম ও একমাত্র সত্য বলে ধরে নিলে, অসাম্প্রদায়িক ঐক্যবদ্ধ বাঙালি সত্তার প্রেক্ষিতে ১৯৪৭-এর বাংলা বিভাজনকে আকস্মিক দুর্ঘটনা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এই বিভাজন আকস্মিক ছিল না কোনোভাবেই। বাস্তব সত্য এই যে পূর্ববঙ্গের উচ্চাকাঙ্খী বাঙালি মুসলমানরা ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের বিরোধী ছিলেন না, পরন্তু কার্জনের প্রস্তাবকে তাঁরা স্বাগত জানিয়েছিলেন। হিন্দু বাঙালির বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ তাঁদের কাছে পূর্ববঙ্গের মুসলমান স্বার্থ-বিরোধী হিসেবে প্রতিভাত হয়েছিল। আবুল মনসুর আহমদের স্মৃতিকথায় আছে — ''রাস্তার গাছে-গাছে বাড়ি-ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে ইংরাজীতে লেখা দেখি : 'ডিভাইড আস্ নট'। মুরুব্বিদের জিগ্‌গাসা করিয়া জানিতে পারি ওসব 'স্বদেশী' হিন্দুদের কাণ্ড। মুসলমানদের খেলাফে দুশমণি।''[1] বস্তুতঃ ১৯০৫ সালের পর থেকেই দেখবো, বাংলার হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক বিভেদীকরণ ও আত্মসত্তার রাজনীতি ক্রমশঃ প্রকট হয়ে ওঠে। এরপর থেকেই বিভিন্ন সময়ে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ শুরু হয় এবং এরই পরিণতিতে ঘটে ১৯৪৭-এর দেশভাগ ও বঙ্গবিভাজন।

রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের গভীর অসুখটিকে — যা বাংলার সামাজিক কাঠামোকে ক্ষয়প্রাপ্ত করে দিয়েছিল। বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক নিয়ে ১৯০৫-এর পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন প্রবন্ধে বক্তব্য রেখেছেন। ১৯১৪ সালে 'লোকহিত'

প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন — ''হিন্দু মুসলমানের পার্থক্যটাকে আমাদের সমাজে আমরা এতই কুশ্রীভাবে বেআব্রু করিয়া রাখিয়াছি যে কিছুকাল পূর্বে স্বদেশি অভিযানের দিনে একজন হিন্দু স্বদেশি প্রচারক এক গ্লাস জল খাইবেন বলিয়া তাহার মুসলমান সহযোগীকে দাওয়া হইতে নামিয়া যাইতে বলিতে বিন্দুমাত্র সংকোচবোধ করেন নাই।''[2] শুধুমাত্র অসম্পৃশ্যতাই নয়, হিন্দু-ভদ্রলোক শ্রেণির সামাজিক ও রাজনৈতিক আধিপত্যবিস্তার যে সাধারণ মুসলমান ও নিম্নশ্রেণির হিন্দুদেরও ক্ষোভের কারণ হয়ে উঠছিল — তাও তিনি বুঝেছিলেন। উচ্চবর্ণীয় হিন্দু-শ্রেণির ক্ষমতার অহংকারই ছিল বয়কট আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক নেতিবাচক শক্তি। এ প্রসঙ্গে বঙ্গভঙ্গের কয়েকবছর পরেই তিনি লিখেছেন — ''আমরা বয়কট-ব্যাপারটাকেই এত একমাত্র কর্তব্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম, যে-কোনোপ্রকারেই হোক, বয়কটকে জয়ী করিয়া তোলাতেই আমাদের সমস্ত জেদ এত বেশিমাত্রায় চড়িয়া গিয়াছিল যে, বঙ্গবিভাগের যে পরিণাম আশংকা করিয়া পার্টিশানকে আমরা বিভীষিকা বলিয়া জানিয়াছিলাম সেই পরিণামকেই অগ্রসর হইতে আমরা সহায়তা করিলাম।''[3] রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যে 'আমরা' অর্থাৎ নেতৃস্থানীয় হিন্দু 'ভদ্রলোক' শ্রেণি। 'ওরা' অর্থাৎ মুসলমান ও নিম্নশ্রেণির হিন্দুরা যে এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছিল, তার 'কারণ নির্ধারণ করতে গিয়ে তিনি লিখলেন — ''আমরা যে সকল স্থানেই মুসলমান ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের অসুবিধা ঘটাইয়া বিরোধ জাগাইয়া তুলিয়াছি একথা সত্য নহে। এমনকি, যাহারা বয়কটের কল্যাণে বিশেষ লাভবান হইয়াছে তাহারাও যে আমাদের বিরুদ্ধ হইয়াছে এমন প্রমাণও আছে। ... আমরা ইহাদিগকে নিজের মতে চালাইবার এবং কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু ইহাদিগকে কাছে টানি নাই।''[4] শুধু আন্দোলনের ক্ষেত্রেই যে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মতবিরোধ প্রবল হয়ে উঠেছিল তা নয়, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক ও আর্থিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রেও যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হয়েছিল, সে বিষয়েও রবীন্দ্রনাথ অবগত ছিলেন। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র বৃটিশ সরকারই যে দায়ী নয়, এদেশীয় সমাজের ভেদবুদ্ধিই যে সামাজিক সংঘাতের মৌল কারণ সেদিকেও তিনি অঙ্গুলি সংকেত করেন বঙ্গভঙ্গের কয়েকবছর পরে — পাবনা জেলার সম্মিলনীতে সভাপতির ভাষণে। তিনি সেই ভাষণে বলেন — ''আমরা গোড়া

হইতে ইংরেজের ইস্কুলে বেশি মনোযোগের সঙ্গে পড়া মুখস্থ করিয়াছি বলিয়া গর্ভমেন্টের চাকরি ও সম্মানের ভাগ মুসলমান ভ্রাতাদের চেয়ে আমাদের অংশে বেশি পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। এরূপে আমাদের মধ্যে একটা পার্থক্য ঘটিয়াছে। এইটুকু কোনোমতে না মিটিয়া গেলে আমাদের ঠিক মনের মিলন হইবে না, আমাদের মাঝখানে একটা অসূয়ার অন্তরাল থাকিয়া যাইবে।"[5]

বলা বাহুল্য, এই অসূয়ার অন্তরালই উভয় সম্প্রদায়ের মিলনের মধ্যে শতযোজন ব্যাপী প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ কাঙ্খিত সহিষ্ণুতার উদাহরণ কোন সম্প্রদায়ই দেখাতে পারেনি। একদিকে হিন্দুরা যেমন তাদের ক্ষমতার দাপটে তুচ্ছ জ্ঞান করতে চেয়েছে মুসলমানকে, অন্যদিকে প্যান ইসলামিক ভ্রাতৃত্ববোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মুসলমানরা সুসংহতভাবে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং তাদের প্রতিবাদ ক্রমশঃ হয়ে উঠেছে সাম্প্রদায়িক। সরকারি সূত্র অনুযায়ী ১৯০৬ সালে বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন জানিয়ে কলকাতার পার্কসার্কাসে ২০,০০০ মুসলমানের জমায়েত হয়।[6] কলকাতায় 'মোহামেডান ভিজিলেন্স এ্যাসোসিয়েশন ' গঠন করা হয়, মুসলমানদের উপর স্বদেশীদের অত্যাচারের সংবাদ সংগ্রহ করাই ছিল এই সংস্থার উদ্দেশ্য।[7] 'লাল ইশতেহার' নামে প্রচারিত পত্রিকাতে মুসলমানদের বিক্ষোভ ব্যক্ত হয় — ''হে মুসলমানরা, উঠ, জাগো। তোমরা হিন্দুদের সাথে একই স্কুলে পড়ো না। হিন্দুর দোকান হতে কিছু ক্রয় করো না। ... কৃষকদের মধ্যেও তোমরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। কৃষিই হচ্ছে সম্পদের উৎস। একজন হিন্দুর নিজের কোন সম্পদ নেই এবং সে কেবল তোমাদের সম্পদ হরণ করেই নিজে সম্পদশালী হয়েছে।"[8] বংশীগঞ্জে প্রাপ্ত একটি বিজ্ঞপ্তিতে লেখা হয় — ''মুসলমান ভাইদের এতদ্বারা বলা হচ্ছে যে, তারা সকলে জানে কি করে জামালপুরের মুসলমানরা আহুত হয়ে স্বদেশী আন্দোলনে নিযুক্ত হিন্দুদের দমন করেছে। হে মুসলমান ভাইয়েরা, তোমরা কি জান যে, সরকার এবং নবাব সল্লিমুল্লাহ সাহেব সম্পূর্ণভাবে আমাদের সমর্থক?"[9] বস্তুতঃ, বিদ্বেষপূর্ণ এই আবহাওয়াতে ১৯০৭ সালের মার্চমাসে কুমিল্লাতে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হয়। কুমিল্লার ঘটনার পুনরাবৃত্তি অন্যত্র শুরু হয়। বঙ্গভঙ্গের পরের বছর ১৯০৬ সালে ঢাকায় ঢাকার নবাবের উদ্যোগে মুসলিমলীগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু সহিংস জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কাছে ইংরেজ সরকারকে নতি স্বীকার করতেই হয় — ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়। আবার অন্যদিকে মুসলমান এলিট শ্রেণির সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের আকাঙ্ক্ষাও যেহেতু ক্রমশঃ প্রবল হয়ে উঠছিল, তাই ১৯১৯ সালে মন্টেও-চেম্‌স্‌ফোর্ড সংস্কারবিধিতে আইনসভায় সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা রাখা হয়। এরপর ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীর বৃটিশ বিরোধী অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে মুসলমানদের খিলাফৎ আন্দোলন যুক্ত হয়ে হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের সাময়িক একটা স্থিতাবস্থা আসে ঠিকই, কিন্তু ১৯২২-এ এই দুই আন্দোলনের ধারা স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার পরে বাংলায় পুনরায় দুই সম্প্রদায়ের সম্পর্কের জটিলতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯২৩ সালে চিত্তরঞ্জন দাস প্রস্তাবিত 'বেঙ্গল প্যাক্ট' স্বাক্ষরিত হয়[10] — যে চুক্তি মুসলমানদের খুশী করেছিল এবং বাংলায় রাজনৈতিক স্তরে হিন্দু-মুসলমান নেতাদের মধ্যে একটি সাময়িক ঐক্য সৃজন করেছিল। কিন্তু ১৯২৫ সালে চিত্তরঞ্জন দাশের আকস্মিক মৃত্যুর পর তাসের ঘরের মতো বেঙ্গল প্যাক্ট ভেঙে যায় এবং হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার নগ্নরূপ প্রকাশিত হয়ে যায়। ১৯২৬ সালে কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে এবং এই সময় থেকেই রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্রমশঃ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকেই অবলম্বন করে। বস্তুতঃ হিন্দু নেতা ও উচ্চবর্ণীয় মানুষরা যে জাতীয়তাবাদী ধারণার কথা প্রচার করতেন, সেই জাতীয়তাবাদী ধারণা এতটাই আধিপত্যবাদী ও সার্বভৌম ছিল যে তা বিভিন্ন সম্প্রদায় বা কৌমের সাংস্কৃতিক পার্থক্যকে স্বীকার করতে চাইতনা। সম্প্রদায়ের স্বার্থ বা স্বাতন্ত্র্যের দাবী জাতীয়তাবাদী চেতনার বিপরীত ভাবা হ'ত বলেই বাংলা তথা ভারতে হিন্দু-মুসলমানের বোঝাপড়া বারংবার ব্যর্থ হয়ে গেছিল। এ প্রসঙ্গে আবুল মনসুর আহমদের 'স্মৃতি' বিশেষ উল্লেখ্য — ''দেশবন্ধুর সেদিনকার মর্মস্পর্শী উদাত্ত আবাহন আমার কানে এবং বোধ হয় আমার মত অনেক বাংগালীর কানে, আজো রনিয়া রনিয়া ধ্বনিয়া উঠিতেছে, ... দেশবন্ধুর কল্পিত হিন্দু-মুসলিম — ঐক্যের বাস্তব রূপ সম্পর্কে তিনি তাঁর সিরাজগঞ্জ বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন ঃ 'হিন্দু ও মুসলমান, তাদের সাম্প্রদায়িক স্বতন্ত্র সত্তাবিলোপ করিয়া একই সম্প্রদায়ে পরিণত হউক, আমার হিন্দু মুসলিম ঐক্যের রূপ তা নয়। ওরূপ সত্তা বিসর্জন কল্পনাতীত।' এই বাস্তব বুদ্ধির অভাবেই দেশভাগ হইয়াছে।''[11]

গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের আত্মসত্তার পরিচয় প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খাই এই সময়ের রাজনীতির বৈশিষ্ট্য। ১৯৩০ সাল থেকেই প্রধানত মুসলমানরা ও তার সঙ্গে দলিত, ইঙ্গ-ভারতীয়, ভারতীয় খৃষ্টান এবং ইউরোপীয়ানরা পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর দাবি জানাতে থাকে এবং তারই পরিণামে ১৯৩২ সালে বৃটিশ সরকার 'কমিউনাল এওয়ার্ড', বা সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ঘোষণা করে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বাঙালি 'ভদ্রলোক' শ্রেণি প্রবল হিন্দু সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি দ্বারা সংহত ও চালিত হতে শুরু করে। হিন্দু 'ভদ্রলোক' শ্রেণির মুখপত্র বিভিন্ন সংবাদপত্রগুলি এই নিয়মের বিরুদ্ধে প্রবল বিষোদ্‌গার শুরু করে। সাম্প্রদায়িক রোয়োদাদের প্রতিবাদে কলকাতা টাউন হলে একটি সভা করা হয়। লক্ষ্য করার বিষয়, এই সভায় সভাপতি ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। এই সভায় একজন হিন্দু 'ভদ্রলোকে'র বক্তৃতায় দ্বিজাতিতত্ত্বের আভাসও পাওয়া যায় — "Let the Hindus and Moslems be organised as separate nationalities in the matter of their separate cultural interest, their education, personal law and the like, and then they can without any discord come together on terms of Equality, Equity and Brotherhood in an all-Bengal Federal Assembly. It is the federal idea which alone can suit Bengal."[12]

অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ বাঙালি মুসলমানদের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে এক দৃঢ় পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। বস্তুতঃ এরপর বাংলার রাজনীতিতে বাংলা ভাষাভাষী গ্রামীণ ও মফস্বলের মুসলমান নেতারা প্রাধান্য বিস্তার করেন। এঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য নাম ফজলুল হক — যিনি কৃষক প্রজাপার্টির নেতা ছিলেন এবং বাংলার কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার্থে জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে সরব হন। বাংলায় চিরস্থায়ী প্রথার সুফল লাভ করেছিল মূলতঃ উচ্চবর্ণীয় হিন্দুরা। অন্যদিকে গ্রামীণ বাংলায়, বিশেষতঃ পূর্ববাংলায় কৃষককুল ছিল মূলতঃ ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা। হকের মতো নেতারা ছিলেন মূলতঃ পূর্ববঙ্গীয় ও বাংলা ভাষাভাষী। বস্তুত বাংলায় বিশ শতকের প্রথম থেকেই জমিদার ও কৃষকের মধ্যে শ্রেণিসংঘাত সৃষ্টির পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় বিভিন্ন কারণে এবং এই সংঘাতই পরবর্তীকালে বাংলার হিন্দু-মুসলিম ক্ষমতায়নের রাজনীতিকে একটি বিশেষ মাত্রা প্রদান করে।

বিশ শতক থেকে কৃষি উৎপাদন হ্রাস হওয়ায় সব থেকে ক্ষতিগ্রস্থ হয় জমিদারও শ্রেণি এবং এদের আর্থিক পরিস্থিতি পূর্বের তুলনায় অনেক খারাপ হয়ে যায়, অন্যদিকে গ্রামে সম্পন্ন চাষী বা জোতদার শ্রেণি তৈরী হয় — অনেকসময় যাদের আয় ছিল জমিদারীর থেকে বেশি।[13] পূর্ববঙ্গে এই জোতদাররা ছিল বেশিরভাগই মুসলমান। কৃষক-জমিদার শ্রেণি সংঘর্ষ যখন শুরু হয়, তখন কৃষকদের পক্ষে নেতৃত্ব দিয়েছিল এই উচ্চাকাঙ্খী মুসলমান জোতদাররাই। কারণ জমিদারের পতনে তাদের লাভ ছিল সব থেকে বেশি এবং এই উদ্দেশ্যেই ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক-প্রজা পার্টির ছত্রছায়ায় জড়ো হয়েছিল পূর্ববঙ্গের মুসলমান জোতদাররা।

জমিদার-জোতদার অর্থনৈতিক সংঘর্ষ ক্রমশঃ সাম্প্রদায়িক রূপ পরিগ্রহ করে এবং বাংলার রাজনীতির কেন্দ্রে চলে আসে। এ প্রসঙ্গে আবুল মনসুর আহমদের স্মৃতিচারণায় থেকে উদ্ধৃত করা যেতে পারে — ‘‘হিন্দুদের অনেকেই যে প্রজা-আন্দোলনকে আসলে সাম্প্রদায়িক আন্দোলন বলিতেন, সে নিতান্ত মিথ্যা অভিযোগ ছিল না। প্রজা — খাতক নামের চুলে ধরিয়া টান দিলে মুসলমান নামের মাথাটি আসিয়া পীড়িত। অপরপক্ষে জমিদার মহাজনের নামের টানে হিন্দুরাও কাতারবন্দি হইয়া যাইত। প্রজা-আন্দোলনের ডাকে যে কাতারবন্দিটা হইত, তা ছিল এই কারণেই মুসলমান জনসাধারণের আর্থিক ও সামাজিক মুক্তির চেষ্টা, সামাজিক মর্যাদার দাবি। প্রজা আন্দোলনকে যে অনেকে কৃষক বিরোধী জোতদার আন্দোলন বলিয়া নিন্দা করিতেন, তাঁদের কথাও একেবারে ভিত্তিহীন ছিল না। প্রজা-আন্দোলন সত্যসত্যই কৃষক-আন্দোলন ছিল না। ‘লাঙ্গল যাঁর মাটি তার’ যিকিরটা তখনও উঠে না।’’[14]

এইরকম পরিস্থিতিতে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ১৯৩৭-এ বঙ্গীয় আইনসভায় প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত এবং ত্রিশঙ্কু আইনসভায় কৃষক-প্রজাপার্টির নেতা ফজলুল হককেই বৃটিশরা সরকার গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানায়। এইসময় থেকেই বাংলার রাজনীতিতে এবং সমাজ ও সংস্কৃতিতেও হিন্দু-মুসলমানের মেরুকরণ চূড়ান্ত হয়ে যায়। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের আদেশে বঙ্গীয় কংগ্রেস ফজলুল হকের সঙ্গে মন্ত্রীসভা গঠনে রাজী না হওয়াতে ফজলুল হক মুসলিম লীগের সঙ্গে মন্ত্রীসভা গঠন করেন। ১৯৩৭ সালের পর বাংলার রাজনীতিতে মুসলিম

লীগের অন্ধ সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশের সুযোগ পেয়ে গেল। ১৯৩৭ সালেই শরিক দলকে সন্তুষ্ট রাখতে ফজলুল হক চরম সাম্প্রদায়িক অবস্থান গ্রহণ করেন। ১৯৪০-এ মুসলিম লীগের অধিবেশনে তিনিই 'পাকিস্তান প্রস্তাব' উত্থাপন করেন এবং এরপর মুসলিম লীগের দ্রুত শক্তিবৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে ফজলুল হকের মতবিরোধ চরমে উঠলে ১৯৪১ সালে মুসলিম লীগ সদস্যরা মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করে। ১৯৪১-এ হক পাঁচমিশালী দল নিয়ে পুনরায় মন্ত্রিসভা গঠন করেন — যে মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য ছিলেন হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। ততোদিনে জিন্নার উত্থান ঘটেছে ও পাকিস্তানের দাবী মুসলিম লীগের মূল আদর্শে পরিণত হয়েছে। বাংলাতেও মুসলিম লীগের শক্তিবৃদ্ধি ঘটতে শুরু করেছে অতি দ্রুত। বৃটিশ সরকারী কর্মকর্তাদের বিরোধিতার কারণে ১৯৪৩ সালে ফজলুল হক মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। ওই বছরই খাজা নাজিমুদ্দিনের প্রধানমন্ত্রিত্বে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ১৯৪৫ সালে ওই সরকারের পতন হওয়ার এক বছর পর ১৯৪৬-এ পুনরায় প্রাদেশিক পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং মুসলিমলীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। অতঃপর সুরাবর্দিকে প্রধানমন্ত্রী করে মুসলিম লীগের নতুন মন্ত্রিসভা কার্যভার গ্রহণ করে।

বাংলায় মুসলিম লীগের ক্ষমতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালির মুসলমানদের আত্মসত্তার রাজনীতি লীগের সর্বভারতীয় মুসলমান সংহতির রাজনীতি দ্বারা প্রভাবান্বিত ও চালিত হতে থাকে। ১৯৪৬ সালের প্রথমে ক্যাবিনেট মিশন স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার যে প্রস্তাব দেয়, সেই পরিকল্পনায় পাকিস্তান দাবির স্বীকৃতি আছে মনে করে মুসলিম লীগ সেই প্রস্তাবকে মেনে নিলেও, ভারতের অখণ্ড সংহিত বিনষ্ট হ'তে পারে ভেবে কংগ্রেস সেই প্রস্তাব মেনে নিতে অস্বীকার করে। লীগ এরপর পাকিস্তানের জন্য ''সরাসরি আন্দোলনের'' ডাক দেয়।[15] বাংলাতেও সুরাবর্দি ১৯৪৬ সালে ১৬ই আগষ্ট পাকিস্তানের দাবিতে ''সরাসরি আন্দোলন দিবস'' হিসেবে পালন করতে লীগ কর্মীদের আদেশ দেন। এরপর সেইদিন কলকাতার বুকে ভয়ংকর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়, যা ইতিহাসে কলকাতার 'মহা হত্যাকাণ্ড' হিসেবে বিখ্যাত। বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান এ প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন — ''সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা কাকে বলে এ ধারণাও

আমার ভাল ছিল না। দেখি শত শত হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক মসজিদ আক্রমণ করছে। মৌলভী সাহেব পালিয়ে আসছেন আমাদের দিকে। তাঁর পিছে ছুটে আসছে একদল লোক লাঠি ও তলোয়ার হাতে। পাশেই মুসলমানদের কয়েকটা দোকান ছিল। কয়েকজন লোক কিছু লাঠি নিয়ে আমাদের পাশে দাঁড়াল। আমাদের মধ্যে থেকে কয়েকজন 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' দিতে শুরু করল। দেখতে দেখতে অনেক লোক জমা হয়ে গেল। হিন্দুরা আমাদের সামনা সামনি এসে পড়েছে। বাধা দেওয়া ছাড়া উপায় নাই। ইঁট পাটকেল যে যা পেল তাই নিয়ে আক্রমণের মোকাবেলা করে গেল। আমরা সব মিলে দেড়শত লোকের বেশি হব না। কে যেন পিছন থেকে এসে আত্মরক্ষার জন্য আমাদের কয়েকখানা লাঠি দিল। এর পূর্বে শুধু ইঁট দিয়ে মারামারি চলছিল। এর মধ্যে একটা বিরাট শোভাযাত্রা এসে পৌঁছাল। এদের কয়েক জায়গায় বাধা দিয়েছে রুখতে পারে নাই। তাদের সকলের হাতে লাঠি। এরা এসে আমাদের সঙ্গে যোগদান করল।"[16] হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষ এই দাঙ্গায় মারা যায় এবং দাঙ্গার আগুন ক্রমশঃ নোয়াখালি, বিহারেও ছড়িয়ে পড়ে।

একথা বলা যেতেই পারে শিক্ষিত মুসলমান ও হিন্দুর সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের দ্বন্দ্বই বাংলার তথা ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যার মূল ভিত্তি। বাংলায় ফজলুল হকের শাসনভার গ্রহণ এবং তার পরবর্তী কয়েকবছর বাংলার বিভাজনের ক্ষেত্রে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে যে, এইসময় থেকেই সাম্প্রদায়িক মুসলিম লীগ যেমন বাংলার বুকে ক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটিয়েছিল, তেমনই হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি হিন্দু সংগঠনগুলি কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাংলার হিন্দু 'ভদ্রলোক' শ্রেণি ফজলুল হকের শাসনকালকে দ্বিতীয় মুসলিম জমানা মনে করে নিজেদেরকে অপমানিত, অবহেলিত ভেবে নেয়। উনিশ শতকে হিন্দুত্ব পুনর্জাগরণ আন্দোলনের যে সূচনা — তা বিংশ শতকের প্রথমাংশে গান্ধীজি, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীষিদের উদার মানবতাবাদ দর্শনের ভারে কিছুটা স্তিমিত হয়ে এলেও, সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের ঘোষণা ও ফজলুল হকের শাসনভারগ্রহণ বাঙালি ও উচ্চবর্গীয় হিন্দুর সেই সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তিকেই পুনরায় প্রবল করে তুলেছিল। উনিশ শতকের নবীন চন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যে সিরাজদ্দৌলাকে ইন্দ্রিয়দমনে অক্ষম, বর্ণান্ধ ও নৃশংস এক মুসলমান নবাব হিসেবে চিত্রিত করা হয়। কিন্তু বিংশ

শতকের প্রথমে গিরিশ ঘোষের নাটকে সিরাজদ্দৌলা National Hero হয়ে উঠেছে — যিনি ভারতের স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধের এক ট্রাজিক নায়ক। কিন্তু এরপর ক্রমশ সাধারণ বাঙালি হিন্দুর চিন্তায়, মননে, অনুভবে মুসলমানদের সম্পর্কে এক নির্দিষ্ট নেতিবাচক ধাঁচা তৈরী হয়ে যাচ্ছে তা নীরদ চৌধুরির স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায় — ''... আমরা যখন পড়তে পারতাম না, তখনই আমাদের বলা হতো যে, মুসলমানরা একসময় আমাদের শাসন ও নির্যাতন করেছে; তারা এক হাতে কোরআন ও অন্যহাতে তলোয়ার নিয়ে ভারতে তাদের ধর্মপ্রচার করেছে; মুসলমান শাসকগণ আমাদের মেয়েদের অপহরণ করেছেন, মন্দির ধ্বংস করেছে, আমাদের পবিত্র স্থানগুলি কলুষিত করেছে।''[17] ১৯২৬ সালে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হওয়ার পর হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণির এই অসহিষ্ণুতাই আরও প্রবল হয়ে ওঠে। সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি ভাষণ — পরে যেটি 'হিন্দুসংঘ'তে প্রবন্ধ হিসেবে প্রকাশিত হয়, সেই লেখাটিতেও হিন্দুর ঐতিহাসিক চেতনায় বিদ্যমান কাল্পনিক মুসলমান চরিত্রের বর্ণনা পাওয়া যায় ''একদিন মুসলমান লুণ্ঠনের জন্যেই ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, ... সেদিন কেবল লুঠ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, মন্দির ধ্বংস করিয়াছ, প্রতিমা চূর্ণ করিয়াছে, নারীর সতীত্ব হানি করিয়াছে, ... দেশের রাজা হইয়াও এই জঘন্য প্রবৃত্তির হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। ঔরঙ্গজেব প্রভৃতি নামজাদা সম্রাটের কথা ছাড়িয়া দিয়াও যে আকবর বাদশাহের উদার বলিয়া এত খ্যাতি ছিল, তিনিও কসুর করেন নাই। আজও মনে হয়, এ সংস্কার উহাদের মজ্জাগত হইয়া উঠিয়াছে।''[18]

উনিশ শতকে শিক্ষা, সাহিত্য, সামাজিক উন্নয়ন — সকল ক্ষেত্রেই হিন্দু উচ্চবর্ণীয়রাই পাশ্চাত্য শাসনের সুফল লাভ করেছে। এই কারণেই বিশেষত হিন্দু 'ভদ্রলোক' শ্রেণির সত্তাপরিচয়ের অন্যতম প্রধান দিক হয়ে উঠেছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতি। সেইসময় থেকে তাদের যে সত্তা পরিচয় তৈরী হয়েছিল, তা ছিল মুসলমানত্বের বিপরীত এক কাল্পনিক হিন্দুত্বের আদর্শ দ্বারা রঞ্জিত। অর্থাৎ একই সঙ্গে পাশ্চাত্য জ্ঞানের দ্বারা সমৃদ্ধ এবং তারই সঙ্গে সনাতন হিন্দু ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠত্বের উপর স্থাপিত। শরৎচন্দ্র এই প্রসঙ্গে উক্ত প্রবন্ধে লিখেছেন — ''... শিক্ষার তাৎপর্য যদি

অন্তরের প্রসার ও হৃদয়ের কাল্চার হয়, তাহা হইলে বলিতেই হইবে উভয় সম্প্রদায়ের তুলনাই হয় না।"[19] বিশ শতকের সংঘর্ষময় সময়ে হিন্দু সমাজের এই মানসিকতা ও আত্মসত্তা প্রতিষ্ঠার রাজনীতিকে ব্যাখ্যা করে জয়া চ্যাটার্জী বলেছেন "In this way, the symbol of 'culture' which emerged out of the bhadralok's historical perception of themselves as a class with a particular political destiny, now became a symbol of the communal identity of all Hindus."[20] — হিন্দুজাতির সত্তা পরিচয় রাজনৈতিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে বাংলায় জাতিভেদ প্রথাও পুনর্বিন্যস্ত হয়েছে। হিন্দু সংগঠনগুলি বাধ্য হয়ে রাজনৈতিক কারণেই বাংলার নিম্নজাত ও আদিবাসীদের হিন্দুসম্প্রদায়ের অন্তর্গত হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।[21] যেহেতু বাংলাভাষাভাষী মুসলমানের সংখ্যাধিক্যর কারণেই মুসলমানদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করা হচ্ছিল, যেহেতু বাংলার আইনসভায় মুসলমানরাই সেই সময়ে হয়ে উঠেছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেইহেতু হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল এবং সেই কারণেই নিম্ন জাতিদের হিন্দুত্বে বরণ বা শুদ্ধি প্রক্রিয়া শুরু করেছিল বর্ণহিন্দু সংগঠনগুলি। শরৎচন্দ্রের পূর্বে উল্লিখিত প্রবন্ধটির ছত্রে ছত্রে হিন্দুর আত্মসত্তা রাজনীতির এইদিকটি প্রকট হয়ে উঠেছে। প্রবন্ধটি থেকে প্রাসঙ্গিক দুটি উদ্ধৃতি নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ — ১) ''হিন্দুর সমস্যা এই যে, কি করিয়া তাঁহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারিবেন এবং হিন্দুধর্মাবলম্বী যে কোন ব্যক্তিকেই ছোট জাতি বলিয়া অপমান করিবার দুর্মতি তাঁহাদের কেমন করিয়া এবং কবে যাইবে।"[22] ২) ''মুসলমানের সংখ্যা গণনা করিয়া চঞ্চল হইবারও আবশ্যকতা নাই। সংখ্যাটাই সংসারের পরম সত্য নয়।"[23] সংখ্যায় মুসলমানরা ক্রমবর্ধমান হলেও শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে হিন্দুদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণেই সর্বপ্রকারে ক্ষমতাভোগের অধিকার হিন্দুরই আছে — এই ছিল হিন্দু 'ভদ্রলোক' শ্রেণির রাজনৈতিক দাবী। ১৯৩২ সালে হিন্দু উচ্চবর্ণীয় 'ভদ্রলোক' শ্রেণির পক্ষ থেকে সরকারের কাছে প্রেরিত আবেদনে বলা হয় — "the achievements of Hindu Bengali's stand foremost in the whole of India in the fields of Art, Literature and Science,

Whereas the Muslim Community in Bengal has not so far produced a single name of all-India fame in there fields, Political fitness cannot be divorced from the larger intellectual life of the Nation, and in Political fitness the Musalmans of Bengal are vastly infereior to the Hindu..."[24]

ফজলুল হক বাংলার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে হিন্দু 'ভদ্রলোক' শ্রেণির আহত অভিমান তাদেরকে ভাবতে শিখিয়েছিল দ্বিতীয় মুসলমান যুগ শুরু হয়েছে। অন্নদাশংকর রায় যুক্তবঙ্গের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তাই লেখেন ''কিন্তু ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন যেন মুসলিম আমলের পুনরারম্ভ।"[25] হিন্দু জমিদারের অস্তিত্ব সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছিল বলেই তখনকার বাংলা কথাসাহিত্যে আর্থিক দুর্দশায় সংকটাপন্ন সামন্ত্রতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও জমিদার শ্রেণির প্রতি প্রগাঢ় সহানুভূতি। জমিদারবাবুর শালীন, শিক্ষিত, সংস্কৃতিপরায়ণ রূপ নতুনভাবে চিত্রিত হ'ল বাংলা সাহিত্যে। তারাশংকরের 'ধাত্রীদেবতা' রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ', শরৎচন্দ্রের 'বিপ্রদাস' প্রভৃতি উপন্যাসে এই ধরনের জমিদারবাবুদের কাহিনি পাওয়া যায়। সাহিত্যে এইভাবে জমিদারের আদর্শায়িত মূর্তি অঙ্কন 'হিন্দু ভদ্রলোক' শ্রেণির অস্তিত্বসংকট ও উদ্বেগের রূপটিকেই স্পষ্ট করে তোলে। শরৎচন্দ্রের 'বিপ্রদাস' সনাতনী হিন্দুধর্মের বলিষ্ঠ সমর্থক, সমগ্র উপন্যাসে হিন্দু আদর্শের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাখ্যাকর্তা এবং একই সঙ্গে প্রজারক্ষক জমিদারও বটে। অন্যদিকে তাঁর গৃহের বিশাল গ্রন্থাগারও রয়েছে বিপ্রদাস যার পাঠক। পরবর্তী সময়ে তালুকদার পরিবারের সন্তান মিহির সেনগুপ্ত অথবা কীর্তিপাশার জমিদার পরিবারের সন্তান তপন রায়চৌধুরী উভয়েই তাঁদের স্মৃতিকথায় প্রাধান্য দিয়েছেন পরিবারের সংস্কৃতি মনস্কতা, পারিবারিক মঞ্চ ও নিয়মিত নাট্যাভিনয় এবং পূর্বপুরুষদের সবল ইংরাজী জ্ঞানকে। এই স্মৃতিচারণার প্রেক্ষাপটে অবশ্যই ক্রিয়াশীল ছিল অর্থবান বর্ণহিন্দুর অহংকারের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারাটি।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতাসংকটের মুখোমুখি হয়েছিল বলেই বাংলার হিন্দু 'ভদ্রলোক' শ্রেণির একান্ত কাঙ্খিত হয়ে উঠেছিল বাংলা বিভাজন। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির কিছু মাস পূর্বে ভদ্রলোক শ্রেণির উদ্যোগে হিন্দুদের নিজস্ব দেশ চেয়ে পার্টিশানের স্বপক্ষে বিভিন্ন

জেলায় সই সংগ্রহ শুরু হয় ও আবেদনপত্র জমা পড়তে থাকে। কলকাতাতেও পার্টিশানের স্বপক্ষে প্রচার শুরু হয়। আবেদন পত্র সংখ্যায় সব থেকে বেশি জমা পড়েছিল হিন্দু প্রধান জেলাগুলি থেকে — যেমন বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী, নদীয়া, চব্বিশ পরগণা ইত্যাদি। পূর্ববঙ্গের একমাত্র বাকেরগঞ্জ-এর হিন্দুদের তরফ থেকে দশের অধিক আবেদনপত্র জমা পড়েছিল। বস্তুতঃ এইসময় থেকেই নির্ণীত হয়ে গেছিল পূর্ববঙ্গের সহনশীল গ্রামীণ হিন্দুদের ভাগ্য। বস্তুত প্রাপ্ত তথ্যবিশ্লেষণ করে এরকম ধারণা করা যেতেই পারে, পার্টিশানের স্বপক্ষে ক্ষমতার কেন্দ্র বাংলার পশ্চিম দিক ও কলকাতার হিন্দুদের তরফ থেকে অসংখ্য আবেদন জমা পড়লেও, পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা পার্টিশান চায়নি। তাই সেই তরফ থেকে আবেদনপত্রের সংখ্যাও ছিল কম। পার্টিশান হয়ে যাওয়ার পরও অনেকে বিশ্বাস করেন নি এই বিভাজন স্থায়ী হবে। নীলিমা দত্তর স্মৃতিচারণায় দেখি, তিনি লিখেছেন — ''একটা জিনিস অবাক হয়ে লক্ষ্য করতাম, সর্বস্ব হারিয়ে অনেক কষ্টে থেকেও প্রাণের ঐশ্বর্যে ভরপুর মানুষগুলোকে কখনও নিঃস্ব বা রিক্ত বলে মনে হয়নি। অনেকে বিশ্বাস করতেন দেশভাগ স্থায়ী হবে না। নিজেদের মাটি থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষের এভাবে উৎখাত হয়ে যাওয়া, এর বিহিত হবে। তাঁরা শুধু রাজনৈতিক নেতাদের পর্বতপ্রমাণ ভুলের শিকার হয়েছেন, যা নিতান্ত সাময়িক। এখন শুধু অপেক্ষা, যুদ্ধ করে বেঁচে থাকা। একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে।''[26]

বিশ শতকের গোড়া থেকেই বাংলার মুসলমানরা নিজেদের জাতিস্বরূপ নিয়ে সচেতনতা দেখাতে শুরু করে। সেই সময়ে কোন কোন শিক্ষিত মুসলমান নিজেদের আত্মসত্তার স্বরূপ নিয়ে কিছুটা সংশয়ী ছিলেন। বিশেষতঃ ভাষার প্রশ্নে তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট বিতর্ক ছিল। যেহেতু উর্দু-আরবী-ফারসী ভাষার একটা ধর্মীয় অনুষঙ্গ সৃষ্টি হয়েছিল, সেইহেতু শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানদের একটি অংশ বাংলা ভাষায় শিক্ষাপ্রদানকে গ্রহণ করতে চাননি। সেই সময়ে বাংলার মোল্লা মৌলবিরা বাংলাকে হিন্দুর ভাষা 'কুফুরি জবান' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন।[27] অনেক শিক্ষিত মুসলমানরাও মনে করতেন বাংলা ভাষায় শিক্ষালাভ করে মুসলমানরা হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সমকক্ষতা লাভ করতে পারবে না। ভাষাকেন্দ্রিক এই মনোভাব যে ক্ষমতায়নের রাজনীতিরই অংশ ছিল, তা বোঝা যায় ফজলুল হক যখন ১৯২২ সালে ব্যবস্থাপক সভায়

বাংলাভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন।[28] এ প্রসঙ্গে সন্‌জীদা খাতুনের স্মৃতিকথা থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে — ''শোনা যায়, নজরুল তাঁর কবিতায় 'রক্ত' অর্থে 'খুন' শব্দ ব্যবহার করাতে রবীন্দ্রনাথ আপত্তি জানিয়েছিলেন। ১৩৩৪ সালের ১৪ পৌষ তারিখের সাপ্তাহিক 'আত্মশক্তি'তে 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ' নামে এক লেখায় নজরুল অত্যন্ত সশ্রদ্ধভাবে অথচ খোলাখুলি রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ প্রকাশ করেছিলেন। ... নজরুল আরও বলেছিলেন — ''কবিগুরু কেন, আজকালকার অনেক সাহিত্যিক ভুলে যান যে, বাংলার কাবলক্ষ্মীর ভক্ত অর্ধেক মুসলমান। তারা তাঁদের কাছ থেকে টুপি আর চাপকান চায় না, চায় মাঝে মাঝে বেহালার সাথে সারেঙ্গীর সুর শুনতে...''। ... রবীন্দ্রনাথের মতো মহৎব্যক্তির অন্তরে ধৈর্যের অভাব মুসলমানদের মনে কতদূর ক্ষোভ সঞ্চার করেছিল তার প্রমাণ নজরুলের ওই প্রবন্ধ। ... অন্যপক্ষে, কেবল সাহিত্যক্ষেত্রে নয়, সাধারণভাবে বাংলারভাষার উপরেই সমসাময়িক মুসলমানদের একটি ধর্মসম্প্রদায়গত বিজয় অভিযান পরিচালিত হয়েছিল —। ... ''বেহালার সাথে সারেঙ্গীর সুর'' নয়, ''টুপি আর চাপকান''ই চাই কেবল এমন এক জেদ পেয়ে বসেছিল অনেককে।''[29] শিক্ষিত মুসলমানরা বাংলা ভাষার পাঠ্যপুস্তকও হিন্দু প্রভাবিত বলে সমালোচনা করা শুরু করেন। সাহিত্যিক মীর মুশারফ হোসেন ১৮৮৮ খৃঃ 'গোজীবন' পুস্তিকায় হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের খাতিরে মুসলমানদের গোবধ ত্যাগ করতে বলেছিলেন। কিন্তু বিশ শতকের প্রথম থেকেই লেখকের সেই মনোভাব পরিবর্তিত হয়। এই সময়ে প্রকাশিত তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি জানান বাংলা পাঠ্যবইতে হিন্দু দেবতা, পুরাণ ও হিন্দু মহাপুরুষদের কথাই বেশি থাকত এবং কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর তাঁর মুসলমানী পোশাক পাজামা, চাপকান, টুপি বদল করে তাঁকে ধুতি ও চাদর পরতে হয়।[30] পোশাকের ক্ষেত্রেও বাংলার মুসলমানরা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার জন্য ধুতি ত্যাগ করেছিলেন — বিভিন্ন স্মৃতিকথায় তাঁর উল্লেখ পাই। আবুল মনসুর আহমদ তাঁর স্মৃতিচারণায় লিখেছেন, খিলাফৎ আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার সময় দাড়ি-লুঙ্গি-টুপিতে নিজের ধর্মীয় পরিচয়কে প্রকট করে তুলতে সচেষ্ট হন।[31] সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের পর পোশাকের মাধ্যমে মুসলমান-সত্তা নির্মাণ যে আরও সর্বাত্মক হয়ে ওঠে অন্নদাশংকরের স্মৃতিচারণা থেকে তা জানা যায়। তিনি লিখেছেন মুসলমান জমিদাররা

মুসলমান প্রজাদের ভয়ে ফেজ টুপী ও আচকান পড়তেন। এ বিষয়ে তিনি আরও লিখেছেন — ''এসব কিন্তু আমি গোড়ায় দেখিনি। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের চার বছরের ভিতরেই মুসলিম মানসে একটা ভাববিপ্লব ঘটে যায়। হিন্দুয়ানীর কোনো ধারই তারা ধারবে না। সেটা যদি হয় বাঙালিয়ানা তা হলেও না। উচ্চপদস্থ নিম্নপদস্থ সব স্তরের মুসলমানকে আমি ধুতি পরতে দেখেছিলুম। নামও অনেকের হিন্দু না।...''[32] শুধু পোশাকের ক্ষেত্রেই নয়, ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও শিক্ষিত মুসলমানরা প্রচলিত আধিপত্যবাদী হিন্দু-ইতিহাসের বিপ্রতীপ একটা ধারা নির্মাণ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ভৌগোলিক সীমা অতিক্রমকারী ঐক্যবদ্ধ মুসলমান জাতির কল্পনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাংলার মুসলমানরা আরবের ইতিবৃত্ত, মুসলিম বিজয়ের কাহিনি, মানবসভ্যতায় মুসলমানদের অবদান সম্পর্কিত গ্রন্থ লিখতে উৎসাহিত হন। সাহিত্যিক মীর মুশারফ হোসেন রচনা করেন 'মোসলেম বীরত্ব' (১৯০৪) ও ''মদীনার গৌরব''। এমনকি স্বয়ং নজরুল ইসলাম-ও অর্থের প্রয়োজনে ১৯৩৫ সালে মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষার উদ্দেশ্য 'মক্তাবসাহিত্য' নামক গ্রন্থ রচনা করতে বাধ্য হন।[33] বিভিন্ন মাদ্রাসা ও মক্তবে গ্রন্থটি পাঠ্যপুস্তক হিসেবে গৃহীত হওয়ার জন্য প্রকাশক নজরুলকে যে সুপারিশ পত্রটি লিখতে বাধ্য করেন, সেটি হল ''বাংলার মাদ্রাসা ও মক্তবের মৌলবি সাহেবানেরা খেদমতে আরজঃ ...

জ্ঞানের প্রথম উন্মেষকালে যদি তাহারা ইসলাম ধর্মের, মুসলিম জাতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে প্রথম সবক পায়, তাহা হইলেই আমাদের ভবিষ্যৎ জাতি গঠনের ইমারতের ভিত্তি পাকা হয়''[34] ১৯৩৬ সালের পর কোনো এক সময়ে ফরিদপুরে মুসলিম ছাত্রসম্মিলনীতে বক্তৃতা দিতে গিয়ে তিনি বলেন — ''... যে ইখাওয়াৎ সর্বকালীন ভ্রাতৃত্ব, যে একতা ছিল মুসলিমের আদর্শ, যার জোরে মুসলিম জাতি এক শতাব্দীর মধ্যে পৃথিবী জয় করেছিল, আজ আমাদের সে একতা নেই...।''[35] নজরুলের অর্থনৈতিক অস্বাচ্ছন্দ্য ও বেহিসেবী অদূরদর্শী স্বভাবের কারণে তিনিও অবশেষে নিজের ভাবাদর্শগত অবস্থান থেকে দূরবর্তী এই রাজনৈতিক ভাবাদর্শের সঙ্গে কখনও কখনও অসুখী আপোষ করেন। কিন্তু তাঁর দ্বন্দ্ব ছিল স্পষ্ট এবং তা প্রকট হয়ে উঠেছে ১৯৪১-এ ফজলুল হকের 'নবযুগ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'অগ্রনায়ক' নামক একটি কবিতায়। কবিতার প্রথমাংশে নজরুলের প্রতিভা তাঁর নিজস্ব ধরনে অসাম্প্রদায়িক এবং প্রতিবাদী — ''কর্মের নামে ধর্মের নামে

কলহ রাত্রিদিন,/মরমের কথা কহিছে চর্মকারেরা মর্মহীন।/... দেশ আর জাতি হল ছারখার নেতৃত্বের লোভে...” কিন্তু কবিতার পরবর্তী অংশে স্পষ্টবক্তা উদারপন্থী নজরুলের আপোষ ধরা পড়ে যায় — ‘‘তিনিই ইমাম তিনি অগ্রনায়ক সারথি তিনি/জাগাইয়া ভূমিকম্পে পাষাণে চেতনা জাগান তিনি।/সর্বযুদ্ধে জয়ী হন ইনি আল্লার শক্তিতে/এর সৈন্যরা সমবেত হয় প্রেম আর ভক্তিতে।”[36] আবার এই নজরুলই ১৯৪১ সালেই বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির রজত জয়ন্তী উৎসবে বলেন — ‘‘আমি যদি আসি, আসব হিন্দু মুসলমানের সকল জাতির ঊর্ধ্বে যিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্ তাঁরই দাস হয়ে।”[37]

একথা বলাই বাহুল্য, ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন এবং হিন্দুত্ব জাতীয়তাবাদ মুসলমানদের আত্মপ্রতিষ্ঠার রাজনীতিকে প্রবলভাবে সাম্প্রদায়িক করে তোলে। স্বদেশী বিপ্লবীদের অনুপ্রেরণাদায়ক ‘বন্দেমারতরম’ সঙ্গীতটির প্রতি তাদের তীব্র বিদ্বেষ ছিল। কারণ তারা মনে করত হিন্দু দেবী ও পৌত্তলিকতার উদ্‌যাপন আছে সঙ্গীতটিতে — যা তাদের ধর্ম বিরোধী। ১৯০৭ সালে ‘দি রেড প্যাম্ফিলেট” ‘বন্দেমাতরম্’ সঙ্গীতের তীব্র বিরোধিতা করে।[38] বঙ্কিমী উপন্যাসে মুসলমান রমনীর হিন্দুযুবকের প্রতি প্রেমাসক্ত হওয়ার কাহিনির প্রতিবাদে ইসমাইল হোসেন গাজী একাধিক উপন্যাস লেখেন — যেখানে হিন্দু রমনীরা মুসলমান যুবকের প্রেমাভিক্ষা করেছে। তারাবাঈ (১৯০৪), রায়নন্দিনী (১৯১৫), নূরদ্দিন (১৯২৩) — প্রভৃতি এই ধরনের উপন্যাস। এইভাবে বাঙালি মুসলমানদের একটি অংশ প্যান-ইসলামী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ধর্মীয় আত্মপরিচয়কেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। সন্‌জীদা খাতুন তাঁর স্মৃতিলেখায় জানিয়েছেন — ‘‘ঊনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু ঔপন্যাসিকদের রচনায় হিন্দু নায়কের প্রতি মুসলমান নায়িকার অনুরাগের বর্ণনা অনেক মুসলিম লেখকে উত্তেজিত করেছিল, সন্দেহ নেই। ফলে তাঁরাও পাল্টা মুসলিম নায়কের প্রতি হিন্দু নায়িকার অনুরাগের কাহিনি লিখেছিলেন।”[39] আবুল মনসুর আহমদ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন — ‘‘... ভারতের মুসলমানরা এই যুগে ছিল কার্যতঃ একটা দেশহীন সম্প্রদায় মাত্র।”[40] এতদ্‌সত্ত্বেও বিশ শতকের গোড়া থেকেই অনেক শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান বাংলাভাষাভাষী হিসেবে নিজ গোষ্ঠীর স্বরূপ নির্ণয়ের আগ্রহ প্রকাশ করেন। ১৯০৯ সালে বাসনা পত্রিকায় হামেদ আলী লেখেন — ‘‘আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আরব, পারস্য আফগানিস্তান অথবা তাতারের অধিবাসীই হউন, আর

এতদ্দেশবাসী হিন্দুই হউন, আমার এক্ষণে বাঙালি — আমাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালা।”[41] আবুল মনসুর আহমদের স্মৃতিকথা থেকে জানতে পারি ছাত্র বয়সে তিনি স্কুলে মুসলমানদের মিলাদ উৎসব পালনের জন্যে আন্দোলন করেন।[42] সেই উৎসবে তিনি বাংলায় মিলাদ পড়ার প্রস্তাবনা দিয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। কিন্তু তবুও হিন্দু বাঙালির থেকে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার আগ্রহও তাদের মধ্যে ছিল বলেই বাংলাকে হিন্দুয়ানীর সংস্পর্শ মুক্ত করে আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করে এক ‘মুসলমানী বাংলা’ নির্মাণে শিক্ষিত মুসলমান বাঙালির এক অংশ উদ্যোগী হয়েছিলেন। ১৯২৬ সালে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আবেদন রাখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যেন আরবী ফারসী সম্বলিত বাংলাকে স্বীকৃতি দেয়।[43] ১৯৩২ সালে এই সমিতি-ই অপর একটি সভায় স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করে মুসলমানী বাংলা প্রচলিত হিন্দুয়ানীর স্পর্শঘেষা বাংলার থেকে স্বতন্ত্র এবং বাংলাভাষায় আরবী-ফারসী শব্দব্যবহারের বিরোধিতা যাঁরা করেছেন, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে মুসলমান বাঙালির সাহিত্যসৃষ্টিতে বাধা দিচ্ছেন। ১৯৩৫ সালে স্টার অব ইন্ডিয়ায় প্রকাশিত এক খোলা চিঠিতে এই ধরনের বক্তব্য পেশ করা হয়। এই চিঠিতে সই করেছিলেন নজরুল ইসলাম, আবুল কালাম শামসুদ্দিন, মুজিবুর রহমান, আবুল মনসুর আহমদ-প্রমুখ মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা।[44] এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কিঞ্চিৎ আপত্তি যে পরবর্তীকালেও শিক্ষিত মুসলমান বাঙালির মনে অসহিষ্ণুতা বিবেচনায় ক্ষোভ সঞ্চার করেছিল তার স্বীকারোক্তি সাংস্কৃতিক আন্দোলন কর্মী সন্‌জীদা খাতুনের লেখায় পাওয়া যায় — ‘‘রবীন্দ্রনাথকে ভাষা প্রসঙ্গে পত্র লিখতে গিয়ে মনের কথা সঙ্গতভাবে অত্যন্ত জোরালোভাবে উচ্চারণ করেছেন এম এ আজম ও আবুল ফজল। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যে, ভাষায় যথেচ্ছাচার চালাবার চেষ্টার বলিষ্ঠ প্রতিবাদও সঙ্গত। তবু সেই সঙ্গে সহিষ্ণু বিবেচনার পরিচয় পেলে আমাদের মনে খেদ জমতে পারতো না।”[45] যদিও ভাষায় জোর করে আরবী ফারসীর প্রয়োগ সম্পর্কেও তাঁর আপত্তি ছিল এবং তিনি স্বীকার করেছেন এই প্রবণতাই ‘‘প্রাক্ ভাষা-আন্দোলন পর্বের বাঙালি মুসলমানের সাংস্কৃতিক বিভ্রান্তি।”[46] বিভ্রান্তি বলা যেতে পারে, আবার স্ববিরোধিতা বা দ্বন্দ্বও বলা যেতে পারে। কারণ ১৯২৬ সালেই ঢাকা থেকে ‘শিখা’ পত্রিকা বের করে যে সকল বাঙালি মুসলমান যুবা ‘বুদ্ধির মুক্তি’ আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন, তাঁরা ভাষায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত

মুসলমানীকরণ মেনে নেননি। তবে তাঁরা ভাষা পরিবর্তন না করলেও, বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের ধর্মীয় পরিচয়কে বাদ দিতে চাননি। কিন্তু 'শিখা গোষ্ঠী'র আপত্তি সত্ত্বেও দেশবিভাজনের পূর্বেই মুসলমানী বাংলা ও সাহিত্য সৃষ্টির তাগিদে 'পূর্বপাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি' এবং 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ'[47] প্রতিষ্ঠিত হয়। ফররুখ আহমদ প্রভৃতি কবিরা এই সকল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত নন। এই সময়ে নজরুলের কবিতায় আরবী ফারসী শব্দের বাহুল্যকে সমালোচনা করা হ'লে আবুল কালাম শামসুদ্দিন 'সওগাত' পত্রিকায় প্রতিবাদ জানিয়ে লেখেন — ''মুসলমান কবির রচনা বুঝিতে হইলে একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া কতকগুলি আরবী-ফারসী শব্দের সহিত পরিচিত হইতে হইবে বই কি।''[48]

এইভাবে ইতিহাস, পোশাক এবং ভাষাকে কেন্দ্র করে মুসলমান বাঙালির আত্মপরিচয়ের রাজনীতি প্রবল হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে রাজনীতির ক্ষেত্রে পাকিস্তানের দাবিও প্রবল হয়ে ওঠে। কিন্তু একথা ঠিক, বাঙালি অথবা মুসলমান জাতি পরিচয়ের ক্ষেত্রে কোন্‌টি প্রাধান্য পাবে — এই নিয়ে তাদের দ্বন্দ্ব ছিল সেইসময় থেকেই, তবুও একথাও অনস্বীকার্য মুসলমান অথবা বাঙালি — আত্মসত্তার যে পরিচয়ই গৃহীত হোক না কেন, তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য 'পাকিস্তান' যে প্রয়োজনীয় এ বিষয়ে বাংলা ভাষাভাষী অদিকাংশ শিক্ষিত মুসলমান বাঙালিই একমত ছিলেন। রাজনীতিবিদ আবুল মনসুর আহমদ, অথবা লেখক আবুল হোসেন অথবা আবু রুশ্‌দ কিংবা পরবর্তীকালের সাংস্কৃতিক কর্মী সনজীদা খাতুন — সকলের স্মৃতিচারণাতেই এই সুর স্পষ্ট। সুতরাং হিন্দু-মুসলমানের পৃথক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সত্তা নির্মাণের এই রাজনীতির চাপ উপেক্ষা করা যায়নি বলেই ১৯৪৭ সালে বাংলা বিভাগ ঘটে।

আত্মসত্তার এই রাজনীতির ক্ষেত্রে ভারতের দলিত আন্দোলনের বিষয়ে উল্লেখ না করলে এই রাজনীতির সামগ্রিক রূপটি স্পষ্ট হয় না। মুসলমানদের ক্ষমতায়নকে রোধ করার জন্য রাজনৈতিক কারণে হিন্দু মহাসভার মতো সংগঠনগুলি দলিত অথবা তফসিলি জাতিদের হিন্দুজাতির অংশ হিসেবেই ঘোষণা করেছিল বটে, কিন্তু বিশ শতকের প্রারম্ভ থেকেই ভারতীয় দলিতরা হিন্দু পরম্পরার জাতিসত্তা নির্মাণ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে চেয়েছে। বর্ণহিন্দুদের অস্পৃশ্যতা ও শোষণের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলিতরা ক্রমশঃ সংহত হচ্ছিল এবং সচেষ্ট

হয়ে উঠেছিল স্বতন্ত্র আত্মপরিচয় নির্মাণে করার জন্য। ১৯২০ সালে গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ আন্দোলন শুরু করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু এই অভিযান দলিতদের সামাজিক মর্যাদা দিলেও অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিতে পারেনি।[49] দলিতরা স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে গড়ে ওঠা শুরু করে ডা. বি. আর আম্বেদকর প্রমুখদের নেতৃত্বে। হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভ ও উষ্মার চরম প্রকাশ ঘটে যখন ১৯২৭ খৃঃ ড. আম্বেদকর প্রকাশ্যে হিন্দু শাস্ত্র মনুস্মৃতি গ্রন্থটি পুড়িয়ে দেন। এইভাবে তাদের আন্দোলন ও দাবী প্রবল হয়ে উঠেছিল বলেই সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে আইনসভায় কিছু আসন দলিতদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। শিক্ষায়, চাকরি ক্ষেত্রে সংরক্ষণের জন্য দলিতদের কোন কোন সংগঠন আন্দোলন শুরু করেছিল — যা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে।[50]

অখণ্ড বাংলাতেও নিম্নবর্ণীয়রা তাদের স্বতন্ত্র আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছিল। এ প্রসঙ্গে মনোরঞ্জন ব্যাপারী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন — ''সে এক মহাজাগরণের সূচনাকাল। নিদ্রোত্থিত লক্ষ লক্ষ নমঃশূত্রদের তখন নেতৃত্ব দিচ্ছেন হরিচাঁদ ঠাকুরের সুযোগ্য পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর। বেদ ব্রাহ্মণ বিরোধী এক নতুন ধর্মমত ''মতুয়া'' ধর্মসংগঠনের মাধ্যমে গুরুচাঁদ ঠাকুর তাদের সংঘবদ্ধ করে, সচেতন করে, মানুষদের মধ্যে জ্বালিয়ে তুলেছেন আত্মসম্মানের দীপ্ত মশাল — আমরা কারও চেয়ে ছোট নই, কেউ বড় নয় আমাদের চেয়ে। তখন নমঃশূদ্র সম্প্রদায় সংঘবদ্ধ এমন এক শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে যে তাদের ক্ষমতাকে অস্বীকার করবার সাহস কারও ছিলনা।''[51]

১৯৪২ সালে হিন্দুমহাসভা বাংলা তথা ভারতে যখন যথেষ্ট সক্রিয়, তখনই সর্বভারতীয় তফসিলি সংগঠন ঘোষণা করে দলিতরা হিন্দুদের থেকে আলাদা ও বিশিষ্ট।[52] অস্পৃশ্যতাজনিত সামাজিক বৈষম্য বাংলাতে একেবারেই ছিল না — সে কথা বলা যাবে না। মুজিবর রহমান, আবু রুশদ্, কবি শামসুর রহমান-এর স্মৃতিচারণায় হিন্দুদের ছোঁয়াছুঁয়ির বিচারের কারণে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে অপমানিত হওয়ার ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। শুধু মুসলমানদের ক্ষেত্রেই নয়, নীচু জাতের বা তথাকথিত দলিতদের ক্ষেত্রেও বাঙালি বর্ণহিন্দুদের একইরকম ব্যবহার ছিল।

মনোরঞ্জন ব্যাপারী লিখেছেন — ''ওই একই ধরনের অপমান, ঘৃণা হিন্দুধর্মের উচ্চবর্ণের নিকট থেকে নমঃশূদ্ররাও পেয়ে থাকে। ... সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে নমঃশূদ্ররা তেমন কোন তীব্র প্রতিবাদ করতে পারেনি। কিন্তু মুসলমানরা পেরেছে। খেপে গেছে তারা, যে ধর্ম — যে মানুষ আমাদের ঘৃণা করে আমরা আর তাদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে রাজি নই।''[53] বর্ণহিন্দু বিরোধী এরূপ মনোভাব সক্রিয় ছিল বলে নিম্নবর্গীয় নেতা যোগেন মণ্ডল ক্যাবিনেট মিশনের পর অন্তর্বর্তী সরকার মুসলিম লীগের প্রার্থী ছিলেন। দেশবিভাজনের পরেও যোগেন মণ্ডল প্রথমে ভারতে আসেননি। আবার তফসিলি সম্প্রদায়ের অন্য একটি অংশ হিন্দু মহাসভার আশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে হিন্দুদের জন্য পৃথক দেশের দাবীতে সোচ্চারও হয়েছিল। কিন্তু ১৯৪৭ সালে দেশভাগ হওয়ার পরে ভারত ও পাকিস্তান দুটি স্বাধীন দেশেই তারা বঞ্চনার স্বীকার হয়েছিল বলেই তারা মনে করেন। আম্বেদকর স্বাধীন ভারতের মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দেন ও ১৯৫৬ সালে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন।[54] মনোরঞ্জন ব্যাপারী আক্ষেপের সঙ্গে স্মৃতিলেখায় স্বীকার করেন — ''আমার তো এমন মনে হয়, হিন্দু ধর্মের দাসত্ব স্বীকার করে নিয়ে চতুর্বর্ণ ব্যবস্থার মধ্যে অনুপ্রবেশ করে নমঃশূদ্র সমাজ বর্ণপ্রভুদের গোলাম হয়ে যাবার চেয়ে সেই ''পঞ্চমবর্ণ'' চণ্ডাল থাকাই অনেক মঙ্গল ছিল। আর যা কিছু হোক সে তো কারও দাস ছিল না। ... দাসত্ব, তা সে সামাজিক আর্থিক ধর্মীয় যাই হোক তা কোন দিন মনুষ্যত্বের বিকাশের সহায়ক হয় না।''[55] অন্যদিকে পূর্বপাকিস্তানের নিম্নজাতের মানুষরা ১৯৫০ সালের পর বন্যার স্রোতের মত ভারতে আসা শুরু করে। ভারতের মাটিতেও এইসকল নিম্নজাতের মানুষরা সাগ্রহে গৃহীত হয়নি, সেখানেও নাগরিকত্ব অর্জনের জন্য তাদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম এক স্বতন্ত্র ইতিহাস রচনা করেছে। অতীত স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে মনোরঞ্জন ব্যাপারী পুনরায় লিখলেন — ''পাকিস্তানে সেই যেবার (১৯৫০) মুসলমানেরা স্রেফ মুসলমান নয় বলে কিছু লোকের গলার নলি কেটে দেয়, আমার বাবা আরো অনেক বীর বাঙালীর মতো এক কাপড়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে বাধ্য হন। শর্তানুসারে, ভারত সরকার সেই রিফুজিদের কত কষ্টের পরেও মানুষ বেঁচে থাকতে পারে, তার একটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন।''[56]

সুতরাং দেশভাগ — বাংলা তথা ভারতের বিভিন্ন গোষ্ঠীর আত্মসত্তাপ্রতিষ্ঠা রাজনীতির একটি পরিণাম মাত্র বলা যেতে পারে। দেশভাগের তাৎপর্য ও অভিঘাতও তাই বিভিন্ন গোষ্ঠীর

ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র। বাংলার জাতীয়তাবাদী ধারায় দেশভাগ বিষাদের ইতিহাস হিসেবে লিখিত হলেও, পাকিস্তান অথবা অধুনা বাংলাদেশের মানুষে কাছে দেশবিভাজন হিন্দু-আধিপত্য থেকে স্বাধীনতা লাভের মুহূর্ত হিসেবে গৃহীত। আবার বাংলার দলিতদের কাছে সেই ইতিহাস বিষাদেরও নয়, মুক্তির আনন্দেরও নয় — তাদের কাছে এই ইতিহাস সম্মান অর্জন ও নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে একটি পদক্ষেপ মাত্র।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কাছে দেশভাগের তাৎপর্য কি অথবা দেশভাগের পরে কি ধরনের অবস্থা বা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তাদের জীবন অতিবাহিত হয়েছে সেই বিষয়ে প্রয়োজনীয় আলোচনার জন্য 'স্মৃতিকথা'গুলি যে শ্রেষ্ঠ অবলম্বন — একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। 'স্মৃতিচারণা'য় দেশবিভাজন একান্ত ব্যক্তিগত হয়েও সামাজিক। কারণ ব্যক্তির সত্তা পরিচয় তার 'স্মৃতি'র নির্মাণ ঘটায় এবং ব্যক্তির সত্তা পরিচয় গড়ে ওঠে তার গোষ্ঠী পরিচয় দ্বারা। মানুষের গোষ্ঠীগত বিভেদ — যেমন ধর্মীয়, জাতিগত, শ্রেণিগত, পেশাগত অথবা লিঙ্গগত - তাদের 'স্মৃতির বয়ানকে স্বতন্ত্র্য করে তুলতে বাধ্য। আবার কোন একজন ব্যক্তির বহু সত্তা — একই সঙ্গে তিনি কোন ধর্মের, আবার নির্দিষ্ট জাতের বা শ্রেণির অথবা লিঙ্গের কিংবা পেশার। সত্তার বহুদিক ব্যক্তির স্মৃতিচারণার বয়ানে তৈরী করতে পারে দ্বন্দ্ব, সেখানে থাকতে পারে স্ববিরোধিতা। এই সবটুকুকে নিয়ে দেশভাগ কেন্দ্রিক আলোচনায় প্রাধান্য পায় ব্যক্তির স্মৃতি। স্মৃতিকথায় দেশভাগ ও আত্মসত্তা পরিচয়ের সন্ধান 'দেশভাগ' কেন্দ্রিক জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে এক স্বতন্ত্র মাত্রা যোগ করবে একথা বলাই বাহুল্য।

তথ্যসূত্র

1. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর,* খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ২০১৩, পৃ-১৭

2. উল্লিখিত-আমিনুল ইসলাম। ''রবীন্দ্রমানস ও মুসলিম সমাজ'', *ভাবে অনুভাবে রবীন্দ্রনাথ, সম্পা-* সিদ্ধার্থরঞ্জন চৌধুরি ও অমিতাভ চক্রবর্তী, একুশে, কলকাতা, ডিসেম্বর, ২০১১, পৃ-২৬১

3. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ''সদুপায়'' সমূহ, *রবীন্দ্ররচনাবলী*, ১০ম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ-২৬৮

4. তদেব, পৃ-২৬৮.

5. তদেব, পৃ-৫০১.

6. জন. আর. ম্যাকলেন - ''বঙ্গবিভাগ (১৯০৫) : হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক'', (অনুবাদ), *বাংলাদেশের ইতিহাস (১মখণ্ড)*, সম্পা- সিরাজুল ইসলাম, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, এশিয়াটিক প্রেস, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ-৩৪৪

7. তদেব, পৃ-৩৪৪

8. তদেব, পৃ-৩৪৪

9. তদেব, পৃ-৩৫৭

10. সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম ''বঙ্গীয় আইনসভা ও শাসনতান্ত্রিক বিকাশ'', *বাংলাদেশের ইতিহাস* (১ম খণ্ড), সম্পা- সিরাজুল ইসলাম, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, এশিয়াটিক প্রেস, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৯৩, পৃ-৩০৬

11. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ২০১৩, পৃ-৪০

12. Joya Chatterjee, *Bengal divided : Hindu Communalism and partition, 1932-1947,* Campridge University Press, Cambridge, 2002, p-26

13. Ibid, p-59

14. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ২০১৩, পৃ-১২৭

15. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, *পলাশি থেকে পার্টিশান*, অনুবাদ-কৃষ্ণেন্দু রায়, ওরিয়েন্টে

ব্ল্যাকসোয়ান, কলকাতা, ২০১২, পৃ-৫২৮

16. শেখ, মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, দি ইউনিভার্সিটি প্লেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৩, পৃ-৬৪

17. জন. আর. ম্যাকলেন ''বঙ্গবিভাগ (১৯০৫) : হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক'', *বাংলাদেশের ইতিহাস ১ম খণ্ড*, পৃ-১২৭

18. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ''বর্তমান হিন্দু-মুসলিম সমস্যা'' *শরৎরচনাবলী, ৩য় খণ্ড*, শরৎ সমিতি, কলকাতা, ১৩৮৩, পৃ-৪৭৩।

19. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ''বর্তমান হিন্দু-মুসলিম সমস্যা'' *শরৎরচনাবলী, ৩য় খণ্ড*, শরৎ সমিতি, কলকাতা, ১৩৮৩, পৃ-৪৭৪

20. Mentioned in Joya Chatterjee, *Bengal Divided Hindu Communalism and partition, 1932-1947,* Cambridge University Press, Cambridge, 2002, p-176

21. Joya Chatterjee, *Bengal Divided Hindu Communalism and partition, 1932-1947,* Cambridge University Press, Cambridge, 2002, p-194-195

22. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ''বর্তমান হিন্দু-মুসলিম সমস্যা'' *শরৎরচনাবলী, ৩য় খণ্ড*, শরৎ সমিতি, কলকাতা, শ্রাবণ ১৩৮৩, পৃ-৪৭৪

23. তদেব, পৃ-৪৭৪

24. Joya Chatterjee, *Bengal Divided Hindu Communalism and partition, 1932-1947,* Cambridge University Press, Cambridge, 2002, p-187

25. অন্নদাশঙ্কর রায়, *যুক্তবঙ্গের স্মৃতি ও মুক্তবঙ্গের স্মৃতি*, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৪২১, পৃ-২২

26. নীলিমা দত্ত, *উজান স্রোতে*, মাইন্ডস্কেপ, হাওড়া, ২০০৭, পৃ-৭০

27. গোলাম মুরশিদ, ''বিশ শতকের বাঙালি সংস্কৃতি : *হাজার বছরের বাহালি সংস্কৃতি*, অবসর, ঢাকা, ২০১২, পৃ-১৮০

28. তদেব, পৃ-১৭৬

29. সনজীদা খাতু, *স্বাধীনতার অভিযাত্রা*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭, পৃ-২৩-২৫

30. মোহাম্মদ শাহ, ''বাঙালী জাতীয়তাবাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি'', *বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড*, সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, এশিয়াটিক প্রেস, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ-৭২৬

31. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, পৃ-২২

32. অন্নদাশঙ্কর রায়, *যুক্তবঙ্গের স্মৃতি ও মুক্তবঙ্গের স্মৃতি*, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৪২১, পৃ-২২

33. অরুণ কুমার বসু, *নজরুল জীবনী*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০০, পৃ-৪০২

34. তদেব, পৃ-৪০২

35. তদেব, পৃ-৪১৭

36. তদেব, পৃ-৪৬৬

37. তদেব, পৃ-৪৭৬

38. মোহাম্মদ শাহ, ''বাঙালী জাতীয়তাবাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি'', *বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড*, পৃ-৭২২

39. সনজীদা খাতু, *স্বাধীনতার অভিযাত্রা*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭, পৃ-৪১

40. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, পৃ-১৩১

41. গোলাম মুরশিদ, ''বিশ শতকের বাঙালি সংস্কৃতি'' *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, পৃ-১৮২

42. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, পৃ-২০

43. আমিরুল ইসলাম, ''রবীন্দ্রমানস ও মুসলিম সমাজ'', *ভাবে অনুভাবে রবীন্দ্রনাথ*, পৃ-১৮২

44. তদেব, পৃ-২৪৪

45. সন্‌জীদা খাতুন, স্বাধীনতার অভিযাত্রা, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭, পৃ-২৬

46. তদেব, পৃ-২৭

47. গোলাম মুরশিদ, ''বিশ শতকের বাঙালি সংস্কৃতি'' *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, পৃ-১৮৩

48. অরুণ কুমার বসু, *নজরুল জীবনী*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০০, পৃ-২০৫

49. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, *পলাশি থেকে পার্টিশান*, অনুবাদ-কৃষ্ণেন্দু রায়, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, কলকাতা, ২০১২, পৃ-৪১৭

50. তদেব, পৃ-৪১৬

51. মনোরঞ্জন ব্যাপারী, *ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন*, দে পাবলিকেশন্‌স্, কলকাতা, ১৪২৬, পৃ-২২

52. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, *পলাশি থেকে পার্টিশান*, অনুবাদ-কৃষ্ণেন্দু রায়, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাক সোয়ান, কলকাতা, ২০১২, পৃ-৪২০

53. মনোরঞ্জন ব্যাপারী, *ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন*, দে পাবলিকেশন্‌স্, কলকাতা, ১৪২৬, পৃ-২৬

54. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, *পলাশি থেকে পার্টিশান*, অনুবাদ-কৃষ্ণেন্দু রায়, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাক সোয়ান, কলকাতা, ২০১২, পৃ-৪২১

55. মনোরঞ্জন ব্যাপারী, *ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন*, দে পাবলিকেশন্‌স্, কলকাতা, ১৪২৬, পৃ-২৩

56. মনোরঞ্জন ব্যাপারী, ''অভিশপ্ত অতীত'', *দেশভাগ স্মৃতি আর সত্তা*, সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০১, পৃ-৪৭

স্মৃতি, সত্য, সত্তা

হিন্দু-মুসলমানের আত্মসত্তার রাজনীতির যে কালো মেঘ বিংশ শতকের প্রথমার্ধে ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল, তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল ১৯৪৭ সালের দেশভাগ। আত্মসত্তার রাজনীতির নির্মম বিভেদকামী চেহারা একবিংশ শতকের পৃথিবীর কাছেও অপরিচিত নয়। বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভিতর ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, বিজেতাদের হিংস্র উল্লাস ও বিজিত গোষ্ঠীর ঘরছাড়া, দেশছাড়া হওয়া মানব সভ্যতার গর্বিত রূপকে লজ্জিত করে বারংবার। ভারতের মাটিতে আজও সমান প্রাসঙ্গিক এই সংঘর্ষ ও রাজনীতি। সুতরাং দেশভাগ উনিশশ সাতচল্লিশে ঘটে যাওয়া একটি অতীত ঘটনামাত্র নয়। বিশেষত ভারতের পূর্বপ্রান্তে দেশভাগের প্রতিক্রিয়া ও উদ্বাস্তু আগমন প্রলম্বিত থেকেছে দীর্ঘদিন। সাতচল্লিশের পর পঞ্চাশ, আবার বাষট্টি, পুনরায় একাত্তর অথবা বঙ্গবন্ধু মুজিবরের মৃত্যুর পর আবার, বারংবার বিভাজিত ওপারের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় আতঙ্কে, অত্যাচারে উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে। এপার থেকেও বহু সংখ্যক মুসলমান ধর্মের মানুষ ওপারে চলে গেছে। বস্তুতঃ দেশভাগ পূর্বপ্রান্তে পীড়িত করেছে শুধুমাত্র একটি প্রজন্মকে নয়, দুই-তিন প্রজন্ম তাদের জীবনে ও স্মৃতিতে ধারণ করেছে অথবা করে চলেছে দেশভাগ ও দেশহারানোর অভিশাপকে।

সাতচল্লিশ সালের বঙ্গবিভাজনের পর দেশত্যাগের স্মৃতি অনেক বিখ্যাত মানুষের আত্মকাহিনিতে উঠে এসেছে। যেমন তপন রায়চৌধুরী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অশোক মিত্র, মণিকুন্তলা সেন অথবা ওপারের শেখ মুজিবুর রহমান, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল হোসেন, সনজীদা খাতুন ইত্যাদি আরও অনেক নাম করা যায়। আবার শুধুমাত্র দেশভাগ নিয়েই স্মৃতিচারণা করেছেন এমন মানুষও আছেন। এই যে এত মানুষ দেশভাগকে নিয়ে কথা বলছেন, তাঁরা সবাই দেশ অথবা দেশত্যাগ সম্পর্কে কি মনে করতে চান? বস্তুতঃ শুধুমাত্র ফেলে আসা গ্রামের জন্য নস্টালজিক অনুভূতি তাঁদের বর্তমান নাগরিক জীবনকে পীড়িত করে এমন নয়; তাঁদের অনেকের স্মৃতি বড় নির্মম। সে স্মৃতিকথা আতঙ্কে পালানোর অথবা দুর্বিসহ সংগ্রামের ও বঞ্চনার বিবরণ। দেশভাগের অব্যবহিত পরে বিশেষ কিছু রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে এঁরা সরব হয়ে উঠতে পারেননি। কিন্তু দেশত্যাগের বেশ কিছু বছর পরে জ্ঞানতাত্ত্বিক অনুসন্ধিৎসা এঁদের স্মৃতিচারণের

বিবরণ শুনতে চেয়েছে, প্রাধান্য দিয়েছে। এখন প্রশ্ন দেশত্যাগের বহুবছর পর কতটা অনুপুঙ্খ হতে পারে সেই বিবরণ? দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেল কতখানি সত্য অথবা যা তাঁরা বলেছেন সবটুকুই কি যথাযথ তথ্যনির্ভর?

বস্তুতঃ স্মৃতিচারণার ক্ষেত্রে যে প্রশ্নটি প্রধান হয়ে ওঠে, সেটি হল স্মৃতি কি? স্মৃতি কিভাবে ক্রিয়াশীল হয়? ইংরেজীতে দুটি শব্দ পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়, memory যাকে বাংলায় বলা যেতে পারে স্মৃতিশক্তি। অপরটি remembering বা মনে করা। Memory এক ধরনের মানসিক শক্তি যা মনে রাখতে সাহায্য করে। এই শক্তি দুইভাবে মানুষের মনে ক্রিয়াশীল হয়। প্রথমতঃ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে, দ্বিতীয়তঃ মনের গভীরে অনুসন্ধান করে 'মনে করতে' হয়।[1] কবিতা মুখস্থ বলা, অঙ্ক করা এসবই স্বতঃস্ফূর্ত স্মৃতিশক্তির উদাহরণ। শুধু তাই নয়, জন্মের পর থেকে আমরা যে সকল জ্ঞান লাভ করি — যেমন হাঁটতে শেখা, ভাষা শেখা, এই সবই স্বতঃস্ফূর্ত স্মৃতিশক্তির মাধ্যমে মানুষের প্রতিদিনের অভ্যাসে পরিণত হয়। আবার শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া ছাড়াও সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কেও মানুষ জ্ঞানলাভ করে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম বাহিত হয়ে সেই সকল সমাজবোধ ও ট্যাবু গণস্মৃতিতে থেকে যায় এবং ক্রমশ ব্যক্তি তথা গোষ্ঠীর অভ্যাসে পরিণত হয়।

দ্বিতীয় ধরনের যে স্মৃতিশক্তি অর্থাৎ মনের গভীরে সচেষ্ট অনুসন্ধান করে 'মনে করা', তাকেই ইংরেজীতে remembering বলা হয়। এটি শুধুমাত্র কোন মানসিক শক্তি নয়, এটি একটি মানসিক ক্রিয়া। অতীতকে যখন এইভাবে অবচেতনার গভীর স্তর থেকে তুলে আনা হয়, তখন আমাদের মন ও মস্তিষ্ক জটিল চিন্তাধারার দ্বারা আবর্তিত হয় — যা আমাদের ভিতরে একই সঙ্গে দুটি ভিন্নমুখী অনুভবকে ক্রিয়াশীল করে তোলে। প্রথমতঃ একটি টেনশন অথবা উদ্বেগ, দ্বিতীয় বিষয়টি হল relaxation বা শিথিলতা ও প্রশান্তি। এই যে অবচেতনার অন্ধকার থেকে তুলে এনে মনের মধ্যে স্মৃতিতে ভাসিয়ে তোলা, একে বলা যায় — "movement of memory at work"।[2] এই স্মৃতিকে এরপর বাঙ্ময় করে তোলা অপর একটি সক্রিয়তা। বলা যেতে পারে 'মনে করা' এই পুরো ক্রিয়াটি 'ভুলে যাওয়া'র বিরুদ্ধতা করা। অর্থাৎ 'মনে করা ' ক্রিয়াটির সঙ্গে ব্যক্তির সচেতন উদ্যোগ ও পরিশ্রম যে অন্বিত হয়ে থাকে, এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

দেশভাগ কেন্দ্রিক স্মৃতিচারণা হল remembering অর্থাৎ এটি স্বতঃস্ফূর্ত ঘটনা নয়। এই যে মনের অতল থেকে কষ্ট করে তুলে এনে স্মৃতিচারণ করা, বলা বাহুল্য, তা অনুপুঙ্খ হবে না। সময়ের ক্রমও সঠিকভাবে বজায় থাকে না অনেক সময়। মনের ভিতর যা একটি ছবি বা ইমেজ মাত্র হয়ে ছিল, তাকেই উপস্থাপনা করা হয় স্মৃতিচারণার মাধ্যমে। স্মৃতিচারণার ক্ষেত্রে এই উপস্থাপনার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বতঃস্ফূর্ত স্মৃতিশক্তির ক্ষেত্রে যার স্মৃতি তার কোন স্বাধীনতা থাকে না। কিন্তু 'মনে করা' ও উপস্থাপনা — এই দুটি ঘটনার ক্ষেত্রে স্মরণকর্তার একটা স্বাধীনতা থাকে। কারণ এই দুই প্রক্রিয়া বাস্তবকে অনুসরণ করে, অনুকরণ নয়। সুতরাং বলা যেতে পারে স্বতঃস্ফূর্ত স্মৃতিশক্তির বিপরীতমুখী প্রবণতা 'মনে করা' বা remembering-এর। মানুষ মনের ভিতর কিছু ইমেজকে ভাসিয়ে তোলে, আবার কিছু কিছু ইমেজকে ভুলে থাকতে চায়। সেখানে সে প্রথমেই স্বাধীনতা নেয়। এরপর সে সেইসব ভেসে ওঠা চিত্রকে প্রকাশ করে অর্থাৎ ভাষার মাধ্যমে উপস্থাপিত করে। উপস্থাপনা কিন্তু একটি নির্দিষ্ট কথনরীতি মেনে চলে এবং সেই কারণেই মনের ভিতরের বিক্ষিপ্ত স্মৃতিগুলি নির্দিষ্ট আকার ও আয়তনের একটি সুসংবদ্ধ 'লেখা' হয়ে ওঠে। স্মৃতিচারণার সময়ে, সুতরাং, অতীতের কিছু অংশ বাদ দেওয়া হয়, কিছু অংশ গ্রহণ করা হয় এবং ভাষার কৃৎকৌশলে তারপর স্মৃতিচারণা একটি নির্দিষ্ট বয়ানে পরিণত হয়।

কিন্তু মনে রাখতে হবে স্মৃতির একটি প্রধান দাবি সে অতীতের কাছে বিশ্বস্ত থাকতে চায়। কিন্তু একথাও ভুললে চলবে না, যেভাবে স্মৃতি সংঘটিত হল এবং একটি বয়ান তৈরি হল, সেই বয়ান কখনও অতীতের একশ শতাংশ যথাযথ সাক্ষ্য হতে পারে না। এক্ষেত্রে অপর একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল 'ভুলে যাওয়া' — যা নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন। একথা ঠিক 'মনে করা' 'ভুলে যাওয়া'র বিরুদ্ধে যেন একটি সংগ্রাম, আবার একথাও অস্বীকার করা যায় না 'ভুলে যাওয়া' ব্যাপারটি ঘটে অনেক ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট অভিপ্রায় অনুযায়ী। সুতরাং খুব স্পষ্ট করে বললে বিষয়টি এরকম দাঁড়ায়, স্মৃতিচারণা শুধুমাত্র যান্ত্রিক বর্ণনা নয়, পরন্তু অতীতের বাস্তবতাকে নতুন পরিসর দেওয়া। এই ঘটনার পিছনে ক্রিয়াশীল থাকে অভিপ্রায় ও নির্মাণ কৌশল। বস্তুতঃ যে কোন শিল্পের মতই স্মৃতিচারণাতেও গ্রহণ, বর্জন, নির্বাচন ও অভিপ্রায় অনুযায়ী উপস্থাপনের প্রক্রিয়াটি ক্রিয়াশীল থাকে। অভিপ্রায় অনুযায়ী উপস্থাপনার সহায়ক হয়ে ওঠে স্মৃতিচারণার প্রকাশ শৈলী।

সুতরাং স্মৃতিচারণাগুলি অবশ্যই স্বতঃস্ফূর্ত নয়, উপস্থাপনা-ভঙ্গির বৈশিষ্ট্যগুণে এগুলি হয়ে ওঠে 'নির্মাণ'। এক্ষেত্রে Paul Recoeur এর বক্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে — "It is, more precisely, the selective function of the narrative that opens to manipulation the opportunity and the means of clever strategy, consisting from the outset in a strategy of forgetting as much as in a strategy of remembering."[3] 'সুতরাং স্মৃতিচারণা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে অবশ্যই বোঝা দরকার সেই বিশেষ অভিপ্রায়ের ধরনটিকে যা ব্যক্তির 'মনে করা' ও ভুলে যাওয়া'র নৈতিক পরিসরটিকে নির্ধারণ করে। বিভিন্ন সমবায়ে সংযুক্ত ব্যক্তির গোষ্ঠীগত অবস্থানই নির্দিষ্ট করে অতীতের বাস্তব সম্পর্কিত তার ধারণা ও বিশ্লেষণকে এবং অবশ্যই তার নির্দিষ্ট অভিপ্রায়টিকে। কিছু উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। ১৯৪৬ সালের ১৬ই অগাষ্ট যে ভয়ংকর দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছিল কলকাতার বুকে, সে সম্পর্কে বিখ্যাত কম্যুনিষ্ট নেতা জ্যোতি বসু বলেছেন — ''কিন্তু দাঙ্গার প্রধান উসকানিদাতা ছিল ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা। ... দেশকে বিভক্ত করার পক্ষে যুক্তি জোরদার করার জন্য দাঙ্গা বাধিয়ে দিতে হবে।"[4] দুটি অনুচ্ছেদ পরে আবার তিনি লিখেছেন — ''আমরা বলতে পারি, হিন্দু ও মুসলিমদের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ দেশভাগ চাননি — এমনকি কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের একাংশও দেশভাগের বিরোধী ছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্ররোচনায় দুই সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িকতাবাদী শক্তিগুলিই দাঙ্গা শুরু করে।"[5] দেশভাগের ক্ষেত্রে ইংরেজদের ভূমিকা যে অত্যন্ত ন্যক্করজনক ছিল, সে কথা জাতীয়তাবাদী ইতিহাস বারংবার বলেছে। কিন্তু শুধুই কি সেটুকু? হিন্দু মুসলমান শিক্ষিত গোষ্ঠীর মধ্যে অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাই যে রাজনৈতিক পরিসরে বিস্তৃত হয়ে গিয়েছিল; সে কথাও তো লেখা আছে ঐতিহাসিক তপন রায়চৌধুরীর স্মৃতি রোমন্থনে — ''আমরা ঠাট্টা করে বলতাম আমাদের নামের পাশে 'ও' অর্থাৎ অপ্রেসড লেখা থাকা উচিত। প্রায় সম্পূর্ণভাবে চাকরি নির্ভর বাঙালি হিন্দুর সত্যিতেই মরণদশা ঘটেছিল। ... অনেকেই ভাবত যে, মুসলমান আর ইংরেজ যোগসাজসে হিন্দুর মুখের ভাত কেড়ে নিচ্ছে। আর হিন্দু জমিদার এবং কুসীদজীবী যে তাদের মুখের ভাত কাড়ছে, বর্ধিষ্ণু কৃষক সম্প্রদায় থেকে উঠে আসা নতুন মুসলমান মধ্যবিত্তের এ তো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। ... সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ

বাঙালিকে এক অজানা সর্বনাশের পথে ঠেলে নিয়ে চলেছে। এই অশুভ সম্ভাবনা সম্পর্কে আমরা ছাত্ররা বিশেষ সচেতন ছিলাম।"[6] আদর্শবাদী কম্যুনিস্ট নেতা জ্যোতি বসু বাঙালি মানসের প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িকতাকে বিচ্ছিন্ন ব্যাপার হিসেবে দেখেছেন, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকেই তিনি দেশভাগের জন্য একমাত্র কারণ ভেবেছেন। বৃহত্তর বিপ্লবের আদর্শ ও স্বপ্ন কোনোভাবে বিঘ্নিত হতে পারে — এমন কোনো নেতিবাদকে তিনি তাঁর চিন্তায়, স্মৃতিচারণায় স্থান দিতে চাননি অথবা ভুলে থাকতে চেয়েছেন।

দাঙ্গা-পরবর্তী সময়ে সর্বদলীয় শান্তি কমিটির উদ্যোগে কলকাতার রাস্তায় সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মিছিল বের হয়। এ সম্পর্কে জ্যোতিবাবু বলেছেন — ''শান্তির সংগ্রামে আমাদের পার্টির তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকার কথা মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দিও স্বীকার করেছিলেন। ... সাধারণ ভাবে এটা বলা চলে যে, শান্তির অভিযানকে কেন্দ্র করে ব্যাপক ঐক্য গড়ে ওঠে এবং উভয় সম্প্রদায়ের দাঙ্গাবাজদের সংযত করা সম্ভব হয়, জনসাধারণের মনে আস্থা ফিরিয়ে আনা যায়।"[7] স্পষ্টতই জ্যোতিবাবু সাম্প্রদায়িক-বাস্তবতার ঊর্ধ্বে উঠতে চেয়েছেন, অন্যদিকে তপনবাবুর লেখনীতে এই শান্তি মিছিলের ছবি পৃথকভাবে ধরা পড়েছে — ''... লুঙ্গিধারী বীরদের একজন ঝাঁটার কাঠিতে একটা ন্যাকড়া বেঁধে মাথার উপর তুলে ধরলেন এবং ''পীইইচ, পীইইচ (অর্থাৎ peace, peace) বলে আওয়াজ দিলেন। শান্তির বীজ উর্বর মাটিতেই পড়ল। 'পীচ, পীচ' ধ্বনির প্রতিধ্বনি সনাতন হিন্দুধর্মের রক্ষাকর্তাদের কণ্ঠেও ধ্বনিত হল। তারপর শান্তিচুক্তি পাকা করার উদ্দেশ্যে দুই গণনেতা রাস্তার মাঝখানে neutral ground-এ নেমে এলেন। তারপর প্রীতি ও ভীতিপূর্ণ আলিঙ্গন।"[8] কথনশৈলী ও শব্দপ্রয়োগে শান্তি মিছিল সম্পর্কে তপনবাবু ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতাকে বিন্দুমাত্র গোপন করেননি। গণনেতাদের বিশেষতঃ সুরাবার্দি সম্পর্কে তাঁর মনোভাব কোনোভাবেই ইতিবাচক ছিল না। দাঙ্গার দিন প্রশাসনের ভূমিকা সম্পর্কে তিনি বলেছেন — ''সুরাবর্দি সাহেব স্বেচ্ছায় দাঙ্গার প্রশ্রয় দিয়েছিলেন কিনা জানি না। কিন্তু এই পুলিশ এবং দমকলের অন্তর্ধান কেন এবং কীভাবে হল, তার ব্যাখ্যা কেউ দেয়নি।"[9] পরবর্তী অনচ্ছেদে আবার তিনি বলেছেন — ''কিন্তু রাস্তা থেকে পুলিশ প্রত্যাহার করে দাঙ্গাকারীদের যথেচ্ছ খুনজখম করার পথ পরিষ্কার করা শুধু অনবধানতার ফল — একথা বিশ্বাস করা কঠিন।"[10] তপনবাবু অবশ্যই অসাম্প্রদায়িক ও জাতীয়তাবাদী মনোভাবাপন্ন

ব্যক্তিত্ব। অথচ সুরাবর্দির প্রতি তাঁর বিরক্তি গোপন থাকেনি। বস্তুতঃ এই সময়ের স্মৃতিচারণায় হিন্দু ও মুসলমানের, এমনকি যাঁরা তথাকথিত অসাম্প্রদায়িক, তাঁদেরও ধারণাগত পার্থক্য ছিল বলেই, 'মনে করা'র ভঙ্গিটি এমনকি অনেক সময় বিষয়বস্তুও — দুই গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে পৃথক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুরাবর্দির প্রতি বিরক্তি ও ক্রোধ ছিল হিন্দুদের। সমাজকর্মী ও রাজনীতি বিশেষজ্ঞ অশোক চৌধুরী নোয়াখালি দাঙ্গার পরে গান্ধীজির নোয়াখালি সফর পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। তপন রায়চৌধুরীর মার্জিত প্রকাশভঙ্গীর সীমা অতিক্রম করে অশোকবাবু তাঁর ক্রোধ প্রকাশ করেছেন দাঙ্গার স্মৃতিচারণায় — ''বাংলাদেশে এই সময়ে দুই বর্বরের মৈত্রী হয়েছিল। একজন বাংলার প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দি ও অন্যজন গর্ভনর ব্যারোজ।''[11] বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান সুরাবর্দির ভূমিকা নিয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলেছেন — ''শহীদ সাহেব সমস্ত রাতদিন পরিশ্রম করেছেন, শান্তি রক্ষা করবার জন্য।''[12] লেখক আবু রুশ্‌দ্‌ সুরাবর্দিকে সংখ্যালঘু মুসলমানদের রক্ষাকর্তা ও মহৎ নায়ক হিসেবে মনে রেখেছেন — ''... কোনো মুসলমান ব্যক্তি বা পরিবার মারমুখী হিন্দু জনতা দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকবার সময় শহীদ সাহেব শুধু একটা বডিগার্ড নিয়ে জীপে করে সেখানে হাজির হতেন আর নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে তাদেরকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে আসতেন। এই যে মানবতা-বোধ ও ব্যক্তিগত শৌর্য তা পরিষ্কারভাবে নায়কোচিত গুণ, তা কিন্তু কীর্তিত হয় নি।''[13] সুরাবর্দির ভূমিকার প্রশংসায় মাত্রাগত প্রভেদ থাকলেও ওপার বাংলার মুসলমান জনগোষ্ঠীর স্মৃতিচারণার দৃষ্টিভঙ্গির সাযুজ্য বেশ স্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করা যায়। ১৬ই অগাষ্টের হত্যালীলার দায়ভাগ কোন্‌ গোষ্ঠীর বেশি ছিল? এ বিষয়ে আবার তপনবাবুর বক্তব্য উদ্ধৃত করছি — ''১৬ই অগাষ্ট সকালবেলা বীডন স্ট্রীটের মোড়ের একটা মিষ্টির দোকান সার্কুলার রোডের বস্তিবাসীরা লুঠ করল। ঘটনাটা দেখলাম। লুটেরারা সবুজ ঝাণ্ডা নিয়ে এবং শোভাযাত্রা করে এসেছিল ঠিকই, কিন্তু মিষ্টির দোকান লুঠটা কারও রাজনৈতিক কর্মসূচীর অঙ্গ ছিল বলে মনে হয় না। পরে শুনি যে কলকাতা শহরের গণহত্যার প্রথম সূচনা ঐ ঘটনা থেকে।''[14] 'বাঙালনামা গ্রন্থে এই একই ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি আরও লিখেছেন — ''বিকেল নাগাদ্‌ নতুন এক রাজনৈতিক থিসিস কানে এল, — ''অফেন্‌স্‌ ইজ দা বেস্ট মিন্‌স্‌ অফ ডিফেন্স' অর্থাৎ ''হে হিন্দু সন্তানগণ, খরকরবাল হাতে নিয়ে এবার তোমার যবননিধনের জন্য প্রস্তুত হও।''[15] দাঙ্গাকারী দুই গোষ্ঠীর প্রতিই তপনবাবুর ঘৃণা

বর্ষিত হয়েছে। কিন্তু একথাও অনুক্ত থাকেনি তাঁর স্মৃতিলেখায় যে প্রথম আক্রমণকারী মুসলমান এবং হিন্দুরা প্রত্যাঘাত করেছিল পরে। অন্যদিকে মুসলমান গোষ্ঠী কি বলছেন? ওপার বাংলার বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ও লেখক আবদুল মোহাইমেন লিখেছেন — ''... ১৬ই আগষ্ট ভোর থেকেই হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় মুসলমানদের উপর সশস্ত্র আক্রমণ আরম্ভ করে দেয়।''[16] মুজিবুর রহমানও লিখেছেন — ''মুসলমানরা মোটেই দাঙ্গার জন্য প্রস্তুত ছিল না, একথা আমি বলতে পারি।''[17]

এই সকল স্মৃতিলেখা থেকে সঠিক তথ্য উদ্ধার বিভ্রান্তিকর হয়ে যেতে বাধ্য। কিন্তু নিশ্চিতভাবে যা বোঝা যায়, ব্যক্তির স্মৃতির পিছনে ক্রিয়াশীল থাকে গোষ্ঠীগত প্রেরণা — যা লিখনশৈলীর অন্তরালে বিশেষ অভিপ্রায় হিসেবে কাজ করে ও স্মৃতিকে, ধারণাকে, বিশ্লেষণকে প্রভাবিত ও চালিত করে। আবার ব্যক্তি একই সঙ্গে একাধিক গোষ্ঠীর অন্তর্গত থাকে। ব্যক্তির সমাজ ও সেই সকল গোষ্ঠী, সামাজিক নির্দেশ, প্রতিষ্ঠানসমূহ, ইত্যাদি সকল কিছুই তার সামাজিক রাজনৈতিক সত্তা-পরিচয়কে নির্মাণ। সুতরাং ব্যক্তি যা মনে রাখে অথবা যা ভুলে যায়, বস্তুত বিচিত্র ও জটিল সমবায়ে আবদ্ধ গোষ্ঠীসত্তাই তাঁর পিছনে সক্রিয় থাকে। তাই বলা যেতে পারে কোন ব্যক্তিই এককভাবে স্মৃতিচারণ করতে সক্ষম নয়। Paul Recoeur এর কথায় — "a person remebers only by situating himself within the view point of one or several groups and one or serveral currents of collective thoughts."[18] সুতরাং বলা যেতে পারে স্মৃতিচারণকে ব্যক্তিগত ও নিজস্ব বলে মনে করা একধরনের ভ্রান্তি। এমনকি স্মৃতিচারণার যে ভাষা, সেই ভাষার মূল কাঠামোও কিন্তু সামাজিক নির্মিতি।

তবুও একই গোষ্ঠীর বিভিন্ন মানুষের স্মৃতিচারণার ক্ষেত্রে পার্থক্য তো থাকেই। সুরাবর্দির প্রতি অসহিষ্ণুতার প্রকাশে তপনবাবু ও অশোকবাবুর মাত্রাগত প্রভেদ ছিল। জ্যোতিবাবুর লেখায় সেই অসহিষ্ণুতা একেবারেই নেই। কারণ তিনি হিন্দু হলেও অন্য কোনো দলীয় নীতির সঙ্গে নিজেকে সংলগ্ন রেখেছিলেন। আবার বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিকথা অনুসরণ করলে দেখবো, তাঁর লেখায় প্রথম দিকের মুসলিম জাতীয়তাবাদকে পরবর্তী পর্যায়ে প্রতিস্থাপিত করেছে বাঙালি জাতীয়তাবাদ। বস্তুতঃ ব্যক্তিমানুষ একই সঙ্গে একাধিক আত্মপরিচয় বহন করে। একটি মানুষের ধর্মীয় পরিচয়ের

সঙ্গেই তাঁর শ্রেণি, লিঙ্গ, রাজনৈতিক আদর্শ, পেশা ইত্যাদি বিভিন্ন আত্মপরিচয় তাঁর বয়ানকে বিশিষ্ট করে তোলে। রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে কোন বিশেষ ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে অনেক মানুষ মিলে তাঁদের সাধারণ একটি বিশেষ পরিচয়কে প্রাধান্য দেয় এবং সেটিই তাঁদের প্রধান গোষ্ঠী পরিচয় হয়ে ওঠে। কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই ব্যক্তির সেই প্রধান সমষ্টিগত পরিচয়ের সঙ্গে তার মধ্যে বহুস্বরের সুযোগও থাকে। কারণ প্রতিটি মানুষ একই সঙ্গে অনেক কিছু, আবার বিভিন্ন মানুষের ক্ষেত্রে তাদের গোষ্ঠীর সমবায়টি বিভিন্ন ও বিচিত্র। তাই একই মানুষের স্মৃতির ভাষ্যে বহুস্বর, আবার বৃহত্তর গোষ্ঠীপরিচয়ে আবদ্ধ বিভিন্ন মানুষের স্বরও বিভিন্ন। এ বিষয়ে Maurice Halbwach বলেছেন — "I would readily acknowledge that each memory is a viewpoint on the Collective Memory, that this view point changes as my position changes, that this position itself changes as my relationships to other milieus change.[19] মানুষ কখন কোন্ সমষ্টি পরিচয়কে প্রাধান্য দেবে তা নির্ভর করে তাঁর সেইমুহূর্তের প্রেক্ষিত ও ইতিহাসের উপর। বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিকথায় বিশেষ রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে মুসলমান আত্মপরিচয়ের প্রসঙ্গ এসেছে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এসেছে বাঙালির আত্মপরিচয়ের প্রসঙ্গ। এইভাবে দেখবো স্মৃতিকথায় যেভাবে মানুষের বিভিন্ন সত্তাপরিচয় ধরা পড়ে তা বেশ জটিল।

দেশহারানোর বেদনার্ত স্মৃতির অনেক কিছুই মানুষ ভুলে যেতে চায় অথবা চেপে রাখতে চায়। কারণ এই স্মৃতির সঙ্গে জড়িত থাকে হিংস্রতা ও ভয়াবহতার ছবি, যা প্রত্যক্ষদর্শীর মনে ট্রমা তৈরী করে দেয়। ধর্ষণের স্মৃতি তাই নারী ভুলে যেতে চায়, হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনদের জন্য বেদনা অথবা অতি চেনা মানুষের বিশ্বাসঘাতকতা চেপে রাখতে চায়। যেমন দয়াময়ী দেশত্যাগের মুহূর্তে তাঁর মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কী ভেবেছিলেন, পরবর্তী সময়ে স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে সে কথা ব্যক্ত করেছেন — 'সেদিন মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আর কখনও দেশের কথা উচ্চারণ করব না। মা আর আমার মধ্যে চিরকাল দেশের প্রসঙ্গ অনুচ্চারিত ছিল।"[20] আবার অনেক সময় কোন গোষ্ঠী যৌথভাবে কোনো স্মৃতিকে নাকচ করে দিতে চায় বিভিন্ন রাজনৈতিক অথবা সামাজিক কারণে। দেশবিভাজনের পরে বাম সংস্কৃতির

প্রভাবে বাঙালি সতর্ক ছিল দাঙ্গা, অবমাননা, বঞ্চনা ইত্যাদি বিষয়ে কোন কিছু বলার অথবা লেখার প্রসঙ্গে। দেশহারানোর স্মৃতি তো শুধুই বেদনার নয়, তা একই সঙ্গে হতাশার ও বিতৃষ্ণারও বটে। কারণ দেশ হারানোর অর্থ হল একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের উপর একটি গোষ্ঠীর অধিকার ও ক্ষমতা হারানো। সভ্যতার আদিলগ্ন থেকেই ভূখণ্ড দখল, গোষ্ঠী নির্মাণ ইত্যাদির ইতিহাসের সঙ্গে হিংসার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অপর কোন গোষ্ঠীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অথবা সরাসরি সংঘর্ষের সময়ে গোষ্ঠীসত্তা নতুনভাবে গড়ে ওঠে অথবা ঐক্য দৃঢ় হয়। অপরপক্ষে, নিজগোষ্ঠীর উপর আক্রমণের স্মৃতি ফিরে ফিরে আসে। কিন্তু অন্য গোষ্ঠীর উপর নিজ গোষ্ঠীর দমন পীড়ন এমনকি ঘৃণাও নিজ গোষ্ঠীর সত্তা প্রতিষ্ঠার অহংকার হয়ে দাঁড়ায় এবং অপরের যন্ত্রণার স্মৃতি মানুষ ভুলে যায় — বলা ভাল ভুলে যেতে চায়। যেমন অশোক চৌধুরী মহাশয়ের স্মৃতিচারণার কথা উল্লেখ করা যায়। নোয়াখালির দাঙ্গা বিধ্বস্ত অঞ্চলে কাজ করতে গিয়ে দাঙ্গার বর্ণনা নির্যাতিতদের মুখ থেকে সরাসরি শুনেছিলেন ধরে নেওয়া যেতে পারে। তাঁর বর্ণনা ভঙ্গি থেকেই বোঝা যায় দাঙ্গা, লুঠ, ধর্ষণ তাঁর চোখে দেখা নয়, কানে শোনা। যেমন — ''প্রতিবেশী মুসলমান যারা বহুযুগ ধরে পাশাপাশি শান্তিতে বসবাস করে এসেছে — একদিন তারাই দলবদ্ধবাবে এসে বাড়ি লুঠ করেছে। গৃহদাহ করে আশ্রয়হীন করেছে। নারীদের ধর্ষণ করেছে।''[21] লক্ষণীয় বিষয় দুটি, তাঁর স্মৃতির বর্ণনায় একাধিকবার ফিরে এসেছে অপর গোষ্ঠীর নিষ্ঠুরতার কাহিনি এবং তিনি সাধারণ ভাবে গোটা মুসলমান সমাজকেই ঘটনার জন্য দায়ী করেছেন। তাঁর ক্রোধ ও ঘৃণা কথনশৈলীতে তীব্রভাবে ধরা পড়েছে। আবদুল মোহাইমেন স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন, দাঙ্গা পরবর্তী সময়ে তাঁর মন এতটাই হিংস্র হয়ে উঠেছিল যে হিন্দু নিধনের ঘটনা শুনে তিনি তৃপ্তি পেতেন। তিনি সেই সময়ে তাঁর মনোভাব বর্ণনা করেছেন — ''বিভিন্ন এলাকায় মুসলমানদের উপর যে অত্যাচার হয়েছিল তার কিছুটা হলেও যেন প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে।''[22] যদিও অশোকবাবু ও মোহাইমেন সাহেবের 'স্মৃতি'-র কিছু পার্থক্যও আছে। নিজ গোষ্ঠীর উপর আক্রমণের স্মৃতি অশোকবাবুকে তাঁর 'বর্তমান'-এও, অর্থাৎ ঘটনার অনেক বছর পর যখন তিনি স্মৃতিলেখা তৈরী করেছেন; তখনও ঘৃণা উদ্‌গীরণে উদ্বুদ্ধ করেছে। মোহাইমেন সাহেব কিন্তু তাঁর স্মৃতিচারণে সে ঘৃণাকে অতিক্রম করতে চেয়েছেন। তাঁর কথনশৈলীতে এই সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

Identity অথবা আত্মসত্তার পরিচয়কে সুদৃঢ় করার জন্য অনেক সময়েই 'অপর' গোষ্ঠীকে বিপদ্‌জনক ধরে নিয়ে সংঘাতপূর্ণ সম্পর্ক ও স্মৃতি তৈরী করা হয়। ইতিহাস অনুযায়ী বিশ শতকের প্রথমে হিন্দুদের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে আত্মপরিচয় স্থাপনের জন্য বাঙালি মুসলমানকে আন্দোলন ও সংঘাতের পথে যেতে হয়েছিল। অন্যদিকে এই আন্দোলনে পিছু-হঠা বর্ণ হিন্দুর অপমানিত সত্তা স্মৃতিতে ধরে রাখতে চেয়েছে আতঙ্ক ও বিষণ্ণতাকে। অকারণ বিপদ্‌জনক মনে করেছে সমগ্র মুসলমানগোষ্ঠীকেই। 'স্মৃতি' এইভাবে বর্ণহিন্দুর সত্তা পরিচয় হয়ে উঠেছে এবং এই বিশেষ স্মৃতি ও সত্তা প্রমাণ করে যে সেই সময়ে তাদের সত্তাপরিচয় ছিল অসহায় ও ভঙ্গুর। বোঝা যায় তাদের নিরাপত্তাহীনতা। বস্তুতঃ সেই সময়ে পূর্ববঙ্গ থেকে উৎখাত হওয়া হিন্দুদের সত্তাপরিচয়ের ক্ষেত্রে অপর এক অভিনব সংকট উপস্থিত হয়েছিল। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে তাঁরা আর কাঙ্খিত নয়। অন্যদিকে ভারতবর্ষও তাদেরকে 'শরাণার্থী' হিসেবে আখ্যা দিয়ে 'অপর' করে রেখে দিয়েছিল। অন্যদিকে নিম্নবর্গীয় হিন্দুরা পূর্ববঙ্গ থেকে এসে ক্যাম্পে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। তাদের নিরাপত্তাহীনতার স্মৃতি আরও মর্মস্পর্শী এবং বিবমিষা উদ্রেককারী। লক্ষণীয় স্মৃতিলেখায় দেখি তাঁদের কাছে 'অপর' উচ্চবর্ণের হিন্দুরা এবং মুখ্যত রাষ্ট্রব্যবস্থা, মুসলমানগোষ্ঠী নয়। দলিত লেখক মনোরঞ্জন ব্যাপারী লিখেছেন — ''... কোথাও কোন জবরদখল কলোনিতে নীচু জাত হবার অপরাধে এদের জন্য কোন প্লট দেবার নিয়ম ছিল না।''[23] কিছু পূর্বে আরও তীব্র ক্রোধের সঙ্গে উচ্চবর্ণীয়দের উল্লেখ করে লিখেছেন ''... কিছু জাতিগত ধূর্ততা শঠতার কৌশলে চাকরি ব্যবসা বা অন্য কোন উপায়ে রুজি রোজগার ধনাগমের সুব্যবস্থা করে নিতে বিশেষ কোন অসুবিধার সামনে পড়ে নি। এরা সুখেই ছিল এবং সত্য এটাই যে অনেকে এত সুখ পূর্ববাংলায়ও ভোগ করতে পারেনি।''[24] অথচ অন্যদিকে উচ্চবর্ণের নীলিমা দত্ত প্রমুখদের লেখায় কোন সুখস্মৃতির কথা নেই, পরন্তু বারংবার ফিরে এসেছে জবরদখল জমিতে কলোনী স্থাপন করার জন্য ভয়ংকর সংগ্রামের কাহিনি। স্মৃতির এই বৈপরীত্য বস্তুতঃ ভারতের বুকে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের সংঘাতময় দিকটির প্রতিই অঙ্গুলি সংকেত করে যা দেশভাগের পূর্ববর্তী সময় থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত সমানভাবে ক্রিয়াশীল ও প্রাসঙ্গিক। এইভাবে দেখবো বিভিন্ন গোষ্ঠীর দেশভাগের স্মৃতির বয়ানে সত্তা-প্রতিষ্ঠার রাজনীতি মুখ্য হয়ে উঠেছে। নিম্নবর্ণের মানুষের বয়ানে সেই প্রকাশ ক্রোধের

মাধ্যমে। অপরপক্ষে উচ্চবর্ণের মানুষ তাঁদের দেশভাগের স্মৃতিচারণায় নিঃশব্দে ভুলে থাকতে চেয়েছেন দেশভাগের পরে নিম্নবর্গীয়দের মর্মান্তিক পরিণতিকে। 'ক্রোধ' এবং 'ভুলে যাওয়া' এই দুটিই আত্মসত্তা পরিচয়ের রাজনীতির প্রকাশ বলা যেতে পারে।

বলাবাহুল্য, আত্মসত্তার পরিচয় নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠার এই রাজনীতি স্মৃতিবর্ণনার কথনভঙ্গিতেও প্রভাব বিস্তার করে। এই বিশেষ কথন প্রকৃতিপক্ষে 'অপর'কে অধীনস্থ রাখার, কর্তৃত্ব কায়েম রাখার এক প্রক্রিয়ামাত্র। শুধুমাত্র দৈহিকশক্তির মাধ্যমেই যে ক্ষমতার প্রয়োগ করা হয়, তা নয়। 'ক্ষমতা' এক বিশেষ 'ভাষা' তৈরী করে নেয় — যার দ্বারা ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নিজের আত্মপরিচয় ও ক্ষমতাকে 'অপর' এর উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। যেমন বর্ণহিন্দু গোষ্ঠীর গোপাল চন্দ্র মৌলিক তাঁর স্মৃতির কাহিনিতে বলছেন এক সমসের আলির কথা — যে গোপালবাবুদের বাড়ির চাকর ছিল। দেশভাগের পর সমসের গোপালবাবুদের পরিবারকে অপমান করার জন্য বাড়ির যুবতী বিধবা কন্যা ননীকে বিবাহ করতে চায়। সমসের আলির কথা শুনে গোপালবাবুর কাকার প্রতিক্রিয়ার কথা লেখক যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন — ''কাকা ভাবলেন কাল গ্রামের লোকের সঙ্গে চলে গেলে এত বড় স্পর্ধার কথা শুনতে হত না।''[25] গোপালবাবুর স্মৃতিলেখায় এরপর বর্ণিত হয়েছে এক অহংকারের কাহিনি। সে কাহিনিতে দেখি সমসের আলির হতদরিদ্র ''লেংটি'' পরা ঠাকুরদা তাঁর বাবার দয়ার ভিখিরি হয়েছিল এবং বাবার দয়ায় জমিদার বাড়িতে কাজ পেয়েছিল। পদানত, দয়ার ভিখিরির পুত্র সমসের আলির আচরণকে গোপালবাবু তাই 'স্পর্ধা' বলে চিহ্নিত করেছেন। বলাবাহুল্য, দেশভাগ প্রসঙ্গে তাঁর পুরো বয়ান ও শব্দ ব্যবহার উচ্চবর্ণের হিন্দুর ক্ষমতার দম্ভকেই চিহ্নিত করে। আবার পূর্ব পাকিস্তানের বিখ্যাত লেখক আবুল মনসুর আহমদ তাঁর বাল্যের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছেন, উচ্চবর্ণের নায়েব যেহেতু তাঁর বাবা-ঠাকুরদাকে 'তুই' বলে সম্বোধন করতেন, বাল্যবয়সেই এতে তিনি অপমানিত বোধ করে নায়বকেও প্রত্যুত্তরে 'তুই' বলেন। শুধু তাই নয় অপমানিত নায়েবের নালিশ শুনে তাঁর দাদাজী তাঁকে শাসন করলে তিনি জবাব দেন — ''আপনে বাপজী কেউই ত বয়সে ছোট না, তবে আপনেগরে নায়েব বাবু 'তুমি' কয় কেন''?... দাদাজী নিরুত্তর। কারও মুখে কথা নাই। নায়েব আমলাদের মুখেও না। আমার বুকে সাহস আসিল। বিজয়ীর চিত্ত-চাঞ্চল্য অনুভব করিলাম।''[26] ''স্পর্ধা'' শব্দটির অপর দিক এই বয়ানে

ধরা পড়েছে। ক্ষমতার অতি দর্পের বিপরীতে পাল্টা প্রত্যাঘাত, তাই 'স্পর্ধার'-র বিপরীত শব্দবন্ধ হয়ে ওঠে ''বিজয়ীর চিত্তচাঞ্চল্য''।

সুতরাং দেশভাগের স্মৃতিচারণার আলোচনায় সত্তা পরিচয়ের প্রসঙ্গ স্বাভাবিক কারণেই চলে আসে। তবে প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী অতীতকে নিয়ে জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রাধান্য পাবে অতীতের পাথুরে প্রমাণ যার উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে ইতিহাসচর্চা। তাহলে স্মৃতির অভিপ্রায়মূলক দিকটি নিয়ে অবশ্যই প্রশ্ন উঠে যায় — দেশভাগের স্মৃতি কি ঐতিহাসিক তথ্যের বিভ্রান্তি ঘটায়? বস্তুতঃ স্মৃতির সঙ্গে ইতিহাসের একটি দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক আছে এরকম মনে করা হয়। স্মৃতিকাহিনি থেকে ইতিহাস উপাদান সংগ্রহ করে। আবার স্মৃতির সবথেকে বড় সমস্যা তৈরি হয় তথ্যনিষ্ঠতা ও বিশ্বাসযোগতার ক্ষেত্রে। অন্যপক্ষে, ইতিহাসচর্চার একটি বৈজ্ঞানিক চরিত্র আছে। ইতিহাসের যে কোন ঘটনা ও চরিত্র নির্দিষ্ট সময় দ্বারা চিহ্নিত এবং যে কোন ঘটনা ও চরিত্র তার পারিপার্শ্বিক ও প্রেক্ষাপটের তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনার মাধ্যমে ঐতিহাসিক বাস্তব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এইভাবেই নির্দিষ্ট সময়ের ইতিহাস-সিদ্ধ বাচনিক ভাষ্য তৈরি হয়। কিন্তু বিশ শতকের প্রথমে রাজবৃত্তের ইতিহাসচর্চা থেকে যখন সামাজিক ইতিহাসচর্চার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়, তখন থেকেই ইতিহাস শুধুমাত্র তথ্য নির্ভর হয়ে রইল না। ইতিহাসচর্চায় যুক্ত হল তথ্যের ব্যাখ্যা ও উপস্থাপনা। সুতরাং এইবার ইতিহাসের 'নিছক' সময় দ্বারা চিহ্নিত চরিত্রে কিছু বিচ্যুতি দেখা দিল, কারণ ব্যাখ্যা ও ভাষিক উপস্থাপনা — এই বিষয়গুলি 'সময়'-এর বাঁধনে আবদ্ধ থাকার বিষয় নয়।

আবার যিনি ঐতিহাসিক, তথ্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিগত স্বাধীনতাও তো থাকে। ঐতিহাসিক তাঁর নিজস্ব উপস্থাপনার স্বপক্ষে তথ্যচয়ন করেন। ঐতিহাসিকের তথ্যচয়ন ও উপস্থাপনাতে গোষ্ঠীর মতাদর্শগত প্রভাব থাকতেই পারে। সুতরাং আধুনিক ইতিহাসচর্চাকে নিছক বস্তুনিষ্ঠ ব্যক্তি নিরপেক্ষ জ্ঞানচর্চা কোনভাবেই বলা যাবে না। এবার তাহলে প্রশ্ন স্মৃতি ও ইতিহাসের সম্পর্ক কি নতুনভাবে নির্ণীত হওয়া দরকার? কারণ স্মৃতি ও ইতিহাস উভয় ক্ষেত্রেই অতীতের পুর্নজাগরণ ঘটে, যা নেই চোখের সামনে তাকেই বর্ণনা, ব্যাখ্যা, উপস্থাপনা করা হয়। সুতরাং এক অর্থে ইতিহাস রচনাও একধরনের স্মৃতিচর্চাই হয়ে দাঁড়ায়। এই কারণেই, বলা যেতে পারে, স্মৃতি বিশ্বাসযোগ্য কিনা এ প্রশ্ন প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসচর্চার আধুনিক পদ্ধতিকেই সন্দেহ করে।

তবে একথাও মনে রাখা দরকার স্মৃতিকে জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে এলে এটিও দেখা দরকার সেই বয়ানে বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের সঙ্গে ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠী-সত্তা নির্ভর উপস্থাপনা কিভাবে সংযোগ রক্ষা করেছে। অর্থাৎ দেখা গেল আধুনিক প্রবণতা অনুযায়ী ইতিহাস রচনার সময় ঐতিহাসিকও অনেকটা স্মৃতিচর্চার মতই অতীতের বিভিন্ন তথ্য থেকে নির্বাচন করেন, যা 'চরম সত্য'-কে কখনই প্রতিফলিত করে না। বস্তুতঃ, আধুনিক ইতিহাসবিদ্যা অনুসারে 'চরম সত্য' বলে কোন ধারণা স্বীকৃত নয়। এরপর ঐতিহাসিক-ভাষ্যে যে ব্যাখ্যা ও উপস্থাপনা যুক্ত হয়, তার দুটি দিক থাকে। একটি যুক্তির দিক, অপরটি কল্পনার। ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিকের মত নিজ মতবাদের স্বপক্ষে সুদৃঢ় যুক্তি অনুযায়ী তথ্যকে সাজান। তারপর নিজস্ব সহানুভূতির সঙ্গে জীবন ব্যাখ্যা করেন এবং এখানে তিনি কল্পনার আশ্রয় নেন। ইতিহাসচর্চায় যদিও এই কল্পনার পরিসর সীমিত — শিল্প-সাহিত্যের মত অবাধ নয়। মনে রাখতে হবে ইতিহাসের মত স্মৃতিচারণাতেও কল্পনার ক্ষেত্র উন্মুক্ত ও বাধাহীন হলে 'স্মৃতি' হিসেবেই সে লেখা বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলে।

তথাপি ইতিহাস ও স্মৃতিচারণায় কিছু পার্থক্য থেকেই যায়। স্মৃতিচারণার ভাষ্যে তত্ত্ব ও প্রমাণ ব্যাতিরেকে স্মরণকর্তার ব্যক্তিগত অনুভূতি ও আবেগ প্রকাশের একটা সুস্পষ্ট জায়গা আছে। মিহির সেনগুপ্তের স্মৃতিচারণায় তিনি লিখেছেন — ''যারা দেশ ছেড়ে চলে গেছে তারা কি আমাদের 'নিজেগো মানুষ'? যাদের সাথে আছি তারা কি 'নিজেগো' নয়, এ দেশটা তবে 'আমাগো জাগা' নয়? তবে নিজেদের মানুষ আর নিজেদের দেশ কোথায় পাব? তার জন্যে আরও হাজার বছর ধরে হাজার বার উদ্বাস্তু হব, কিন্তু তবুও কি কোথাও ঠাঁই পাওয়া যাবে?''[27] দেশভাগ হওয়ার পরেও পূর্বপাকিস্তানে বসবাসকারী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের বিষাদ এবং আবেগ, উপরের বাক্য বিন্যাস ও শব্দচয়নে স্পষ্ট। বলা বাহুল্য, প্রশ্নের আকারে বাক্যগুলি একান্তভাবেই লেখকের ব্যক্তিগত প্রগাঢ় অনুভূতিকে প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজ্জিত। এই ধরনের বাক্যবিন্যাস ইতিহাসে থাকা সম্ভব নয়। অর্থাৎ স্মৃতিকথায় সাহিত্যের মত ব্যক্তিগত অনুভূতি ও আবেগ অনেকখানি জায়গা করে নেয় — যদিও ব্যক্তির সেসব কিছুই তাঁর গোষ্ঠী-বোধ থেকেই সম্ভূত হতে পারে। সেই সকল কথা, অনুভূতি, আনন্দ সুসংবদ্ধ করে একটা নির্দিষ্ট কাহিনির অখণ্ড রূপ দেওয়া হয় অনেক সময়, আবার অনেক সময় একাধিক ছোট ছোট কাহিনিকে জড়ো করা হয় স্মৃতিকথাতে। মিহির সেনগুপ্ত

তাঁর গ্রন্থে নিজের স্মৃতিকথাকে 'কাহিনি' বলেছেন। তিনি লিখেছেন — ''...আমি আমার কাহিনিতেই প্রত্যাবর্তন করি। কাহিনি হয়তো তত্ত্বের স্বরূপ বাতলে দেবে।''[28] অর্থাৎ তাঁর স্মৃতিলেখাতে 'কাহিনি' আছে, আবার তিনি 'তত্ত্ব'-ও পরিবেশন করেছেন। সে তত্ত্ব হল সে সময়ের তাঁর গ্রামের সমাজ-ইতিহাস বর্ণনা। যেমন — ''যখনকার কথা বলছি তখন দাঙ্গার বা গণহত্যার তীব্র বিভীষিকা আমাদের কর্তাদের বিধ্বস্ত করলেও, অথবা আমাদের পিছারার খালের দুপাশের বক্সী, উকিল, গুপ্ত, বাড়ুজ্জে, চাটুজ্জে বা গাঙ্গুলিরা দেশত্যাগ করলেও আমাদের এলাকার প্রান্তবর্তী যুগি, নাপিত, কামার, কুমোর, নমশূদ্ররা, তখনও যেন কী এক আশার ওপর নির্ভর করে নিশ্চিন্তই ছিল। ... বস্তুতঃ তাদের কাছে দাঙ্গা, দেশভাগ, মানুষের অস্থির অসহায়তার আশ্রয় খোঁজা, এগুলোর কোনও সঠিক খবরও বোধ হয় ছিল না। তারা সকলেই মধ্যস্বত্তীয় আশ্রয়ের এবং নিয়মের দাস।''[29] উত্তম পুরুষের ক্রিয়া ব্যবহার করে লেখক যা বললেন, তা তাঁর নিজ অভিজ্ঞতা। তবে এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিভূমি লেখকের সমাজ-বোধ এবং কথনে ইতিহাস বর্ণনার ধাঁচাটিকেও তিনি সযত্নে ধরে রেখেছেন। মিহিরবাবু এই কারণেই তাঁর স্মৃতিচারণাকে সামগ্রিকভাবে 'আলেখ্য' বলেছেন। কারণ কাহিনির সঙ্গে ইতিহাস-বর্ণনার ভঙ্গি মিশে গিয়ে তাঁর স্মৃতিকথার বিশিষ্ট শৈলীটি নির্মিত হয়েছে। এইভাবেই স্মৃতিকথায় ইতিহাস থাকে, আবার স্মৃতির অন্তরালে আত্মসত্তার বিশেষ প্রকাশও থাকতে পারে এবং এই দুই মিলে গিয়ে স্মৃতিকথাকে একটি বিশিষ্টরূপ দান করে।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অশীন দাশগুপ্ত তিনধরনের সময়ের কথা বলেছেন। সমাজের মধ্যে যে পরিবর্তনটা বিভিন্ন কারণে হয়, সেটিকে তিনি চিহ্নিত করেছেন 'বড় সময়' বলে।[30] ইতিহাসের কাজ প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ এই 'বড় সময়কে' কেন্দ্র করেই। এই সামাজিক পরিবর্তন সমাজ-মধ্যস্থ বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে যে সকল বহুমাত্রিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তাঁকে অশীনবাবু চিহ্নিত করেছেন 'ছোট সময়' বলে।[31] আধুনিক ইতিহাসের চেষ্টা রয়েছে এই 'বড় সময়' থেকে 'ছোট সময়ের' মধ্যে নেমে আসার। কিন্তু অশীনবাবু বলেছেন, এর পরেও থেকে যায় ব্যক্তিগত সময় — যা ইতিহাসের পরিধির বাইরে। সাহিত্য এইখান থেকেই তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে।[32] স্মৃতিচারণার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সময়ের পরিসর অবশ্যই আছে। কিন্তু যেহেতু মানুষের ব্যক্তিগত স্মৃতির অন্তরালে সর্বদাই সামূহিক স্মৃতির একটি প্রভাব থাকে, তাই দেখবো,

ব্যক্তিসত্তা ও গোষ্ঠীসত্তার মধ্যে একধরনের আদানপ্রদান স্মৃতিচারণাগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দেশভাগের স্মৃতিকথাগুলি একান্ত ব্যক্তিগত, সেই ব্যক্তিগত উক্তির পিছনে সক্রিয় গোষ্ঠীগত প্রেরণা। আবার আত্মসত্তার রাজনীতির কারণে দেশভাগ কেন্দ্রিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রতিটি গোষ্ঠীর পৃথক হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। গোষ্ঠীগত প্রেরণাই দেশভাগকে 'দেখা' ও 'মনে রাখা'র ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গিটিকে তৈরি করে। প্রতি ব্যক্তির পরিসর ও প্রেক্ষিত অনুযায়ী দেশভাগ বিষয়ক স্মৃতিচারণা ভিন্ন এবং এইভাবে দেশভাগের মত একটি বড় সামাজিক পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে বহুমাত্রিক স্বরের সন্ধান দেয় স্মৃতিকথাগুলি। প্রতিটি 'স্বর' একত্রে দেশভাগের বহুমাত্রিক, জটিল সামগ্রিক 'সত্যে'র রূপটিকে নির্মাণ করে।

যে সমাজে লিপি ছিল না, সভ্যতার সেই আদিযুগে শ্রুতি ও স্মৃতিই ছিল জ্ঞানচর্চার উপায়। তারপর সভ্যতার বিবর্তনে লিপির আবিষ্কার হয় ও সমাজের বিবিধ ওঠা-পড়া স্মৃতিচর্চাকেও প্রভাবিত করে। আধুনিক স্মৃতিচারণায় ব্যক্তির গোষ্ঠীসত্তা-স্বরূপ ধরা পড়ে, সামাজিক, রাজনৈতিক ঘটনা ও বিবর্তনের বর্ণনাও থাকে, আবার ব্যক্তির নিজস্ব সৃজনশীলতারও বিস্তার ঘটে। স্মৃতিচারণার বয়ান তাই একেবারেই স্বতন্ত্র। স্মৃতিকথা তাই যেমন ঐতিহাসিক উপাদানের আকর হয়ে উঠতে পারে, আবার তার বিচিত্র কথনপদ্ধতির মাধ্যমে ধরা পড়ে যায় সমাজের ও ব্যক্তির সংঘাত। দেশভাগজনিত স্মৃতিকথাগুলি এই কারণেই মহামূল্যবান হয়ে ওঠে।

তথ্যসূত্র

1. Paul Recoeur, *Memory, History, Forgetting,* The University of Chicago Press, Chicago, London, 2004, Pg.-28.
2. Ibid, Pg.-52.
3. Ibid, Pg.-52.
4. জ্যোতি বসু, ''ছেচল্লিশের দাঙ্গা'', *কলকাতা ও নোয়াখালির দাঙ্গা*, সম্পা- অর্জুন গোস্বামী, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১৬, পৃ:-৬৮.

5. তদেব, পৃ:-৬৯.

6. তপন রায়চৌধুরী, *বাঙালনামা*, আনন্দ, কলকাতা, ২০১০, পৃ:-১৪৩.

7. জ্যোতি বসু, ''ছেচল্লিশের দাঙ্গা'', *কলকাতা ও নোয়াখালির দাঙ্গা*, সম্পা- অর্জুন গোস্বামী, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১৬, পৃ:-৭৪.

8. তপন রায়চৌধুরী, *রোমন্থন অথবা ভীমরতিপ্রাপ্তর পরচরিতচর্চা*, আনন্দ, কলকাতা, ২০১৪, পৃ:-৯৬.

9. তপন রায়চৌধুরী, *বাঙালনামা*, আনন্দ, কলকাতা, ২০১০, পৃ:-১৫৪.

10. তদেব, পৃ:-১৫৫.

11. অশোক চৌধুরী, ''নোয়াখালি ফিরে দেখা'', *কলকাতা ও নোয়াখালির দাঙ্গা*, সম্পা- অর্জুন গোস্বামী, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১৬, পৃ:-১৮০.

12. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৩, পৃ:-৬৮.

13. আবু রুশ্‌দ্, *আত্মজীবনী*, এ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ:-১১২.

14. তপন রায়চৌধুরী, *রোমন্থন অথবা ভীমরতিপ্রাপ্তর পরচরিতচর্চা*, আনন্দ, কলকাতা, ২০১৪, পৃ:-৯৪.

15. তপন রায়চৌধুরী, *বাঙালনামা*, আনন্দ, কলকাতা, ২০১০, পৃ:-১৫৩.

16. আবদুল মোহাইমেন; ''কলকাতার দাঙ্গা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ'', *কলকাতা ও নোয়াখালির দাঙ্গা*, সম্পা- অর্জুন গোস্বামী, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১৬, পৃ:-৯২.

17. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৩, পৃ:-৬৫.

18. Paul Recoeur, *Memory, History, Forgetting,* The University of Chicago

Press, Chicago, London, 2004, Pg.-121.

19. Maurice Halbwachs, *The collective Memory,* translated – Francis J. Ditter and Vida Yazdi Ditter, New York : Harper Colophon, 1950, reprinted 1980, Pg.-48.

20. সুনন্দা সিকদার, *দয়াময়ীর কথা,* গাঙচিল, কলকাতা, ২০১৫, পৃ:-১৩৫.

21. অশোক চৌধুরী, ''নোয়াখালি ফিরে দেখা'', *কলকাতা ও নোয়াখালির দাঙ্গা,* সম্পা- অর্জুন গোস্বামী, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১৬, পৃ:-১৮২.

22. আবদুল মোহাইমেন, ''কলকাতার দাঙ্গা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ'', *কলকাতা ও নোয়াখালির দাঙ্গা,* সম্পা- অর্জুন গোস্বামী, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১৬, পৃ:-১১০.

23. মনোরঞ্জন ব্যাপারী, *ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন,* দে পাবলিকেশন্স্, কলকাতা, ১৪২৬, পৃ:-৩১.

24. তদেব, পৃ:-৩১

25. গোপালচন্দ্র মৌলিক, *দেশভাগ ও ননীপিসিমার কথা,* গাঙচিল, কলকাতা, ২০১১, পৃ:-৬৪.

26. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর,* খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা-২০১৩, পৃ:-৭.

27. মিহির সেনগুপ্ত, ''বিষাদবৃক্ষ'', *উজানি খালের সোঁতা,* আনন্দ, কলকাতা, ২০০৭, পৃ:-২৮০.

28. তদেব, পৃ:-৩১.

29. তদেব, পৃ:-৩১.

30. অশীন দাশগুপ্ত, ''ইতিহাস ও দর্শন'', *প্রবন্ধ সমগ্র,* আনন্দ, কলকাতা, ২০০৮, পৃ:-১৯.

31. তদেব, পৃ:-৪৯.

32. তদেব, পৃ:-৫৯.

বিষাদ ও বঞ্চনার স্মৃতি

দেশভাগের স্মৃতিকথা নিয়ে আলোচনা শুরু করলে প্রথমেই যে বিষয়টিতে গুরুত্ব আরোপ করা উচিত, সেটি হ'ল দেশভাগকে কে কেমন ভাবে দেখেছে অথবা মনে রেখেছে। দেশভাগ আকস্মিকভাবে ঘটে যাওয়া একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র নয়। ঘটনাটির একটি ধারাবাহিক ইতিহাস আছে — যে ইতিহাসে স্পষ্ট ধরা পড়ে বিশ শতকের প্রথম বেলা থেকে শুরু হওয়া হিন্দু-মুসলমানের আত্মসত্তা রাজনীতির স্বরূপ। এমন নয় যে সেই রাজনীতির অস্থিরতা সুস্থিত হ'তে পেরেছিল সাতচল্লিশের বঙ্গবিভাজনে। পরন্ত দেশভাগের পরবর্তী সময়ে এবং তারপর দীর্ঘ অনেকদিন পর্যন্ত যে সকল সমস্যার অভিঘাত সহ্য করতে হয়েছে বিভক্ত দেশখণ্ডগুলিকে, সেগুলি হ'ল হিংসা, উদ্বাস্তু জীবন, নাগরিকত্ব অর্জন ও তার সমস্যা ইত্যাদি। উল্লিখিত বিষয়গুলি বিভিন্ন জনের স্মৃতিতে কিভাবে ধরা পড়েছে সেইসবই প্রধান হয়ে ওঠে, যখন আমরা দেশভাগকে কেন্দ্র করে দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্য বিষয়ক আলোচনা করি। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি স্মৃতি কোন স্থির, অচঞ্চল, নৈর্ব্যক্তিক ব্যাপার নয়। বিষয়বস্তু বা ঘটনা এক হ'লেও স্মৃতির ভঙ্গিটি ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে আলাদা হয় এবং স্মৃতিকথা-পাঠ একই ঘটনা বা বিষয়বস্তুকে বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে শেখায়।

বস্তুতঃ ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, পেশা ইত্যাদি ভেদে ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ স্বতন্ত্র হয়, স্মৃতির ভঙ্গিও আলাদা হয়ে যায়। সুতরাং স্মৃতির অন্তরালে ক্রিয়াশীল থাকে ব্যক্তির সত্তা পরিচয় — যে সত্তার নির্মিতি ঘটে সেই সকল সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক গোষ্ঠীগুলির সমবায়ে; যে গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে ব্যক্তির সংলগ্নতা। সুতরাং স্মৃতিতে যে 'আত্ম' ধরা পড়ে, সঠিক বিচারে তা আসলে সমষ্টি, ব্যষ্টি নয়। এবার তাহলে প্রশ্ন, গোষ্ঠী ভেদে কেন দেশভাগকে মনে রাখার ভঙ্গিটি বদলে যায়? এর সহজ উত্তর হ'ল, স্মৃতির পিছনেও কাজ করে আত্মসত্তার রাজনীতি। আত্মসত্তার রাজনীতি অবশ্যই শ্রেণি-দ্বন্দ্ব নয়। বস্তুতঃ এই রাজনীতি হল দুটি গোষ্ঠীর ভিতর সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতা ও আধিপত্য বিস্তারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ভারত উপমহাদেশের বুকে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা যেমন অপরিসীম, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক

ক্ষেত্রেও তার প্রভাব সুগভীর। সুতরাং বিশেষ সমাজ-সংস্কৃতি-সৃষ্ট ব্যক্তি যখন দেশভাগের মত অত্যন্ত জটিল বিষয় নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন, তখন সেই স্মৃতিতে পূর্বোক্ত গোষ্ঠী-সচেতনতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্বর একপেশেভাবে ধরা পড়া খুব অস্বাভাবিক ঘটনা নয়।

১৯৭৫-এ গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত ''ছেড়ে আসা গ্রাম'' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দীপেশ চক্রবর্তী বলেছেন — ''খুব ধীর স্থির ভাবে গুছিয়ে আখ্যান রচনা মত স্মৃতিচারণ করেছেন তাঁরা, লেখাগুলি পড়লে কিন্তু সে রকম কিছু মনে হয় না।''[1] কিন্তু এই প্রবন্ধে আলোচ্য কতকগুলি গ্রন্থকে কিন্তু কার্যকারণক্রম অনুযায়ী সজ্জিত আখ্যানধর্মী রচনা বলা যেতে পারে। ''ছেড়ে আসা গ্রাম'' এর মত রোমান্টিকতা ও নস্টালজিয়ার আস্বাদ থাকলেও আলোচ্য গ্রন্থগুলিতে স্মৃতিচারণার মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে যুক্তি, বিচার, বিশ্লেষণ। অর্থাৎ স্মৃতিচারণার সঙ্গেই নিজেদের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য ইতিহাস সম্মত ও সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়ার কমবেশি প্রবণতা এই রচনাগুলির বৈশিষ্ট্য। স্মৃতির সঙ্গে যেমন প্রতিটি মানুষের আত্মসত্তা পরিচয়ের সম্পর্ক থাকে, তেমনি ব্যাখ্যা ও মন্তব্য গুলিতেও রচনাকারদের আত্মসত্তার বহুস্তরীয় প্রকাশ ঘটে।

''ছেড়ে আসা গ্রাম'' প্রকাশিত হওয়ার কয়েক বছর পরেই অন্নদাশঙ্কর রায়ের লেখা 'যুক্তবঙ্গের স্মৃতি' প্রকাশিত হয়। উচ্চপদস্থ সরকারি আমলা হাইক্লাস এলিট ঘটিপুরুষ অন্নদাশংকর অখণ্ড বাংলার কলকাতা এবং শান্তিনিকেতন ছাড়া আর কিছুই চিনতেন না। চাকরি সূত্রে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় তিনি প্রশাসনিক দায়িত্ব নিয়ে গেছিলেন। তার স্মৃতিচারণায় গ্রাম প্রায় নেই বলা চলে। নাগরিক- মনস্ক মানুষটির ভাবাবেগ ক্রিয়াশীল হয়েছে বাঙালি সত্তাকে কেন্দ্র করে। তিনি যখন স্মৃতিচারণ করছেন তার কিছু বছর আগে বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে পূর্বপাকিস্তানে ভাষা আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে। বলাবাহুল্য তার সেই সময়কার আবেগ তার স্মৃতিকে বিশেষ পথে প্রবাহিত করেছে। স্মৃতির প্রথমেই তাই তিনি স্মরণ করেছেন বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের যা তার কাছে বাঙালির অতীত ইতিহাসের চিহ্ন। সমন্বয়বাদী মনোভাব থেকে তিনি পাহাড়পুরের প্রত্ন নিদর্শনের মধ্যে বৌদ্ধ হিন্দু ও মুসলমান প্রভাবের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন — ''দেশ দেখা কেবল প্রকৃতিকে দেখা নয়, মানুষকেও দেখা। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব স্থান অনুসারে বদলায় না। কথ্য

ভাষা বদলাতে পারে। প্রথা বদলাতে পারে কিন্তু বাঙালি মোটের উপর বাঙালি।"[2] অর্থাৎ বাঙালির ধর্ম নিরপেক্ষ ঐতিহ্যের সন্ধান করেছেন তিনি। কিন্তু যখন বলেছেন ''দেশ দেখা''র কথা — তখনই বোঝা যায় পশ্চিমবঙ্গীয় মানুষটির মধ্যে পূর্ব বাংলার মানুষদের প্রতি একটা অপরতার বোধ ক্রিয়াশীল। পশ্চিমবঙ্গের সাহেবী মেজাজের হিন্দু বাঙালিটি তদানীন্তন পূর্ববাংলায় বদলি হওয়ার পরে লিখেছেন — ''পূর্ববঙ্গে যতবার বদলি হয়েছি কোনোবার খুশি হয়ে যাইনি, কিন্তু গিয়ে খুশি হয়েছি বারবার।"[3] বাক্যটিতে স্মৃতিচারণার একটি মজার খেলা আছে। লেখক পূর্ববাংলায় অনিচ্ছাসহ যেতে রাজী হয়েছেন, আবার বারংবার গিয়ে খুশী হয়েছেন — এই দুটি বক্তব্যের একটি সহজ সংঘাত আছেন। একবার গিয়ে খুশীর ভাবটা তাঁকে আপ্লুত করলে পরের বার পূর্ববাংলায় বদলি হ'লে তাঁর খুশি না হওয়ার কারণ থাকে না। অথচ পূর্ববাংলায় বদলি হলে তিনি খুশি হতেন না। কিন্তু পূর্ববাংলার কথা বলতে গিয়ে পরমুহূর্তেই তিনি আপ্লুত হয়ে লিখলেন — ''বিধাতার মনে কী ছিল সে বয়সে বুঝতে পারিনি, এখন বুঝি আর ধন্যবাদ দিই। একালের সরকারী কর্মচারীরা আমার মত বদলির দুঃখ পাবেন না, কিন্তু সুখও পাবেন না বাংলার মুখ দেখার।"[4] অর্থাৎ অতীতের নেতিবাচক অনুভূতির স্মৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে স্মৃতিচারণার 'বতর্মান' সময়ের লেখকের বাঙালিয়ানার আবেগ ও আপ্লুত ইতিবাচক হৃদয়াবেগ। যদিও পূর্ববাংলার মানুষজন সম্পর্কে তাঁর অপরতার বোধ পরবর্তী বাক্যগুলিতে স্পষ্ট ধরা পড়ে — ''আমি তো মনে করি ওরা আরো অকপট, আরো অকৃত্রিম, আরো দিলখোলা, আরো তেজী। ওদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করা একটা দুর্লভ সুযোগ।"[5] পূর্ববঙ্গীয়রা অন্নদাশংকরের ভাষায় 'ওরা', তথাপি 'ওদের' সম্পর্কে একটা তীব্র ভাবাবেগ উপরের বাক্যটির প্রতি অক্ষরে স্পষ্ট ধরা পড়েছে। এই ভাবাবেগ স্বাধীন বাংলাদেশ তৈরী হওয়ার সম্ভাবনার কারণে — যা অপরতার স্মৃতিচারণার উপর গাঢ় আচ্ছাদন তৈরী করেছে।

এই অপরতার কারণেই কলকাতার এলিট বাঙালির কাছে পূর্ববাংলা মানেই গ্রাম, কৃষি, মুসলমান কৃষকের সংখ্যাগরিষ্ঠতা, প্রাক আধুনিক জীবনযাত্রা ইত্যাদি। আবার পূর্ব বাংলা মানে এই বাঙালির কাছেই রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ ও পদ্মা নদী। তাই পদ্মা নদীর বর্ণনা দিতে গিয়ে অন্নদাশংকর যেন পূর্বসূরীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে লিখেছেন — ''দিগন্ত থেকে দিগন্তে তার বিস্তার।

স্টীমার একবার এপারের ঘাটে ভেড়ে, একবার ওপারের ঘাটে। জনতা, কোলাহল, ওঠানামা, তারই মাঝখানে খাবার বেচাকেনার হৈ-চৈ।"[6] বস্তুত স্মৃতিকথা লেখার সময়ে প্রকৃতি ও মানুষ মিলিয়ে পূর্ববঙ্গ সম্পর্কে পশ্চিমবাংলার আদ্যন্ত বাঙালি মানুষটির ভিতর এক রোমান্টিক ভাবাবেগ কাজ করেছে।

কিন্তু অন্নদাশংকরের অপরতার বোধ শুধুমাত্র গ্রাম-শহরের বিষমতা ও বিভেদীকরণকে স্পষ্ট করে তোলে না, বাঙালি হিসেবে সমন্বয়বাদী ভাবাবেগের পাশাপাশি তার ধর্মগোষ্ঠীবোধ ও রাজনৈতিক অবস্থান স্মৃতির ন্যারেটিভকে প্রভাবিত করেছে। তাঁর স্মৃতির একটা বিশাল অংশ জুড়ে আছে অখণ্ড বাংলার শেষ কয়েক বছরের রাজনীতি। ইতিহাস সিদ্ধ রাজনৈতিক ঘটনা, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ যখন তিনি করেছেন তার স্মৃতিকথার পাতায়, তখন হিন্দু-মুসলমানের ভূমিকার ক্ষেত্রে তাঁর ভারসাম্যের রাজনৈতিক বোধ রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ যখন স্মৃতিচারণার পাতায় উঠে এসেছে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গ বিশেষার্থে কলকাতার হিন্দুদের উগ্রতা অথবা রাজনীতি এসব কোনোকিছুর ছবিই ধরা পড়ে নি। অপর পক্ষে ইসলাম ধর্মালম্বী বাঙালিদের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন তাঁর অভিজ্ঞতায় কিভাবে ধরা পড়েছিল, সে সম্পর্কে তাঁর স্মৃতিশক্তি ও পর্যবেক্ষণ সুস্পষ্ট — ''ষাট বছর আগে যখন প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হয় তখন আমি লক্ষ করি যে যাঁরা ইউরোপীয়ান পোশাক পরতেন তাঁরা রাতারাতি মুসলমানি পোশাক পরতে আরম্ভ করেন। মাথায় লাল রঙের ফেজ টুপি।...

... মুক্তিযুদ্ধের পরে যখন ঢাকায় যাই তখন দেখি বাঙালি মুসলমানের জাতীয় পোশাক পাঞ্জাবি পায়জামা। ... মাথায় টুপি নেই। ফেজ অদৃশ্য।"[7] তাঁর স্মৃতিচারণায় এক ধাওয়া মুসলমান যুবকের কাহিনি বলা হয়েছে — যে ছেলেটি সামাজিক ভাবে নিম্নবর্গীয় হওয়ার কারণে চাকরি পাচ্ছিল না। এই কাহিনিটি বিবৃত করার পরেই লেখকের মন্তব্য — ''মুসলিম সমাজের জাতিভেদের এইসব নমুনা দেখার পর ইসলামিক সলিডারিটি প্রভৃতি লম্বাচওড়া বুলি আমাকে ভোলায় না।"[8] স্পষ্টতই লেখক হিন্দু হিসেবে এখানে যথেষ্ট রক্ষণাত্মক। বাঙালি মুসলিম সমাজে জাতিভেদ প্রথার যে রেশ থেকে গেছে, তা যে প্রতিবেশী হিন্দু সমাজেরই প্রভাবে সে বিষয়ে

অবহিত থাকার পরেও তাঁর উক্তিটি মুসলিম সমাজের প্রতি আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছে। ঠিক পরবর্তী অনুচ্ছেদেই তিনি হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথার কথা উল্লেখ করেছেন ও একটি কাহিনি বিবৃত করেছেন। কিন্তু সেই বর্ণনাভঙ্গি অনেক স্তিমিত, ভাষাভঙ্গিও মোলায়েম। কাপালিকদের সম্পর্কে বলেছেন — ''ওরা হিন্দুসমাজে অন্ত্যজ। ... সামাজিক নির্যাতনের অভিযোগই বোধহয় উঠেছিল হিন্দুর দ্বারা হিন্দুর। আইন এক্ষেত্রে নিরুপায়। যদি না স্বাধীনতার পর আইন বদলায়।''[9] আবার রাজশাহীতে যখন তিনি বদলি হয়ে গেছিলেন, তখন ওই শহরে হিন্দু ছাত্র ও মুসলমান ছাত্রদের একটি সংঘাতের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। হস্টেলে হিন্দু ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল বেশি সংখ্যক ঘর — সেই বিষয়ে সমস্যা। তিনি একথা স্বীকার করেছেন — ''কিন্তু মুসলমান ছাত্রদেরও সংখ্যানুপাতে বাসস্থান দিতে হবে।''[10] কিন্তু এরপর মুসলমান ছাত্রদের উদ্দেশ্যে লেখা তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হকের একটি টেলিগ্রামের কথা উল্লেখ করে তিনি মন্তব্য করলেন — ''...ওঁর তারবার্তায় মুসলিম ছাত্রদের উদ্দেশ্যে লিখলেন ''আমার বালকগণ''। হিন্দু ছাত্ররা তবে কাদের? কোন্ সরকারের? না তাদের কোনো মা বাপ নেই, তারা ভেসে এসেছে? এরপরে হয়তো একজন মুসলিম মস্তানের নামে টেলিগ্রাম আসবে। ...সরকারকে বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের সঙ্গে একাত্ম করতে গেলে কী হয় তার সূচনা ১৯৩৭ সালেই। পরিণাম ১৯৪৭ সালে।''[11] আত্মপরিচয় রাজনীতির হিন্দুবর্গীয় প্রত্যাঘাত উপরের উদ্ধৃতিটিতে সুস্পষ্ট। আশ্চর্যজনকভাবে এক্ষেত্রে অন্নদাশংকরের লেখাতে তার অবস্থান নির্ণীত হয়েছে হিন্দু জাতীয়তাবাদী হিসেবে — ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি হিসেবে নয়। স্বাধীনতা পূর্ব সময়ের রাজনীতির স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি যখন বলেন — ''ইংরেজরা ১৯৩৭ সালে বাংলাদেশে একটি মুসলিম প্রধান সরকারকে সিরাজউদ্দৌলার মসনদে বসিয়ে দেয়। আবার ১৯৪৭ সালে তেমনি একটি মুসলিম প্রধান সরকারকে স্বতন্ত্র ভাবে স্বাধীনতা দিত যদি সে সরকার স্বাধীনতা ঘোষণা করত।''[12] — তখন তার সাম্প্রদায়িক অবস্থান স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেই কারণেই ইসলাম ধর্মাবলম্বী বাঙ্গালীদের তিনি কেবল মুসলমান বলেই উল্লেখ করেছেন। ১৯৯৮ সালে তিনি যখন 'মুক্ত বঙ্গের স্মৃতি' গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন তখন সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ হিসাবে তিনি বাঙালি সত্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে মুসলমান ও হিন্দু উভয় পক্ষেরই

মানসিক দ্বিধার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় দেশভাগ কেন্দ্রিক অতীত স্মৃতিচারণ-এর ক্ষেত্রে তার অবস্থান কিন্তু এরকম নয়। অর্থাৎ বোঝা যায় মুক্তিযুদ্ধের প্রবল আবেগ সত্ত্বেও হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণির দেশভাগের স্মৃতি ''নিরপেক্ষ'' হয়ে উঠতে পারেনি।

তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতির অ-নিরপেক্ষতার প্রকাশভঙ্গি পাল্টে গেছে। জ্ঞানেন্দ্র পান্ডের তত্ত্বের প্রভাবে স্মৃতি সংগ্রহের প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ার পর গত শতাব্দীর শেষ থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত দেশভাগকে কেন্দ্র করে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। মিহির সেনগুপ্ত দেশভাগের পর পূর্বপাকিস্তানে ছিলেন এবং সেই সময়ের স্মৃতিচারণ করেছেন তিনি 'বিষাদবৃক্ষ' নামক গ্রন্থে। দেশভাগের পর প্রবল শূনতাবোধ ও বিষাদময়তা এই লেখার প্রধান সুর। সেই সময়ে যে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন তিনি তার জন্য মুসলমানদের একতরফা দায়ী করে সচেতন ভাবে সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠতে চাননি। সংখ্যালঘু নিষ্পেষণের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি লিখেছেন — ''সেখানে যারা বদমাশ প্রকৃতির তারা বদমাশই থেকে গেছে, ইসলাম তাদের কিছুমাত্র শোধন করতে পারেনি। আর যারা সৎ প্রকৃতির তারা মানবিকই থেকেছেন, অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীল মনোভাব নিয়ে তারা তাদের সততাকে আশ্রয় করেই জীবন যাপন করেছেন।''[13] কিন্তু তবুও মিহিরের হিন্দু জাত্যাভিমান গোপন থাকেনি তাঁর বয়ানে এবং সেই কারণেই লক্ষ্য করা যায় তাঁর লেখাতে হিন্দু নারীর পূজা ও বিভিন্ন ব্রত পালন, পরিত্যক্ত হিন্দু বাড়ির নিষ্প্রদীপ তুলসী মঞ্চ, হিন্দু শ্রেণির পূর্ব বাংলা ত্যাগ করার কারণে সমাজ-সংস্কৃতি-শিক্ষা-অর্থনীতিতে পরিব্যাপ্ত শূন্যতা ও অবক্ষয়ের চিত্র-এই motif-গুলি বারংবার তাঁর লেখাতে ঘুরে ঘুরে এসেছে। তিনি লিখেছেন ''কত বিচিত্র জাতি গোষ্ঠীর মানুষ, কত চন্ডভন্ড, মলঙ্গী, উচ্চ ও নিম্নবর্ণের মানুষ যুগ যুগ ধরে এই জনপদটিকে নানান সম্ভারে সাজিয়ে তুলেছিল। এখন মাত্র কয়েকটি বছরের অবিমৃষ্যকারিতায় তা শ্মশান হয়ে গেল।''[14] ধ্বংসের এই স্মৃতিতে হিন্দুর প্রতিপক্ষ কিন্তু মুসলমানরাই। তিনি লিখেছেন — ''যে সামাজিক অসাম্যের পাপে হিন্দু উচ্চবর্গীয় সমাজ উৎখাত হয়েছে তার কারণ বিশ্লেষণ কষ্টসাধ্য নয়। কিন্তু যারা এই ভূমিকে পবিত্র বোধে গ্রহণ করেছিল তাদের সমাজ কি করলো?''[15] বয়ানে মিহিরের শ্রেণিগত ও ধর্মীয় অবস্থান বেশ স্পষ্ট। সেই কারণেই তাঁর বয়ানে হিন্দু উচ্চবর্ণীয়

সামন্তদের প্রতি সমর্থন ও সহানুভূতি গোপন থাকেনি। মধ্যস্বত্বভোগীদের অন্তঃসারশূন্যতার কথা বলেছেন তাঁর জ্যাঠামশাই-এর কথা বলতে গিয়ে — ''আমার জেঠামশাই ছিলেন সেই শ্রেণির প্রতিভূ যে শ্রেণির উপস্থিতি প্রকৃতপক্ষে ওখানকার সাধারণ মানুষের আদপেই কোন উপকারে আসার কথা নয়। মুসলমানদের নমশূদ্র বা অন্ত্যজদের প্রতি তার ঘৃণা এবং বিদ্বেষ অত্যন্ত উগ্র।''[16] কিন্তু অন্য প্রসঙ্গে সেই জ্যাঠামশাই-এর আচরণ ও ব্যক্তিত্বের বর্ণনা যে ভাষা-ভঙ্গিমায় তিনি ব্যক্ত করেছেন, তার থেকে এই ধারণা হওয়া অসংগত নয় যে সেখানকার মুসলমান 'সাধারণ অল্পশিক্ষিত গ্রামীণ গেরস্থ'দের তুলনায় জ্যাঠামশাই-এর উচ্চ অবস্থানটিকে তিনি নির্মাণ করতে চেয়েছেন। ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান সৈজদ্দী ফৌজী শাসকদের দ্বারা যখন বিপদগ্রস্ত, তখন জ্যাঠামশাই-এর ভূমিকা তিনি যেভাবে বর্ণনা করেছেন, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য — ''এরকম এক কেয়ামতি সংকট সময় দেখা গেলো প্রায় সাড়ে ৬ ফট লম্বা, রোদে পোড়া তামাটে বর্ণ এবং অত্যন্ত ছোট ছোট করে ছাটা কাঁচাপাকা চুল মাথায় একজন মনুষ্য আসছেন।''[17] অথবা ''কতগুলো হুমদো হুমদো ফৌজিদের তিনি যেন আমলই দিলেন না। মেজর সাহেব যে চেয়ারটায় উপবিষ্ট, সেটাকে ইঙ্গিত করলেন এবং পরিষ্কার উচ্চারণে বললেন if you do not mind...''[18] ইত্যাদি। তাঁর তামাটে রং-এর বর্ণনা আভিজাত্যের গরিমাকে অস্বীকার করতে চাইছে, কিন্তু গ্রামীণ মানুষগুলির উপর তাঁর প্রভুসুলভ আধিপত্য বিস্তারের মধ্যে মহত্ত্বের সঞ্চার ঘটিয়েছেন তিনি। জ্যাঠামশাইয়ের আত্মসম্মানবোধ ঔপনিবেশিক সময়ের জাতীয়তাবাদী চরিত্রের মতোই মহৎ মনে হয়। বর্ণনার মাঝখানে মিহির তাঁর জ্যাঠামশাই সম্পর্কে 'ধড়িবাজ' বিশেষণটি প্রয়োগ করলেও বর্ণনার সাধারণ সুরের সঙ্গে তা অসঙ্গতিপূর্ণ।

জমির উপর জমিদারের অধিকার নিয়ে মিহিরের বক্তব্য বিশেষভাবে লক্ষণীয় — ''এখন বিচার্য এই যে উচ্চবর্ণীয়রা নবাব রাজাদের খেয়ালি পাট্টার জোরে যে দখলদারি করে সেটা ডাকাতি, না এইসব মানুষেরা প্রথমাবধি যে লড়াইয়ের মাধ্যমে তাদের দখলদারি জারি রাখতে চায় সেটা ডাকাতি। এ প্রশ্নের উত্তর ইতিহাস একেক সময় একেক ভাবে দিয়েছে। তবে এক্ষেত্রে উত্তরটি বোধহয় খুব সরল নয়। বিভিন্ন পারিবারিক ইতিকথার শ্রুতি এবং স্মৃতি অনুযায়ী এ স্থানের

আবাদকারী এবং যারা আবাদ করেছেন তাদের প্রতিষ্ঠা প্রায় সমসাময়িক। ব্যাপারটা এমন ঘটেনি যে এখানকার আদি চন্ডভন্ড, মঙ্গলি, ধীবর কৈবর্ত বা হালিয়া কৈবর্তরা সব বন আবাদ করে ফসলি জমির ব্যবস্থাদি এবং নিজস্ব গৃহস্থালি স্থাপনা করার পর উচ্চবর্ণীয়রা এসে তা দখল করে রাজ্যপাট বসায়। সে রকম ঘটনাও বেশ কিছু আছে এবং তা অবশ্যই ডাকাতি নামান্তর। আবার বেশকিছু উদ্যোগী পরিশ্রমী মানুষ যে এইসব আদিম মানুষদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রতিকূল শক্তির সাথে লড়াই করে এক সময় প্রাধান্য পেয়েছেন এ কথা মিথ্যে নয়।"[19] ভূমির উপর উচ্চবর্ণীয়দের অধিকার তিনি এই ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। এক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ইতিহাসবোধকে তিনি নাকচ করে দিয়ে অবলম্বন করতে চেয়েছেন পারিবারিক স্মৃতিকে। সেই অধিকারের ভূমি যখন ছেড়ে যেতে হয় তখনই সম্পত্তির অধিকারের সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া হয় দেশপ্রেম সম্পর্কিত জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণাগুলিকে অথবা প্রতিহিংসাকে — ''তবে নিজেদের মানুষ আর নিজেদের দেশ কোথায় পাবো?"[20] অথবা ''আজ যে আমার ভূমি দখল করে ছলে-বলে-কৌশলে আমাকে উদ্বাস্তু করছে সেও কি আখেরে স্থায়িত্ব পাবে?"[21] যদিও তার পারিবারিক সম্পত্তি জবরদস্তি দখল করা হয়েছে এ রকম কোন ঘটনা স্মৃতি থেকে তিনি তুলে আনতে পারেননি। পরন্তু 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র শশীর মতো শহরজীবন কেন্দ্রিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা যে তাঁকে প্রতিনিয়ত আকর্ষণ করেছিল এবং সেই কারণেই গ্রামীণ পরিবেশে তাঁর মধ্যে একরকমের বিচ্ছিন্নতাবোধের জন্ম হচ্ছিল, তা তাঁর উক্তি থেকেই বোঝা যায় — ''সবমিলিয়ে নিজেদের অস্তিত্বকে কেমন যেন অলীক বলে বোধ হচ্ছিল। শহর জীবনের যে স্বাদ কিছুকালের অভ্যাসের কারণে আমার মধ্যে বাসা বেঁধেছিল, তার তীব্রতা কাটিয়ে কিসসাদার বুড়ার গান, কাহিনি এবং প্রায় এই আদিম মানুষের মতো ভ্রমণ কি আমাকে আবার পিছনের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে?"[22] গ্রামীণ প্রাচ্য সংস্কার, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে ত্যাগ করে নাগরিক পাশ্চাত্য জীবনধারার প্রতি অমোঘ আকর্ষণ আধুনিক বাঙালির বৈশিষ্ট্য। গ্রাম ও শহরের দ্বন্দ্ব তাই তার স্বভাবে, তার আধুনিক সমাজ ও সংস্কৃতিতে, এমনকি তার স্মৃতিচারণাতেও। তাই শহরে বসবাস করেও গ্রামের প্রতি থেকে যায় তার অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ। এই আকর্ষণ অনেকটাই প্রাগাধুনিক কৃষি সভ্যতা ও সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের জন্যও বটে — এইভাবেও দেখা যেতে পারে। অতীতের সেই হারিয়ে যাওয়া গ্রাম যেন তাদের 'বর্তমান'-এর নাগরিক ঘাত-প্রতিঘাতের বিপরীতে এক নতুন

ইউটোপিয়া-র কল্পনা বলে মনে হয়। এদের চেতনায় দেশভাগই সেই সমৃদ্ধ গ্রাম হারিয়ে যাওয়ার কারণ হিসাবে ধরা দিয়েছে। অন্তত স্মৃতিচারণা থেকে সেই রকমই বোধহয়।

নাগরিক অন্নদাশংকরের লেখায় গ্রাম বাংলা নিয়ে রোমান্টিক ভাবালুতা একভাবে পেয়েছি। গোপালচন্দ্র মৌলিকের লেখায় সেই রোমান্টিকতা অন্যসুরে বেজেছে। পূর্ববঙ্গের গ্রাম থেকে চলে এসে তিনি দীর্ঘদিনের পশ্চিমবঙ্গবাসী — উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত। কিন্তু তাঁর গ্রামীণ সত্তাটিকে তিনি ধরে রাখতে চান অবশ্যই। তাঁর স্মৃতিতে তাঁদের পূর্ববঙ্গের গ্রামের বর্ণনা যেন এক অধরা রূপকথা — ''যমুনানদীর পারে ঝাঁকপাল ছিল একটি সুন্দর ছবির মত গ্রাম। সবুজে সবুজ। কত গাছ আর কত পুকুর ছিল এই গ্রামে।''[23] এই বর্ণনাভঙ্গিতে লেখকের নস্ট্যালজিক স্বপ্নচারণ সুস্পষ্ট। গ্রামরূপের এই মিথিক শৈল্পিক প্রকাশভঙ্গিমার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর বর্ণনায় উঠে এসেছে ছেড়ে আসা গ্রামের বিশেষ খাদ্যতালিকা। যেমন — চালগুঁড়ো দিয়ে তৈরী বিভিন্ন পিঠে, খেজুরগুড় দেওয়া নারকেলের পুর, দুধপুলি, মুগপুলি, বিভিন্ন ফল দিয়ে বানানো পায়েস, ঢেঁকিছাঁটা আউশধানের ভাত, ইলিশ মাছের বিভিন্ন পদ ইত্যাদি। কৃষিজ সম্পদ নির্ভর এইসকল খাদ্যতালিকার বিস্তৃত বর্ণনা তাঁর গ্রামীণ জীবন-সংলগ্নতার চিহ্ন বলা যেতে পারে। মিহিরবাবুর লেখাতেও যে এমন বর্ণনা নেই তা নয়, কিন্তু মিহিরের স্মৃতিতে পূর্ববাংলার গ্রামীণ জীবন ছেড়ে নাগরিক জীবনে উত্তরণের আকাঙ্খা প্রবল ছিল বলেই তাঁর লেখায় গ্রামীণ জীবনের স্মৃতি বিষাদাচ্ছন্ন। কিন্তু গোপালবাবুর তা নয়। পূর্ববাংলার ছেড়ে আসা গ্রাম তাঁর মৌল সত্তা, তাঁর স্বপ্ননীল ভুবন।

দেশভাগ শুধু গ্রামীণ হিন্দু সংস্কৃতিকেই ধ্বংস করে নি, হিন্দু সাম্প্রদায়িক চেতনায় তা ধ্বংস করেছে পরিবারের লক্ষ্মীকেও। গোপাল চন্দ্র মৌলিক-এর লেখা 'দেশভাগ ও ননী পিসিমার কথা' গ্রন্থে তাই ননী পিসিমাকে স্থাপন করা হয়েছে বয়ানের কেন্দ্রে। দেশভাগের পূর্বে পরিপূর্ণ গ্রামীণ সভ্যতার সঙ্গে মানানসই ননী পিসিমার জীবন ও সৌন্দর্য — সম্ভ্রমে সম্মানে সৌন্দর্যে উনিশ শতকীয় নারী মূর্তির সঙ্গে তুলনীয়। ননী পিসিমার প্রসঙ্গে তাই লেখকের বয়ানে বারংবার উঠে এসেছে লক্ষ্মী পূজার কথা। যেমন- (১) ''ননী পিসিমা খুব সুন্দর আলপনা দিতে পারতেন। কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার দিন পুজোর ঘরে আর বারান্দায় আলপনা দিতেন।''[24] (২) ''ননী পিসিমা ছিলেন মেধাবিনী। স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর। কোন এক কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর নিমন্ত্রণে আমাদের

বাড়ি এসে একথা ঠাকুরদাকে বলেছিলেন ননী পিসিমার দুই প্রণম্য শিক্ষিকা স্মৃতিদি আর ধৃতিদি।"[25] মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা সংসারের এই শ্রী আর হ্রী-কে অসম্মান করতে উদ্যত হয়েছিল বলেই মনে করেছেন গোপাল চন্দ্র মৌলিক। সেই কারণেই দেখি তাঁর দেশত্যাগের কারণ হিসেবে বারংবার উল্লিখিত হয়েছে — ''জাতিধর্মের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। মেয়েদের রক্ষা করার দায়িত্বও রয়েছে।"[26] এ প্রসঙ্গে একজন গোঁসাইজির কথা বলেছেন, যাঁর মুখ থেকে তিনি তাঁদের বাড়ির চাকর শমসের আলির ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তির বর্ণনা পেয়েছিলেন — ''আপনেগো তো আবার সুন্দর বউঝি আছে। তাগো তো সামাল দিতে অইব (হইব)।"[27] গোঁসাইজির চেহারার বর্ণনা গোপালবাবু দিয়েছেন — ''মেদহীন গৌরবর্ণ সুপুরুষ।"[28] লেখকের দেশত্যাগের কারণগুলি মনে রাখার ভঙ্গি ও বর্ণনাতে তাঁর ধর্ম, জাতিগত আত্মগরিমা ও বদ্ধ জীবনবোধ প্রবলভাবে ধরা পড়েছে। উল্লেখ্য, উচ্চবর্ণের মানুষের কথা লিখতে গিয়ে তাঁদের দৈহিক রূপের বর্ণনা করেছেন। অন্যত্র কিছুটা একপেশে ভাবে তাঁদের সম্পদ ও সততার কথা বলেছেন। এইভাবে যেন প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন উচ্চবর্ণ মানেই উচ্চতর মানব ও মানবসভ্যতা।

অন্যদিকে শমসের আলীর আত্মসচেতন আচরণ ও পোশাক গোপাল বাবুর বর্ণনায় হয়ে উঠেছে খলনায়কের পোশাক ও ঔদ্ধত্যের প্রকাশ — ''পরনে ধবধবে সাদা পাঞ্জাবী আর সবুজ ধুতি। মাথায় কাপড়ের গোল জালি ওয়ালা টুপি মুখে মোল্লা কাট দাড়ি বা হাতে জ্বলন্ত সিগারেট আর ঘরি। পায়ের উপর পা দিয়ে চেয়ারে বসে আছে সাঙ্গ পাঙ্গদের কাজে লাগিয়ে দিয়ে।"[29] যে বিশেষ পোশাকটি একসময়ে মুসলিম বাঙালির সত্তাপরিচয় (identity) হয়ে উঠেছিল, হিন্দু ভদ্রলোকের চোখে তাই হয়ে উঠেছে নেতিবাচকতার প্রতীক। ঐতিহাসিক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন "These old power relations were turn upside down after the partition as the Muslim labouring classes inspired by a new sense of liberation frequently infringed the prevailing boundaries of reverent behaviour."[30] সুতরাং গোপাল মৌলিকদের মত উচ্চবর্ণের হিন্দু 'ভদ্রলোক' শ্রেণি পদানতদের এই উত্থানকে মেনে নিতে না পেরে দেশ ত্যাগ করেছিল।

দেশ যখন রাষ্ট্রকে বোঝায় তখন নির্দিষ্ট সেই ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে যে সম্পদ তা

নিয়ন্ত্রণ করার অধিকারী যারা তারাই জাতীয়তাবাদের কাঠামোটিকে নির্মাণ করে। সম্পদের উপর অধিকার ও সামাজিক আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হলেই দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকত্বের প্রসঙ্গ এসে যায়। পূর্ব পাকিস্তানে এই ভাবেই হিন্দুরা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হয়ে উঠেছিল। মিহির যখন লেখেন নিজের অস্তিত্বকে কেমন যেন অলীক বলে বোধ হচ্ছিল তখন সংখ্যালঘু হিসেবে তার আত্মপরিচয়ের সংকটটিও প্রতীয়মান হয়ে ওঠে। পূর্ব-পাকিস্তানকে নিজের দেশ ভাবতে চেয়েছেন তিনি। তিনি বলেছেন — ''ব্যাপারটা যে এরকম ভাবে হয় না তা আমাদের দেশের কর্তারা বুঝলেন না।''[31] এই বাক্যে 'আমাদের দেশ' অর্থে পূর্ব পাকিস্তানের কথাই তিনি বলেছেন। অথচ পারিবারিক শিক্ষা থেকে প্রাপ্ত ঔপনিবেশিক জাতীয়তাবাদী আদর্শ তাঁর স্বদেশবোধকে গড়ে তুলেছিল। তিনি লিখেছেন — ''আমার মায়ের কাছ থেকে স্বদেশী গল্প ও গানের মাধ্যমে যে শিক্ষা আমি স্বাদেশিকতা বিষয়ে লাভ করেছিলাম তার সাথে পাকিস্তানি স্বাদেশিকতার কোন মিল ছিল না। কার্যত প্রতি পদে পদে আমাকে পরবর্তীকালে সাবধানতার সঙ্গে এগোতে হচ্ছিল।''[32] অর্থাৎ জাতিসত্তা নিয়ে এক তীব্র সংকট ছিল কলকাতা গমনোদ্যত পূর্ব পাকিস্তান নিবাসী হিন্দু মধ্যবিত্তের। রাষ্ট্র নেতারাও তাই এই দ্বৈত সত্তার অধিকারী জনগোষ্ঠীকে অবিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন এবং সেই কারণেই মিহিরের কথায় সাবধানতার প্রসঙ্গ এসেছে।

'৪৭-এর ঠিক পরেই যাঁরা উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে চলে আসেন জাতিসত্তা নিয়ে তাঁদের কিন্তু এরকম সংকট ছিল না। তাঁরা পূর্বে ভারতেই ছিলেন এবং সম্পত্তি হারাতে হলেও ভারতেরই অন্যত্র চলে আসেন। সুতরাং তাঁদের জাতীয় পরিচয়ে কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি। মিহিরের সংকট সুতরাং ৪৭ সালে দেশত্যাগী ঐতিহাসিক তপর রায়চৌধুরী অথবা গোপালবাবুর ছিল না, কিন্তু সেই সময়ের রাজনৈতিক পরিবেশ অনুযায়ী গোপালবাবুর জাতীয়তাবোধে ছিল এক উগ্র সাম্প্রদায়িকতা। সেইকারণেই পূর্ববাংলা ত্যাগ করে তাঁরা যেখানে যাবেন, সে দেশ তাঁর কাছে পাকিস্তানের প্রতিস্পর্ধী হিন্দুস্তান — ''সেখান থেকে হিন্দুস্তানে। ঠিক হল আমরা গ্রামের সব লোকের সঙ্গে চলে আসব হিন্দুস্তানে।''[33] আবার ঐতিহাসিক তপন রায়চৌধুরীর মত উচ্চবর্ণীয়, উচ্চশিক্ষিত, উচ্চবিত্তরা দেশভাগের পর মূলত 'কলকাতা'-তেই আসতে চেয়েছেন। তপনবাবুর ভিতর প্রত্যক্ষতঃ সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। অখণ্ড ভারতভূমির জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা আন্দোলন

ও শিক্ষা তাঁকে সংশয় ও সাম্প্রদায়িকতা উত্তরণে সাহায্য করেছিল। তপন রায়চৌধুরী লিখেছেন — ''আইন অমান্য আন্দোলনের ঢেউ আমাদের রাষ্ট্র চেতনা সমৃদ্ধ জেলা শহরটিতে এর আগেই এসে পৌঁছে ছিল। রাস্তায় তিরঙ্গা ঝান্ডা নিয়ে মিছিল আকাশে বাতাসে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি বাড়ির পাশেই পুলিশ হাজতের দরজার পিছনে চেনা-অচেনা অনেক মুখ, দীর্ঘ অনশনের পর তরুণ বিপ্লবী যতীন দাস এর মৃত্যুতে উত্তেজনা, খবরের কাগজে তার মৃত শীর্ণ অবয়বের অস্পষ্ট ছবি — এই সব মিলিয়ে দেশ বলে একটা সত্তা অতি শৈশবেই আমাদের চেতনার অঙ্গ হয়ে গেছিল।''[34] এই ভাবেই বরিশাল নামক পূর্ববঙ্গীয় জেলাটি তাঁর স্মৃতিতে ভারতের ক্ষুদ্র প্রতিমূর্তি হয়ে ধরা দিয়েছে। তিনি বড় হয়েছেন 'ভদ্রজনের বাসা' বরিশাল শহরে। ঐতিহাসিক হিসাবে তার গ্রাম সম্পর্কিত স্মৃতিচারণা বিশ্লেষণধর্মী। গ্রাম সম্পর্কে নাগরিক বিলাস ও রোমান্টিসিজমকে তিনি সচেতনভাবে বাদ দিতে চেয়েছেন — ''কিন্তু বাল্য ও কৈশোরে গ্রামবাসের অভিজ্ঞতা আনন্দময়ই ছিল। অবক্ষয়, আর্থিক সমস্যা, ভবিষ্যতের আসন্ন অন্ধকার আমাদের জীবনে ছায়া ফেলত না। বোধহয় তার একটা কারণ আমরা যেতাম উৎসবের সময় অথবা ফূর্তি করতে। গাড়ি-ঘোড়া বিহীন গ্রাম জীবনে এক ধরনের নিবিড় শান্তির স্বাদ পাওয়া যেত। ...তলিয়ে দেখতে গেলে সে শান্তি হয়তো অলীক। ...কিন্তু আমাদের নদীমাতৃক জেলায় জমির উর্বরতা আর নদীর পুকুরে মাছের প্রাচুর্যের কৃপায় কেউই ঠিক না খেয়ে থাকত না। ...ফলে অনেকের জীবনেই একধরনের সুখ ছিল — একথা বললে বোধহয় অতিরঞ্জন হবে না।''[35] স্মৃতি ও জ্ঞান-এই দুইয়ের সমান্তরাল প্রবাহে তপন রায়চৌধুরীর বয়ান এক বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। হিন্দু সংস্কৃতির ব্রত উদ্‌যাপন, পূজা-পার্বণ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে তাঁর স্মৃতি ও আবেগ তুলনায় কম। কিন্তু তাঁর বয়ানে বরিশাল শহরের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কথা বারংবার উঠে এসেছে। তিনি তাঁর সত্তাপরিচয় গড়ে তুলতে চেয়েছেন আধুনিক মানুষ হিসাবে। গ্রামীণ জমিদার পরিবারের সন্তান পরিচয় থেকে তিনি বিচ্যুত হতে চেয়েছেন, ''আমাদের বংশে অন্তত দুবার দত্তক নেওয়া হয়। তাদের বাপ পিতামহ দেওয়ান ফেওয়ান কিছু ছিলেন না, নিতান্তই ছাপোষা গ্রাম্য গৃহস্থ। দেশভাগের পর কলকাতার এঁদো গলিতে অন্ধকার ফ্ল্যাটে বসে যখন অর্ধোন্মাদ বাড়ীউলীর গালিগালাজ শুনতে হতো, তখন সেই পরিচয়হীন গরিব পিতৃপুরুষদের সঙ্গেই একাত্ম বোধ করতাম। বরিশালের বাংলো বাড়ি কীর্তিপাশা জমিদার ভবন

নিতান্তই অবান্তর interlude মনে হতো।”[36] গ্রামীণ সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির থেকে নাগরিক প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতির পর্বান্তরকে ত্বরান্বিত করেছিল দেশভাগ। এর ফলে অনেক মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে আর্থিক সংকট নেমে এসেছিল, তাঁদের শ্রেণিগত পরিবর্তন হয়েছিল। উচ্চবিত্ত জমিদার মধ্যবিত্ততে, মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্তে পরিণত হয়েছিল অনেক সময়েই। তবে নাগরিক জীবনেও গ্রামীণ মূল্যবোধের স্মৃতি ও শ্রেষ্ঠত্ব তাঁরা — এমনকি তপনবাবুও প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন কখনও কখনও। যেমন — ‘‘আমাদের পরিবারের মধ্যে যাদের শহুরেপনা বা পশ্চিমায়ন কিছু কম, তাদের আধুনিক শ্রেণিসচেতনাও অতটা জাগ্রত ছিল না। পরিণত বয়সে যে মূল্যবোধ শ্রেয় বলে মেনেছি, তার দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের গ্রামবাসী আত্মীয়দের প্রাক আধুনিক শ্রেণি চেতনা তুলনায় অনেক বেশি মানবিকতাবোধে সমৃদ্ধ মনে হয়েছে।”[37] আভিজাত্যের প্রতি তাঁর যে একটা বংশগত আকর্ষণ ছিল তাঁর লেখা থেকে সেই ইঙ্গিতও উঠে এসেছে। বাবার মৃত্যু হলে তিনি লিখেছেন — ‘‘মৃত্যুতে তাঁর শান্ত অভিজাত মুখাবয়ব বড় মহৎ দেখাচ্ছিলো। ... কৈশোরে পৌঁছতেই একটা দূরত্ব এসে যায়। বুঝতাম এতে উনি কষ্ট পেতেন।”[38] বাবার সঙ্গে তপনবাবুর যে দূরত্ব তা সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের সঙ্গে আধুনিক মনের সচেতনভাবে দূরত্ব সৃষ্টির চেষ্টা। তবুও বাবার আভিজাত্যের আকর্ষণ এতটাই অপ্রতিরোধ্য যে বাবার অভিজাত মুখের বর্ণনার সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবে চলে এসেছে মহত্ত্বের সমীকরণ। এই কারণেই তাঁর পূর্বপুরুষের বংশ ইতিহাস চমকপ্রদ কাহিনি বর্ণনার ভঙ্গিতে ‘বাঙালনামা’-তে উঠে এসেছে। তপনবাবু ধর্মীয় মৌলবাদকে যে আন্তরিক ঘৃণা করতেন তা তাঁর বিভিন্ন অভিব্যক্তিতে স্পষ্ট। তবু ধর্ম বা বর্ণ ভিত্তিক তাঁর সামাজিক identity-কে তিনি একেবারে অস্বীকারও করতে পারেননি। বিশ শতকের তিনের দশক থেকে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ চাকুরীজীবী উচ্চবর্ণের হিন্দুকে এক বিশাল সংকটের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। এই সামাজিক সত্যকে তিনি সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই বিচার করেছেন। তবু তার পরেই তিনি লিখেছেন — ‘‘ওই অবস্থায় আমরা যে সবাই মুসলমান বিদ্বেষী হয়ে উঠিনি তাতে প্রমাণ হয় যে জাতীয়তাবাদ আমাদের চেতনায় কিছু সুবুদ্ধির বীজ বপন করতে পেরেছিল।”[39] অথচ জাতীয়তাবাদের অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত ছিলেন না এমন বলা যাবে না। কারণ এই লেখাতেই পাই — ‘‘বাংলায় জাতীয়তাবাদী রাজনীতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার অনুপ্রবেশ

ঘটে ছিল।"[40] জাতীয়তাবাদী রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর সমর্থন-অসমর্থন তাঁর সত্তার পরিচয় সম্পর্কে পাঠকের মনে এভাবেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিছু সঙ্কট তৈরি করে দেয়।

এই কারণেই দেখব কোন কোন ক্ষেত্রে মুসলমানদের ক্ষেত্রে তাঁর এক ধরনের 'অপরতা'র বোধ এসেছে। হিন্দুদের ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার যা থেকে মুসলমানদের অপমানবোধ ও বিষয়টিকে আত্মপরিচয়ের রাজনীতির অন্যতম বিষয় করে তোলা হয়েছিল, সেই বিষয়টি নিয়ে তপনবাবুর বক্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য — ''যখন বারো-তেরো বছর বয়স তখন জানলাম যে নবাবজাদা কীর্তিপাশার মেরধারা, আফাছাড়িয়া, মেনাজদ্দি এরা হলেন এক নেশন আর নগা, বসা, ধর্ম, নায়েব মশাই, পন্ডিত মশাই, আমি, দাদা এরা হলাম আর একটা নেশন। হিন্দু মুসলমানরা যে দুই জাত, গোঁড়া বামুনরা মুসলমানদের ছোঁয়া খায় না সে কথা অবশ্য জানতাম। তবে বিটলেগুলি আমাদের ঘরেও তো খায় না। চৌধুরী সাহেবের বাড়িতেই খাঁটি মোগলাই খানার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়। ও বাড়ি থেকে দাওয়াত আসার প্রত্যাশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতাম। সুতরাং হিন্দু-মুসলমানের ছোঁয়া খায়না এমন অবিশ্বাস্য কথা আমাদের অভিজ্ঞতার অঙ্গ ছিল না।"[41] নিজের শ্রেণি ও ধর্মীয় অবস্থান থেকেই তিনি মুসলমানদের আত্মপরিচয়ের রাজনীতিকে দেখেছেন বলেই আফছারের ধর্মনিষ্ঠ হয়ে ওঠা অথবা সাজু কাকার মুসলিম লীগে যোগদানকে তাঁর আকস্মিক মন হয়েছে — ''হঠাৎ দেখলাম আফছার গ্রাম থেকে ফিরল বেশ ভব্যিযুক্ত কাঁচা পাকা দাড়ি নিয়ে।"[42] অথবা ''১৯৪০ সনে হঠাৎ একদিন মুসলিম লীগের বিশাল ঝান্ডা কাঁধে ওকে শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব করতে দেখা গেল।"[43]

তপনবাবু নিজের আত্মজীবনীর নাম রেখেছেন 'বাঙালনামা'। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকাতে তিনি জানিয়েছেন — ''বাঙালের শ্রমের অন্নে আমাদের দেহ পুষ্ট, বাঙালের ভাষা আমার ভাষা, বাঙালের পবিত্র ক্রোধ আমার দুর্দিনের সহায় — আমি বাঙাল না হলে কে বাঙাল? বাঙালের চরিত্র নিয়ে দুনিয়ার ঘাটে ঘাটে নৌকা বেঁধেছি, অন্নের সংস্থান করেছি।"[44] অর্থাৎ নিজেকে বিশেষভাবে 'পূর্ববঙ্গীয়' এই সত্তাপরিচয়ের দ্বারা চিহ্নিত করতে চেয়েছেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গ নগরকেন্দ্রিক, পূর্ববঙ্গ তুলনায় অনেক বেশি গ্রামীণ, প্রাক-আধুনিক। বিশ শতকের

মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে ২২% মানুষ নগরে বাস করত যেখানে পূর্ববঙ্গে নগরবাসীর সংখ্যা ছিল কেবল ৪%।[45] তপনবাবু যখন সচেতনভাবে পূর্ববাংলার পরিচয়কে স্বীকার করতে চাইছেন তখন মনে হয় — (১) পশ্চিমী সংস্কৃতির প্রতিস্পর্ধী প্রাক-উপনিবেশিক প্রাগাধুনিক কোন এক বাঙালিত্বের সন্ধান করেছেন তিনি, অথবা (২) উদ্বাস্তু ও বাঙাল হিসাবে শহর কলকাতায় তথা পশ্চিমবঙ্গে যে হেনস্থার শিকার হয়েছিলেন এই মানুষেরা, এইভাবে সেই মনোভাবের প্রতি একটা প্রতিরোধ গড়তে চেয়েছেন। বাঙাল পরিচয়ে হেনস্তা হওয়ার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা তপনবাবুর স্মৃতিচারণায় রয়েছে।

এই বিভেদীকরণ সেই সময়ে প্রবল ছিল, এখনো তা অবলুপ্ত নয়। দেশ বিভাগের পরে পশ্চিমবঙ্গীয়রা এক অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়। মীরা মুখোপাধ্যায় নামক জনৈকি 'এদেশী' মহিলার স্মৃতিচারণা থেকে এদেশীয় তৎকালীন মনোভাব সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা করা যায় — ''বুঝতে পারতাম... লোকসংখ্যা খুব বেড়ে গিয়েছিল... অন্যরকম ভাষা টান... আর এমনি সবাই তো বলতোই, এত অভাব অনটন কিসের জন্য ? ওদের জন্যই তো। ...ভাড়া থাকতো জতুর মা। বাপের বাড়ি চেতলায়। জতুর মা বলতো, 'ভাষা ভালো না, ওদের সঙ্গে কথায় পেরে উঠবেন না দিদি। এক হাটে বেচে এক হাটে কিনবে।''[46] বোঝা যায় পূর্ববঙ্গীয়দের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে পশ্চিমবঙ্গে দেখা হয়েছে এক ধরনের আগ্রাসন হিসাবে। এই কারণেই পূর্ববঙ্গীয়দের সাম্রাজ্যবাদী জার্মানদের সঙ্গে উপমিত করা হয়। এই একই কারণে উদ্বাস্তুদের নিবাসস্থলকে 'কলোনি' বলে চিহ্নিত করা হয়ে যায়। বাঙালদের স্বভাব বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয় ঝগড়া করার প্রবণতাকে। আবার তপনবাবু যখন তাকেই বাঙালের ক্রোধ বলে অহংকার প্রকাশ করেন তখন তাকে শুধু প্রচলিত মানসিকতার সমালোচনা বললেই সব টুকু বোঝা যায় না, তাঁর মনোভাবকে 'বাঙালে'র আত্মপরিচয় অর্জনের সংগ্রাম অথবা উদ্বাস্তু রাজনীতিরই প্রকাশ বলা যেতে পারে। তপনবাবু বাঙাল সত্তাপরিচয়কে নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বাঙাল ভাষাকে অবলম্বন করেছেন। তিনি লিখেছেন — ''আমাদের বলিষ্ঠ ভাষা স্থানীয় কৃষ্টির প্রধান অবলম্বন। ওই ভাষা নিয়ে আমাদের গর্বের অন্ত ছিল না। একসময় প্রতিবছর টাউন হলে সাংস্কৃতিক সম্মেলন হত — তার মাধ্যম বিশুদ্ধ বরিশালী।''[47] অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গীয় নাগরিক বাঙালির কাছে এই ভাষা

গ্রাম্য। এলিট বাঙালি সংস্কৃতিতে বাঙাল ভাষাভাষীরা কৌতুকের উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তপনবাবুর সত্তার দ্বিধাবিভক্তি স্পষ্ট বোঝা যায় যখন ওই ভাষার নমুনা ব্যবহার করার সময় তিনি প্রচলিত নাগরিক মনোভাবকে অবলম্বন করে কৌতুক সৃষ্টি করেছেন। বরিশালী ভাষার ওই সাংস্কৃতিক সম্মেলনে এক ঐতিহাসিকের বক্তৃতা বর্ণনা করেছেন তিনি এইভাবে — ''একটা কবিতা পড়লেন। ভাবলেন হগলি বোঝছেন। হ্যাসে দ্যাখবেন কিছুই বোঝেন নাই। মনে হইবে ধরিয়া ফেলাইছেন। তহন দ্যাখবেন চাং মাছের মত পিচলাইয়া পিচলাইয়া যায়।''[48] বাঙাল বা গ্রাম্য পরিচয়কে নাকচ করে শহুরে হয়ে ওঠার এই যে প্রবণতা — তাকে অধিকার প্রতিষ্ঠার রাজনীতিরই ক্রম বিবর্তিত রূপ বলা যেতে পারে। এইভাবে বাঙালরা ক্রমশ পশ্চিমবঙ্গের ভূমিতে নিজেদের স্বাতন্ত্র রক্ষা করেও রাঢ় বাংলার নতুন অধিবাসী হয়ে উঠেছে।

বাঙালরা কি সাম্প্রদায়িক ছিলেন? এ বিষয়ে যুক্তি-তর্ক-আলোচনার অবকাশ আছে। বিশেষত, উচ্চবর্ণের দেশত্যাগী মানুষরা অনেক সময়েই তাঁদের দেশহারানোর বেদনাকে প্রশমিত করতে চেয়েছেন ভিন্নধর্মীয়দের একপেশে ভাবে দায়ী করে। যেমন — গোপালচন্দ্র মৌলিক। এই মানুষদের সাম্প্রদায়িক স্বর না-পসন্দ্ ছিল কম্যুনিস্টদের। সেই কারণেই অশোক মিত্রর দেশভাগের স্মৃতিচারণা আলোচনা করা অতি আবশ্যক হয়ে পড়ে, কেননা তাঁর স্মৃতিলেখার ভঙ্গি, ভাষা, বক্তব্য বুঝিয়ে দেয়, কেন দীর্ঘদিন পর্যন্ত বাংলার কৃষ্টি ও জ্ঞানের জগতে দেশভাগ বিষয়ে লেখা, আলোচনার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ছিল। গোপালবাবুর বক্তব্যে কেবল অন্য সম্প্রদায়ের নিষ্ঠুরতার ছবি ধরা পড়েছে, কম্যুনিস্ট অশোক মিত্র যেন এঁদের মত মানুষদের ধারণার বিপক্ষে প্রতিবাদ জানানোর চেষ্টা করেছেন তাঁর স্মৃতিচারণায়। তাই তাঁর লেখায় নিজ সম্প্রদায়ের হিংসাত্মক মনোভাবের ছকভাঙা ছবি প্রাধান্য পেয়েছে — ''একচল্লিশ সালের একটা বড়ো সময় জুড়ে ঢাকায় আমরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শিকার হই। ... বারো-চোদ্দো বছরের বাচ্চা ছেলেদের ধরে পাড়ার দাদারা ছুরি চালানোয় হাতে খড়ি দিচ্ছেন। প্রথমে কলাগাছে ছুরি চালিয়ে নিশানা এবং আঙ্গিক রপ্ত করা; ছেলেছোকরারা এই বিদ্যায় তালেবর হয়ে উঠলে তাদের মন অস্থির, হাত নিশপিস।''[49] দুই সম্প্রদায়ের একে অপরকে আক্রমণের ছবিটি বর্ণনা করেছেন তিনি এক বিশেষ কায়দায় — যেখানে তাঁর গোষ্ঠীসংলগ্নতাকে অস্বীকার করার প্রচেষ্টা স্পষ্ট এবং সেই কারণেই বাক্যগুলি

ভাববাচ্যতে লেখা — ''অন্য সম্প্রদায়ের কোনও গরিব ফেরিওয়ালা এ পাড়ায় এলে কীভাবে তাঁর পেট ফাঁসিয়ে দেওয়া হ'তো, এ পাড়ার শিক্ষক বা কেরানি ও-পাড়ার মধ্য দিয়ে শর্টকাট করতে গিয়ে কেমনভাবে আক্রান্ত হতেন, ... চোখের সামনে সে সব দৃষ্টান্তিত হতে দেখেছি।''[50] বাক্যগুলি ভাববাচ্য এই কারণে, কে বা কোন্ সম্প্রদায় হত্যাকারী — সে বিষয়টিকে ঝাপসা করে দেওয়াই স্মরণকর্তার অভিপ্রায়। পারস্পরিক বিশ্বাস নষ্ট হয়ে উভয় সম্প্রদায়ই হানাহানিতে মেতেছে — এরকমই একটি ভারসাম্যমূলক মনোভাব ও বক্তব্য ধরা পড়ে কম্যুনিষ্ট নেতার স্মৃতিচারণায়।

অশোকবাবুর কম্যুনিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি দেশভাগের হেতু হিসেবে শোষিতের উপর শোষকের নৃশংস অত্যাচারকেই নির্দিষ্ট করেছে। তাঁর মামাবাড়ি ছিল জমিদার পরিবার। মুসলমান প্রজার উপর হিন্দু জমিদারের অত্যাচারের নৃশংস ছবি এঁকেছেন তিনি তাঁর স্মৃতিচারণায় — ''... জমিদারনন্দন কর্ষিতা মাঠের আল ধরে উত্তর থেকে দক্ষিণে আসছেন, একটি তরুণ মুসলমান প্রজা, হয়তো বড়ো জোর সতেরো-আঠারো বছর বয়স হবে, সেই আল বেয়েই দক্ষিণ থেকে উত্তরবর্তী। প্রথাগত ব্যাকরণের নাকি অনুজ্ঞা, জমিদারবাড়ির কেউ উল্টো দিক থেকে আলের পথে হেঁটে এগিয়ে এলে প্রজাকুলের প্রতেককে সঙ্গে-সঙ্গে আল থেকে নেমে যেতে হবে। সেই অবোধ প্রজাসন্তান, নিয়মটা হয়তো ভালোমতো জানতো না; জমিদারনন্দনের মুখোমুখি হয়ে সেই নির্বুদ্ধির ঢেঁকি, এত আস্পর্ধা, আল থেকে না নেমে শরীরটা একটু বেঁকিয়ে তাকে জায়গা করে দিয়েছিল। ... ছেলেটিকে পেয়াদা পাঠিয়ে বেঁধে নিয়ে আসা হলো তখনই। জমিদারবাড়ির প্রাঙ্গণে তার শরীরটি আছড়ে ফেলা হলো, দড়ি দিয়ে তাঁর হাত-পা বাঁধা হলো। তারপর পেরেক-ঠোকা একটি কাঠের তক্তি দিয়ে প্রহারে-প্রহারে তাকে রক্তাক্ত-জর্জরিত করা।''[51] উক্ত স্মৃতির কথনে কিছু বিষয় বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জমিদারনন্দনের সঙ্গে নিজ ব্যক্তিগত আত্মীয়তার দিকটি অস্বীকার করার প্রবণতা রয়েছে ভাষ্যে। সেইকারণেই উত্তমপুরুষের ব্যবহার এই অংশের কথনে নেই। নৈর্ব্যক্তিক, সর্বজ্ঞ কথন ভঙ্গি ব্যবহার করেছেন তিনি। গোপালচন্দ্র মৌলিকের মত মুসলমান প্রজার আচরণে তিনি ঔদ্ধত্য দেখেননি, দেখেছেন নির্বুদ্ধিতা। ক্ষমতার মদমত্ত মানুষ যাঁরা এই আচরণকে 'স্পর্ধা' হিসেবে দেখতে চান, অশোকবাবুর ভাষ্যে তাঁদের প্রতি ব্যঙ্গ বর্ষিত হয়েছে। জমিদার বংশের আভিজাত্যের প্রতি বিন্দুমাত্র দুর্বলতা প্রকাশ করেননি অশোক মিত্র মহাশয়, পরন্তু উচ্চবর্ণীয় হিন্দু জমিদারদের এই

শোষণই যে শ্রেণিসংঘাতকে অনিবার্য করে তুলেছিল — যার পরিণাম দেশভাগ সেকথা তিনি অনুভব করেছিলেন বলেই লিখেছেন — ''ওই দুঃস্বপ্নস্মৃতি কোনওদিন ভুলতে পারিনি। ওই স্মৃতির অভিজ্ঞতাই আমাকে বুঝতে শিখিয়েছে, পূর্ববঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায় কেন পাকিস্তানের সমর্থনে তাঁদের সম্মতি জ্ঞাপন করেছিল। কে জানে, আমার বামপন্থী মানসিকতার উৎসও হয়তো ওই স্মৃতির অসহ্য নিপীড়নে নিহিত।''[52] সুতরাং দেশভাগ তাঁর কাছে মার্কসবাদ-দীক্ষার প্রথম পাঠ বলা যায়।

সুতরাং ফেলে আসা দেশ নিয়ে নস্টালজিয়া তাঁর কাছে প্রতিবিপ্লবী মানসিকতা। তাই তিনি খুব স্পষ্টভাবেই জানান — ''দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে আমরা অনেকেই বিচ্যুত। যে শহরে আমি বেড়ে উঠেছি, সেই ঢাকা থেকে আমি নির্বাসিত। তা হলেও সেই শহরের জন্য তেমন কোনও আলাদা কাতরতা অনুভব করি না।''[53] এই কারণেই হিন্দু-মুসলমানের গোষ্ঠীসংঘর্ষ, দেশভাগের যন্ত্রণা, উদ্বাস্তু জীবনের কঠোর সংগ্রাম নিয়ে তাঁর বা তাঁর মতো অনেকের হিরণ্ময় স্তব্ধতা। অশোকবাবুর লেখাতেও দেখি নোয়াখালি দাঙ্গার উল্লেখমাত্র আছে। এরপর নবসৃষ্ট পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে হিন্দু-মুসলমান ছাত্রদের মিলনোৎসব ও একত্রে আন্দোলনের বর্ণনা প্রাধান্য পেয়েছে। দেশভাগ নামক বিশাল ঐতিহাসিক ছেদটিকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করে গিয়ে তাঁর স্মৃতিচারণার ভাষ্য মসৃণ হয়ে থেকেছে এইভাবে।

যদিও বিভিন্ন স্মৃতিচারণা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, দেশভাগের প্রক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া এত মসৃণ ছিল না। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত মানুষদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই ছিল সামাজিক ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রেও। শুধুমাত্র পিতৃপুরুষের ভিটে অথবা সম্পত্তি হারিয়ে একস্থান থেকে উৎখাত হয়ে অন্যস্থানে যাওয়ার ঘটনা এটি নয়। ইতিহাস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় ভিটেমাটি ছেড়ে মানুষ বিভিন্ন সময়ে স্থানচ্যুত হয়ে অন্যস্থানে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছে। সর্বহারা মজুর অথবা ভাগচাষীরা তাদের সঠিক 'দেশ' কোথায়, তা কখনোই নির্দিষ্ট করতে পারেনি। ভাত-কাপড়ের সন্ধান তাদেরকে চিরকালই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গাতে ঠেলে দিয়েছে। আবার বর্গী আক্রমণের সপ্তদশ শতকে আতঙ্কিত বঙ্গের পশ্চিম প্রান্তের মানুষ প্রাণ রক্ষার জন্য চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল তদানীন্তন অখণ্ড বাংলার পূর্বপ্রান্তে। স্বয়ং রাজা লক্ষ্মণসেনও বখতিয়ার খিলজির কাছে

যুদ্ধে হেরে গিয়ে পূর্বপ্রান্তে গিয়ে রাজ্যস্থাপন করেছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম ঘটনার নজির অজস্র। কিন্তু আধুনিক পৃথিবীর নতুন জাতি-রাষ্ট্র (Nation-state) ধারণা বিভিন্ন ভূখণ্ডের মাঝখানে তৈরী করেছে 'বর্ডার' নামক এক নতুন ভেদচিহ্ন — যা দুই-ভূখণ্ডের মধ্যে অনায়াস পারাপারে এনেছে নতুন বাধা। বাংলাভাগ নিয়ে স্মৃতিচারণা করার সময় বেশ কিছু লেখায় প্রাধান্য পেয়েছে এই 'বর্ডার' কেন্দ্রিক আতঙ্ক ও সমস্যা। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক ম্যানেজার স্মৃতিরঞ্জন মৃধা জানিয়েছেন — ''বাস্তবে বেড়াহীন সেই দাগ আমি বৈধতাবিহীন ভাবে সাতবার আর বৈধভাবে বারো-দুগুণে চব্বিশবার পারাপার করেছি।''[54] সুতরাং আধুনিক দেশ বা রাষ্ট্রের ধারণা নিয়ে এসেছে স্থানচ্যুতি অথবা অন্যস্থানে বসবাসকেন্দ্রিক বৈধ-অবৈধতার প্রসঙ্গ। রাষ্ট্র নামক নির্দিষ্ট ভূখণ্ডতে প্রবেশ ও বসবাস করার জন্য আবশ্যক নবসৃষ্ট বিভিন্ন ধরণের কাগুজে পরিচিতি। গণতন্ত্র ও রাষ্ট্রব্যবস্থা নির্মাণকালে এ হয়তো ছিল জাতি-পরিচিতিকে নির্দিষ্ট ও সমস্যাহীন করার প্রচেষ্টা। বাস্তবে বিষয়টা হয়ে দাঁড়ালো ভিন্নরকম। এই আধুনিক সভ্যতার নিয়মরীতি ও জ্ঞানচর্চা সম্পর্কে অনেক আগেই পরিহাসচ্ছলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন — ''...সুবিচার করিবার সহজ প্রণালী বাহির করিতে গিয়া আইন বাহির হইল, শেষকালে আইনটা ভালো করিয়া বুঝিতেই দীর্ঘজীবী লোকের বারো-আনা জীবন দান করা আবশ্যক হইয়া পড়ে।''[55] বিশেষতঃ, দেশভাগের পরে স্থানচ্যুত মানুষগুলির কাছে রাষ্ট্র, বর্ডার, নাগরিকত্ব-পরিচিতির অথবা বর্ডার পারাপারের কাগুজে প্রমাণ — ইত্যাদি আইনতন্ত্র এক ভয়ংকর সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছিল। স্মৃতিরঞ্জনবাবুকে এতবার বাংলার বিভক্ত দুই ভূখণ্ডের সীমারেখা যে পারাপার করতে হয়েছে, তার কারণ তাঁদের পরিবার ভেঙে দুটুকরো হয়ে গিয়েছিল। কৃষিজীবী পরিবারটির সকল সদস্য তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের মাটি ও ফসলের সম্পদ ত্যাগ করে আসতে না পারলেও পরিবারের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য ভারতে চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন। ওপার-এপার দেশে পরিবারের দুইখণ্ড, রাষ্ট্রের আইনী পদ্ধতি আত্তীকরণ হয়নি, সুতরাং জীবন ও সম্মানকে বাজি রেখে বারংবার সীমারেখা অতিক্রমণ। স্মৃতিরঞ্জনবাবুর স্মৃতিকথা থেকে জানতে পারি, কোনবার ট্রেনে ভিন্ন সম্প্রদায়ের দুর্বৃত্তদের দ্বারা তাদের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠিত হয়েছে, আবার কখনও অতিরিক্ত টাকা দিয়ে পুলিশের থেকে লুকিয়ে দালালদের সাহায্যে ওপার-এপার করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে এইভাবে ওপারে

পৌঁছে ভারতের গুপ্তচর হিসেবে তিনি ও তাঁর বয়স্ক ঠাকুমা গ্রেপ্তার হয়েছেন। তাঁর ভাষায় 'বর্ডার নামক বিভীষিকা' পেরিয়ে এপারে এসেও তাঁদের নিজের ভূমি বাড়ি জোটেনি, আশ্রয় হয়েছে কুপার্স ক্যাম্পে। পুনরায় বিদ্যালয়ের পড়া সম্পূর্ণ করার জন্য তাঁকে পূর্বপাকিস্তানে ফিরে যেতে হয়েছে। ১৯৭২-এর পর তিনি আবার যেভাবে অবৈধভাবে সীমানা পার করলেন তার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন — ''... কোমর সমান তরল কাদার ড্রেনের মতো রাস্তায় সারা গায়ে কাদার প্রলেপ নিয়ে, কাদা ঠেলে ঠেলে এগোতে এগোতে শুনলাম আমরা ভারতে ঢুকে যাচ্ছি। ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে কোন দিকে কোন পিলার, কোন খুঁটি বা বেড়া বা র‍্যাডক্লিফের কলমের আঁচড়ের চিহ্ন দেখতে পেলাম না।''[56] প্রথম বাক্যটি তদানীন্তন পরিস্থিতি বর্ণনায় এক অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ চিত্রকল্প হয়ে উঠেছে যেন — সাধারণ নিম্নবর্গীয় ভূমি সংলগ্ন মানুষের এই স্রোত সদ্য জন্মলাভ করার দুই রাষ্ট্রের কাছেই কর্দমাক্ত আবর্জনার স্রোত স্বরূপ। আবার অন্যদিকে দ্বিতীয় বাক্যটি এই মানুষগুলির জীবন সংকটের ঘূর্ণাবর্তের মাঝে রাষ্ট্রের কৃত্রিম ভেদাভেদকে ধূলিসাৎ করে দেয় মোহহীন ভাবে, 'বর্ডার'-এর তাৎপর্যকে জেরা করে। বস্তুতঃ আধিপত্যবাদী রাষ্ট্রনিয়ম উদ্বাস্তুদের এক গভীর আত্মপরিচয়ের সংকট তৈরী করেছিল। সেই সংকটের স্বরূপ বোঝা যায় স্মৃতিরঞ্জনবাবুর লেখা কয়েকটি কথায় — ''১৯৫৪-তে illegal migrant, ১৯৬৪ থেকে অবাঞ্ছিত উদ্বাস্তু, ১৯৭১-এ শরণার্থী ও ১৯৭৫-তে ও ১৯৬৫-তে অবাঞ্ছিত হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানে এবং ১৯৭২-এ বাংলাদেশের অবাঞ্ছিত হিসেবেই ঢুকেছি।''[57]

বস্তুতঃ দেশ বিভাজনের পরে ভূমিসংলগ্ন মানুষ, যাঁদের জীবিকা ছিল প্রকৃতি ও পরিবেশ নির্ভর এবং যাঁরা মূলত ১৯৫০ সালের পর এদেশে চলে আসা শুরু করেন, তাঁরা স্থান পান কিছু সরকারি ক্যাম্পে। উচ্চবর্গীদের তুলনায় ক্যাম্পবাসী নিম্নবর্গীয়দের দেশভাগ ও তার প্রতিক্রিয়াকে 'দেখা'-র ও স্মৃতিতে তুলে আনার ভঙ্গিটি একেবারে স্বতন্ত্র। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক অবনমন নয়, তাদের সংস্কৃতি, মূল্যবোধ এবং অবশ্যই রাজনৈতিক আত্মপরিচয় — এসব কিছুই ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় দেশভাগের পরে। নিম্নবর্ণীয় দরিদ্র মানুষরা একবস্ত্রে সহায় সম্বলহীনভাবে এপার বাংলায় চলে আসতে বাধ্য হন। F. C. Bourne, পূর্ববঙ্গের শেষ ব্রিটিশ গভর্নর, ১৯৫০ সালের একটি রিপোর্টে নিম্নবর্গীয় উদ্বাস্তু মানুষদের সম্পর্কে বলেন, পূর্ববঙ্গ থেকে এঁরা বিতাড়িত

হয়েছিলেন — "nothing beyond their lives and the clothes they stand up in" ।[58] পশ্চিমবাংলায় এই নিঃস্ব মানুষগুলি অস্থায়ী বাসস্থান হয় বিভিন্ন ক্যাম্পে। নেহেরু ভারতের পূর্ব প্রান্তের অবিরত উদ্বাস্তু স্রোতকে প্রতিহত করতে চেয়েছিলেন। এমনকি তাঁর আশা ছিল যাঁরা ভারতে এসেছেন তাঁরা একদিন ফিরে যাবেন। ক্যাম্পে 'ডোল' প্রদানের মাধ্যমে সরকার এদের সাময়িক দায়িত্ব নিতে চেয়েছিল। কিন্তু ক্যাম্পবাসীরা যখন ফেরৎ যেতে চাইল না, তখন ''সরকারের কাছে ক্যাম্পগুলি হয়ে উঠল "symbol of permanent dependence" ।[59] ঐতিহাসিক জয়া চ্যাটার্জী ক্যাম্পগুলিকে Concentration camp-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং সরকারি মনোভাব প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন — "at that time officials blamed these embarrassing exodus upon inherent defects in character of refugees..."[60] প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী গণেশ হালুই লিখেছেন — ''১৯৫০ সালে দেশ ছাড়তে হল। ... রানাঘাটের উদ্বাস্তু ক্যাম্পে ঠাঁই হ'ল। ক্যাম্প জীবনের ভয়াবহ স্মৃতি কোনওদিন ভোলবার নয়।"[61] এই মানুষগুলির সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ-হত্যার ক্লেদাক্ত দিনগুলির বর্ণনা তাঁর লেখনীতে উঠে এসেছে — ''সামান্য প্রাপ্তির লোভে মানুষ কত অনায়াসে বিবেক বিসর্জন দিতে পারে।... এসব নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য। ... দেশভাগের স্বাধীনতা এদের আমূল পালটে দিল।"[62] যদিও গণেশ হালুই নিজেও ক্যাম্পবাসী ছিলেন, কিন্তু ক্যাম্পনিবাসীদের বর্ণনায় উত্তমপুরুষের বহুবচন যেহেতু তিনি ব্যবহার করেননি, সেই হেতু বোঝা যায় যে, তাঁর মধ্যে শ্রেণি উত্তরণের ইচ্ছা ছিল, অথবা স্মৃতিচারণার 'বর্তমান'-এ তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিল্পী সত্তা ক্যাম্পবাসীদের থেকে নিজেকে বিযুক্ত করতে পেরেছিল। সেই কারণেই ক্যাম্পবাসী সাধারণ মানুষ তাঁর বয়ানে 'অপর' তৃতীয় পুরুষ। আধিপত্যবাদী ক্ষমতাশালীদের বয়ান তাঁর স্মৃতিচারণাকে প্রভাবিতও করেছেন — ''...এরা দান-ত্রাণ পেয়ে বেঁচে থাকতে ভালবাসে। এরা আলস্যে দিন কাটাতে ভালবাসে।"[63] অথচ এই ক্যাম্পবাসীদের মধ্যেও গণেশ হালুই স্বতন্ত্র, তাঁর স্বর-ও স্বতন্ত্র তাই। সেই স্বর ক্যাম্পনিবাসের বিভীষিকার মধ্যেও শিল্পী-সত্তাটিকে প্রকট করে তুলতে চায় — ''তবু এরই-মধ্যে আমি স্বপ্ন দেখি। আমার এ স্বপ্নের কেউ অংশীদার হয় না।"[64] দেশত্যাগ তাঁর কাছে মৃত্যুতুল্য হলেও সেই দুর্বিপাককে ব্যাখ্যা করার সময় শিল্পী গণেশ হালুই এক উদাসীন দার্শনিকতার দ্বারা আক্রান্ত হ'ন — ''নির্ঘাত

মৃত্যু থেকে বেঁচে ওঠাতেই মানুষ মৃত্যুর কথা ভোলে। এবং এই ভোলার মধ্যেই যে আনন্দের ধারা — তাতেই সেই মৃত্যুর সুর বাজে।"[65] ক্যাম্পবাসীদের জীবন বর্ণনায় তাই তাঁর শিল্পীসত্তার স্বর স্বতন্ত্র ও নিঃসঙ্গ!

কিন্তু এই স্বর ক্রোধ ও আক্রোশে উচ্চকিত নিজেকে 'চণ্ডাল' বলে পরিচিত করা দলিত লেখক মনোরঞ্জন ব্যাপারীর ভাষ্যে। গণেশ হালুই ক্যাম্পবাসীদের মৃত্যুর বিবরণ দিলেন — ''হঠাৎ একটা মানুষ মরে গেল কলেরায়।"[66] মনোরঞ্জন ব্যাপারীর স্মৃতিলেখায় এই মৃত্যু কিন্তু বিচ্ছিন্ন আকস্মিক অথবা কার্যকারণহীন নয়। তিনি বলেছেন — ''ক্যাম্প থেকে জেল বাবদ যে চাল ডাল দেওয়া হ'ত, তা খাদ্য হিসেবে অতি জঘন্য, একদম নিকৃষ্ট মানের। ... মুখে তুলতে গেলে বমি আসত। পেটের মধ্যে গিয়ে কেমন যেন মোচড় মারত।"[67] নিম্নবর্গীয় ক্যাম্পবাসী উদ্বাস্তুদের জীবনযাপনের সংকটজনক ও নিম্নমান যে চূড়ান্ত অবহেলার দান, তা মনোরঞ্জন বাবুর বক্তব্যে স্পষ্ট। এই মানুষগুলির মৃত্যু তাই অনিবার্য ও আতঙ্কজনক। মনোরঞ্জনবাবু তাই বলেছেন ''বেশ কয়েক মাস চলেছিল এই মৃত্যুর মিছিল। এক সময় তো এমন হয়েছিল যে, জঙ্গলে আর শুকনো কাঠই পাওয়া যেত না।"[68] মনোরঞ্জন ব্যাপারীর স্মৃতিচারণায় তাঁর নিম্নবর্ণীয় আত্মপরিচিতির আত্মাভিমান ছত্রে ছত্রে মুদ্রিত। এদেশে এসে আশ্রয়প্রার্থী নিম্নবর্গীয় উদ্বাস্তুদের ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার বর্ণনা পাই তাঁর স্মৃতিকথায় — ''সবাইকে ভারত সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারীরা বড় নির্দয়ভাবে গরু-মোষের মতো মালপত্রসহ গাদা মেরে দিয়েছিল একটা ট্রাকে। সে ট্রাকের উপর কোনও আচ্ছাদন ছিল না। নমো-পোদ জেলে এইসব নিম্নবর্ণের মানুষ, রোদে জলে যাদের জীবনধারণ, তাদের জন্য আবার ওসব আদিখ্যেতার কী?"[69] এই যে সব নিম্নবর্ণীয় জাত, গ্রামীণ সামন্ত্রতান্ত্রিক মধ্যযুগীয় কাঠামোতে এরা ছিল সামাজিক ভাবে নির্যাতিত এবং আর্থিক ভাবে শোষিত। মনোরঞ্জনের স্মৃতির ভাষ্যে ধরা পড়ে দেশভাগের পরেও সেই সামাজিক-আর্থিক দমননীতি একইভাবে থেকে গেছে উচ্চবর্ণীয় ও রাজনীতির সহযোগ-ষড়যন্ত্রে। তাই তাঁর লেখায় পাই ''পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে আসা বিরাটসংখ্যক মানুষ, ... যার মধ্যে ছিল দুটো শ্রেণি। একদল শিক্ষিত সচ্ছল উচ্চবর্ণ। এক কথায় ভদ্রলোক। এই শ্রেণির দেশের তাবড় তাবড় রাজনেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এরা সরকারি দয়া দাক্ষিণ্য পাওয়ার আশায় ক্যাম্পে গিয়ে ঢুকে পড়া, চিরকাল যাদের

অস্পৃশ্য-অচ্ছুত-জনঅচল বলে ঘৃণা করে এসেছে, তাদের পাশাপাশি বাস করাকে অতি অমর্যাদার মনে করে সে পথ বর্জন করে, নিজেদের রাজনৈতিক যোগাযোগ কাজে লাগিয়ে, শহর কলকাতার মধ্যে বা আশেপাশে একখানি লাঠি আর চারখানা খুঁটির জোরে একের পর এক জবরদখল কলোনি পত্তন করে নিজেদের জীবন-জীবিকার একটা ব্যবস্থা করে নিতে সক্ষম হচ্ছিল।"[70] পরবর্তীকালে উগ্রপন্থী কম্যুনিষ্ট আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়া লেখকের এই স্মৃতিকথায় নিম্নবর্গীয় সর্বহারার চেতনা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার আগ্রহ সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। তাঁর ক্রোধ ও প্রতিবাদকে তিনি উচ্চকিত ও তীব্র করে তুলেছেন স্মৃতিলেখায় অমার্জিত শব্দ ব্যবহার করে — ''এত মানুষ এদের মলমূত্র ত্যাগের জন্য কোন সরকারি ব্যবস্থা আমার চোখে পড়ে নি। কি পুরুষ কি মহিলা সবাইকে জলভরা ঘটি নিয়ে মাঠে জঙ্গলে ছুটতে হত। এও মনে হয় সেই মানসিকতার ফসল। এইসব ছোটজাত চিরকাল তো মাঠে জঙ্গলে হাগে মোতে। এদের জন্য এই ফালতু খরচা আর কি দরকার।"[71] ঐতিহাসিক জয়া চ্যাটার্জী তাঁর লেখায় নিম্নবর্গীয় উদ্বাস্তুদের প্রতি রাষ্ট্রের দয়া প্রদর্শনজনিত রাজনীতির বিষয়ে আলোচনা করেছেন। মনোরঞ্জন ব্যাপারী স্পষ্ট বললেন — ''দয়া নয়, দরদ নয়, নিতান্ত দায়।"[72] পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী 'দায়' শব্দটির ব্যবহারে তার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায় অবহেলার মনোভাবও। এই দায় পালনের প্রতিটি পদক্ষেপকেই তাই তাঁর রাষ্ট্রের ষড়যন্ত্র বলে মনে হয়েছে — যে রাষ্ট্রব্যবস্থায় উচ্চবর্ণেরাই ক্ষমতাশালী। তাই ক্যাম্পবাসীদের পুনর্বাসনের রাষ্ট্রপ্রদত্ত প্রস্তাবকে তিনি ব্যাখ্যা করলেন এইভাবে — ''...তখন তাদের উচ্চবর্ণ উচ্চমস্তিষ্ক থেকে বের হল এক পরিকল্পনা — যেমন মানুষ তাদের পাঠান হবে তেমনই এক উপযুক্ত স্থানে, আর সেটা আন্দামান।"[73]

সরকার মনে করতেন ক্যাম্প নিবাসী উদ্বাস্তুরা আত্মসম্মানহীন অলস পরজীবীমাত্র। কিন্তু মনোরঞ্জনবাবুর নিম্নবর্গীয় আত্মসচেতন ভাষ্যে উঠে এসেছে প্রতিবাদী বিপরীত আখ্যান। মনোরঞ্জনবাবু আহারে, অপুষ্টিতে ভোগা ক্যাম্পবাসী উদ্বাস্তুদের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখলেন — ''একথা এই সরকার ছাড়া কারও পক্ষে অস্বীকার করবার উপায় নেই যে নমঃ পোঁদ জেলে মালো এই সব লোক কঠোর পরিশ্রমী। এরা কেউ শখ করে ক্যাম্পে বসে খাবার জন্য দেশত্যাগ করে আসেনি।"[74] মনোরঞ্জনবাবুর স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে ডোল বন্ধ করার প্রতিবাদ, সঠিক

পুনর্বাসন ইত্যাদি বিভিন্ন দাবীতে ক্যাম্পনিবাসীদের মরণপণ আন্দোলনের ইতিহাস। তাঁর স্মৃতিলেখায় উদ্বাস্তুদের উপর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিভিন্ন ঘটনার উদাহরণ প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর বয়ানে রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিপক্ষ হয়ে উঠেছে সর্বহারা নিম্নবর্ণীয় উপোসী উদ্বাস্তুরা। বাংলাভাগ হওয়ার পর 'দেশ' এই উদ্বাস্তু মানুষদের কাছে যেন এক যুদ্ধক্ষেত্র। তাই এই প্রতিবাদ-আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য — ''একদিকে সশস্ত্র পেট ভরে খেতে পাওয়া সরকারি পোষ্যপুত্ররা, অন্য দিকে নিরস্ত্র না খাওয়া 'অনাথ মানুষ'।''[75] শোষণ ও অত্যাচারেরই নামান্তর বলে তিনি ভেবেছেন দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসনের সরকারি প্রচেষ্টাকে। উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে আলস্যের অভিযোগকে নস্যাৎ করে তিনি লিখলেন — ''সে কী জমি! ... যত জোরে মারো গাঁইতি, তিন চার ইঞ্চির বেশি তা ঢুকবে না। ... মনে আছে, এক মাসে আমাদের লোহার গাঁইতি ক্ষয়ে গিয়েছিল।''[76] সুতরাং দণ্ডকারণ্য উদ্বাস্তুদের কাছে নির্বাসনতুল্য। পাঞ্জাবের হত্যালীলা ও সন্ত্রাস সংক্রান্ত পশ্চিমপ্রান্তের উদ্বাস্তুদের 'ট্রমা'র সঙ্গেই তুলনীয় মনোরঞ্জন ব্যাপারী বর্ণিত দণ্ডকারণ্য বসবাস-কেন্দ্রিক উদ্বাস্তুদের আতঙ্ক — ''দণ্ডকারণ্যের প্রত্যেকটা রিফিউজির কাছে দণ্ডকারণ্য দেশ নয়, ... স্রেফ একটা বন। যে বন মনের উপর চেপে বসে আছে। দশ-বিশ-তিরিশ বছরেও সে বন অপসারিত হওয়ার নয়।''[77] বস্তুতঃ স্বাধীনতার ঠিক পরেই কিছু মানুষ 'দেশহীন' হয়ে গিয়েছিল। মনোরঞ্জন ব্যাপারী বারংবার লিখেছেন ক্যাম্প থেকে নাম কাটা যাওয়ার পরে তাঁদের 'নেই মানুষ' হয়ে খাওয়ার কথা। তিনি লিখেছেন — ''আমি এক নেই দেশের বাসিন্দা। এখন ও দেশের কেউ নই। এদেশেরও কেউ নই। ওদেশে আমার পরিচয় বিধর্মী, কাফের, মালাউন, ভারতের চর। এদেশে আমার পরিচয় রিফিউজি শরণার্থী, উদ্বাস্তু, অনুপ্রবেশকারী।''[78] আত্মসংকটের মুখোমুখি দাঁড়ানো এবং জমি, জীবিকা, সংস্কৃতি ও পরিচয় হারানো ক্যাম্পবাসী উদ্বাস্তুদের নিম্নবর্গীয় আত্মপরিচয় ও অধিকার প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক ভাষ্য হয়ে উঠেছে মনোরঞ্জনবাবুর দেশভাগের স্মৃতিলেখা। তাঁর ভাষ্য বলে দেয় দুইবঙ্গেই বঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও নিম্নবর্ণীয় মানুষদের ক্ষমতায়নের স্বপ্নকে বিন্দুমাত্র বিনষ্ট করতে পারেনি দেশভাগ। ঐতিহাসিক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় — "Yet this inability to be incharge of the realities of power did not destroy their dream of empowerment."।[79] এই কারণেই উচ্চবর্ণের মানুষদের পূর্ববঙ্গের স্মৃতিচারণায় গ্রাম যখন

রোমান্টিক নস্টালজিয়া, তখন নিম্নবর্ণীয়দের স্মৃতির আলেখ্যতে ক্রোধ ও ক্ষোভের প্রকাশ যা ক্ষমতায়নের রাজনীতিরই প্রকাশ বলা যেতে পারে।

উচ্চবর্ণের মানুষ যখন তাঁদের আধিপত্য ও সম্মান নষ্ট হওয়ার ভয়ে দেশত্যাগী তখন নমঃশূদ্র যতীনবালা প্রমুখদের স্মৃতিকথায় সরাসরি উঠে এসেছে দাঙ্গায় আক্রান্ত হওয়ার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা — ''...মুসলমানগণ ও দাঙ্গাবাজরা মিলিতভাবে, আমাদের বৌলপোতা গ্রাম আক্রমণ করে। আমরা গ্রামের মানুষজন সব প্রাণভয়ে মরি পড়ি, ছুটে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিই মাঠের ঘন বেনাবনে। দাঙ্গাবাজরা আমাদের গ্রামের অধিকাংশ ঘরবাড়ি, আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দেয় এবং ঘরের মূল্যবান জিনিস লুটপাট করে নিয়ে যায়।''[৪০] কিন্তু এতকিছুর পরেও মুসলমান সম্প্রদায় যতীনবালার কাছে প্রতিপক্ষ নয়। তাই তিনি লেখেন গ্রাম ছাড়ার আগে — ''এইসব বিশিষ্ট মুসলমানদের কাছে ... আমাদের বড়দাদা মতামত নিতে গেলেন।''[৪১] গোপালচন্দ্র মৌলিকের লেখনীর মুসলমানদের ক্ষমতাদর্পী ঔদ্ধত্যের রূপাঙ্কণের পাশে যতীনবালার লেখায় মুসলিম 'বিশিষ্টজনের' পরামর্শ গ্রহণ এক অসাধারণ বৈপরীত্যের বয়ান তৈরী করে দেয়। যতীনবালার স্মৃতিতে পশ্চিমবাংলায় এসে দেশত্যাগী নির্ধন মানুষগুলির দিনযাপনের এক বিবমিষার ছবিও ধরা পড়ে — ''অনিশ্চয়তায় দিশাহারা শরণার্থী মানুষ মুখ হাঁ করে পড়ে আছেন, নীল ডুমোমাছি সে হাঁ-এর ভেতর যাচ্ছে, আসছে...। ... চারদিকে থুথু, কফ, প্রস্রাব, পায়খানা, রক্তমাখা ন্যাকড়া আর নোংরা মানুষদের ঘিঞ্জি।''[৪২] বর্ণনার এই অতিরিক্ততাও এক অর্থে আত্মপরিচয়ের রাজনীতির ভাষাতেই নির্মিত। এই সবটুকু নিয়েই দেশভাগের নিম্নবর্গীয় স্মৃতিচারণা জাত-পাত বিভক্ত সামাজিক স্তরবিন্যাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তৈরী করে।

একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে পুরুষের সুষ্ঠ দেশবিভাগের ন্যারেশনে নারী কোনভাবেই প্রধান চরিত্র হয়ে ওঠেনি। অথচ নারীর ইজ্জত প্রায় একটি জাতির পরিচয় নির্ণায়ক বয়ান হয়ে উঠেছিল। পশ্চিমবঙ্গের ন্যারেশনে উচ্চবর্ণের অথবা নিম্নবর্ণের নারীকে কেবল অত্যাচারিত অথবা নির্যাতিত দেশের প্রতীক হিসেবে দেখানো হয়েছে। মিহির সেনগুপ্ত অথবা গোপালচন্দ্র মৌলিকের স্মৃতিতে নারী ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পবিত্রতার প্রতিমূর্তি। নমঃশূদ্র গোষ্ঠীর যোগেন্দ্র নাথ রায় কুপার্স ক্যাম্পের নারকীয় পরিবেশ বর্ণনা করতে গিয়ে যখন বলেন — ''সবচেয়ে লজ্জার এই যে

মেয়েদের স্নানের জন্য কোথাও আলাদা ব্যবস্থা ছিল না। এ এক বর্বর যুগের খন্ড চিত্র।"[83] অথবা ''যেসব মা-বোনেরাও ওপার বাংলায় কালেভদ্রে মাঠে যেতেন এপারে এসে মাঠে মাঠে গোবর কুড়ানো, কয়লা খোটা, কাঠ কুড়ানোর কাজে নিয়মিত যেতে হয় পেটের তাগিদে।"[84] তখন বোঝা যায় পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারী একটি গোষ্ঠীর পৌরুষদীপ্ত অহংকারের চিহ্নস্বরূপ, দেশ বিভাগ সেই অহংকারকেই বিনষ্ট করেছে। উপনিবেশ বা উত্তর-উপনিবেশের কালে জাতিসত্তার নির্মাণ বা সংকট কোন ক্ষেত্রেই পুরুষতান্ত্রিকতা নারীকে কোন গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিতে চায়নি। পুরুষের দেশভাগের স্মৃতিচারণায় নারী তাই একমাত্রিক ভূমিকায় ধরা পড়েছে। নারী কখনও আক্রমণকারী নয়, আবার প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও নারীর নেই। কিন্তু যখন নারী স্বয়ং দেশভাগ নিয়ে স্মৃতিচারণ করেছেন তখন কিন্তু এই কাঠামোটি ভেঙে গেছে। হিংসা অথবা প্রতিরোধ অথবা আন্দোলন — নারীর বয়ানে নারী সকল ক্ষেত্রেই সক্রিয়। মণিকুন্তলা সেন ১৯৪৬ সালে কলকাতার দাঙ্গার বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন, ''দাঙ্গার কথা আর লিখব না। ওই কলঙ্কের বিবরণ দেওয়া যায় না। কিন্তু আমার একটা ধারণা ছিল মেয়েরা এর মধ্যে নেই। তারা এই হিংস্রতা বোধ হয় সহ্য করতে পারে না। কিন্তু বালিগঞ্জ পাড়া আমার এ ধারণা পাল্টে দিয়েছিল... বাড়িগুলোর উপর তলা থেকে মহিলারা রাস্তায় দাঁড়ানো পুরুষদের হাতে লাঠি ফেলে দিচ্ছে। কি ব্যাপার? না মুসলমান আসছে। খোঁজ নিয়ে জানা যেত মুসলিম পাড়াতেও চিত্রটা হয়তো একই। পাশবিক বৃত্তিটা জাগিয়ে দিতে পারলে এ রকমই ঘটে বোধ হয়।"[85] মনুষ্যত্বের অবমাননার দিনে হিংস্রতা যেমন নারীকেও গ্রাস করেছে তেমনি ভাঙ্গনের সময়ে পুরুষের সাথে নারী প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে সক্রিয় সহযোগিতায়, কোন কোন সময়ে একক চেষ্টায়। নীলিমা দত্ত স্মৃতিচারণায় জানিয়েছেন দেশভাগের পর এদেশে উদ্বাস্তু হয়ে এসে জবরদখল জমিতে বাড়ি তৈরি করে বেঁচে থাকার দিনগুলিতে শাশুড়ি আর তিনি নিজে পরিবারকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে কিভাবে অন্যতম প্রয়োজনীয় শক্তি হয়ে উঠেছিলেন। তিনি লিখেছেন, ''আমার শাশুড়ি ঠাকরুণের মধ্যে এক আশ্চর্য সংগ্রামী মানসিকতা ছিল। অবাক হয়ে ভাবতাম, জমিদারকন্যা হয়েও কোথা থেকে পেলেন এই সাহসী, সংগ্রামী মন।"[86] নীলিমা দত্তর শাশুড়ি বাড়ি তৈরীর কাজে মজুরের মত কায়িক শ্রমও স্বীকার করেছিলেন। অন্যদিকে নীলিমা দত্ত স্বামীর প্রচেষ্টায় কলোনিতে গড়ে ওঠা স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন, মেয়েদের বড় করার

সঙ্গে সঙ্গে পড়াশোনাকে এগিয়ে নিয়ে যান। এই ভাবেই পশ্চিমবাংলায় উদ্বাস্তু মেয়েদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব জাগরণ ঘটে যায়। স্বাধীনতার পূর্বে অন্তঃপুরের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে পূর্ববঙ্গে মেয়েদের শিক্ষার অবস্থা কেমন ছিল সে বিষয়ে একটি চিত্র পাওয়া যায় মণিকুন্তলা সেন এর আত্মকথায়, ''হায় আমার দেশ! বরিশাল শহর থেকে একরাত্রির নৌকাপথ। বর্ধিষ্ণু গ্রাম বানরীপাড়া। স্কুল আছে এ গ্রামে, ছেলেরা পড়ে। তাইতো আমাদের আসা। আর সেখানে মেয়েদের এই অবস্থা? যারা এদেরও অনেক তলায়, তারা না জানি আরো কত তলায়!''[87] পশ্চিমবঙ্গের উচ্চবর্ণের পুরুষের স্মৃতিতে পূর্ববঙ্গের গ্রামের যে রোমান্টিক নির্মাণ, সেখানে স্বভাবতই নারীশিক্ষার এই দুরবস্থার কোন প্রসঙ্গ তোলা হয়নি। দেশভাগের পরে সমাজ জীবনে নারী কেন্দ্রিক যে নবজাগরণ ঘটেছে, তাও এদের স্মৃতিতে কোন প্রধান স্থান গ্রহণ করতে পারেনি। মণিকুন্তলা সেন লিখেছেন — ''দেশে থাকলে বোধ হয় এত দ্রুত ও সহজে এরা জীবনের হাল ধরে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারত না। শুধু নিজের জীবনের কেন — ওই সব মেয়েরা শক্ত হাতে পরিবারের হাল পর্যন্ত ধরেছে। পূর্ববঙ্গের এইসব মেয়েরা শিক্ষিকা, নার্স, কেরানি কোন কাজে নেই?''[88] পরিবারের দায়িত্ব নিয়ে কিভাবে মেয়েরা কর্মজগতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তার উল্লেখ পাই ছবি দাস অথবা কবিতা রায়চৌধুরীর স্মৃতিচারণাতে। কবিতা রায় চৌধুরী লিখেছেন — ''মেয়েরা সব চাকরি করতে যেত তো। ওই টিফিনবাক্সে ভাত নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেত। ... আমিও করেছি।''[89] উদ্বাস্তু রাজনীতিতেও মেয়েরা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল তার উল্লেখ পাই ছবি দাসের স্মৃতিচারণায় — ''মিটিং-মিছিল খুব করতাম। ... মিটিংয়ে বাইরাতাম। ছবি দি যাবা? কইলেই যাইতাম।''[90] কলোনী স্থাপনের পর জমিমালিক ও পুলিশের সঙ্গে লড়াইতে মহিলারাই ছিলেন অগ্রণী। একটি স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় — ''... ছোট ঘর তৈরি করে দখলদারি রাখার জন্য একজন অন্তত স্ত্রীলোক নিয়ে, তা তিনি উপস্থিত কোনও পুরুষের মা, স্ত্রী বা বোন কি দিদি যে-ই হোন, থাকতে হয়েছে, রাতপাহারা দিতে হয়েছে। পুরুষের সঙ্গে একজন অন্তত স্ত্রীলোককে থাকতে হয়েছে পুলিশের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য, যা তখন গড়ে উঠতে থাকা সব কটা কলোনিতেই করতে হত।''[91] জয়া চ্যাটার্জী এই সামাজিক বিবর্তন সম্পর্কে লিখেছেন — "... many more refugee girls were now receiving an education. They were throne into a job market-where they completed with

some success for sought-after 'respectable' jobs such as Clerks, tailors and school teachers,"[92] এবং এই ভাবেই — "the status and influence of women under went changes.[93]

নারীর বিশ্বাসে ও সত্তার বোধে এবং ইতিহাস চেতনায় এক সমন্বয়বাদ মূর্ত হয়ে উঠেছে। মিহির সেনগুপ্ত প্রমুখদের লেখায় পূর্ব বাংলার গ্রামের স্মৃতিতে মেয়েদের ব্রত পূজা পার্বণ ও সেই উপলক্ষে তাদের প্রস্তুত করা বিভিন্ন খাদ্যের প্রসঙ্গ একাধিকবার ঘুরে ঘুরে এসেছে। কিন্তু মেয়েদের স্মৃতি কথায় দেখা যায়, তাঁরা সচেতনভাবে ধর্ম ও অন্তপুরের ঘেরাটোপকে ভাঙতে চেয়েছেন। সেই কারণেই তাঁদের মধ্যে অনেকেই বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন ধর্মীয় কারণে অথবা জাত বিভাজনের কারণে নিষিদ্ধ ঘরে নিষিদ্ধ খাবার গ্রহণ করার ঘটনার কথা। ছবি দাসের পরিবার দাঙ্গায় আক্রান্ত হয়ে আকস্মিকভাবে গ্রাম ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু এর পরেই তিনি কিন্তু জানাতে ভোলেননি — ''যত মুসলমানের বাড়িতে ভাল রান্না হত বলতাম আমি খাব। খাইলে বাবা ঠাকুমা গোবর জলে স্নান করাবে। বলতাম করাও আমি খাব।"[94] সুনন্দা শিকদার লিখেছেন সত্তার গভীরে তিনি একাত্ম অনুভব করেন পূর্ববঙ্গে তাঁর মুসলমান দাদার সঙ্গে। তিনি লিখেছেন — ''তবুও সমস্ত কিছুর মধ্যেই এক অনিবার্য উত্তরাধিকার আমি বহন করে চলেছি। আসলে যতই অস্বীকার করতে চেয়েছি আমার দাদাকে আমি, ততই আমাকে অদৃশ্য বাঁধনে শক্ত করে বেঁধেছে।"[95] সম্পর্কের নিবিড়তার দীর্ঘ আবেগময় বর্ণনা যখন পাঠকের মনে কৌতূহল তৈরি করে, তখন সুনন্দা খুব স্বাভাবিকভাবেই জানান — ''আর আমার দাদার বাউন্ডুলেপনাও পেয়েছি আমি। আমার কিছুই থাকেনা সবই হারিয়ে যায়। আর মাজম শেখ এক চাষী যার কিনা এক ছিটে জমি নেই, হালের গরু আর জোয়াল সম্বল, সে কত বড় বাউন্ডুলে হলে গরু বেচে হিন্দুস্থানে আসে শুধু স্নেহের টানে।"[96] পুরুষের লেখায় নিম্নবর্ণের মানুষের কথা আছে কিন্তু সেই বর্ণনা নৈর্ব্যক্তিক। কিন্তু সুনন্দার লেখায় মুসলমান চাষীটির সঙ্গে আত্মার সম্পৃক্ততা — তাই মাজম শেখ তাঁর শিকড়ের প্রতীক। তাঁর ফেলে আসা গ্রামে মুসলমান কাকা, নিম্নবর্ণের দিদি, বৌদিদের সমাহার — যাঁরা তাঁর নিজের, যাঁদের মধ্যে তাঁর অস্তিত্বের পূর্ণতা। মিহির সেনগুপ্তর মত তাঁর লেখায় সাতচল্লিশের পরবর্তী সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার বিশ্লেষণও নেই আবার সংখ্যালঘুর তীব্র অভিমানও নেই। মিহিরের লেখায় যেখানে বিষাদ ও শূন্যতা, সেখানে সুনন্দার স্মৃতিতে ধরা

পড়েছে পরিপূর্ণতার ছবি। মনে রাখা দরকার 'ছেড়ে আসা গ্রাম'-এ যে সমৃদ্ধ গ্রামের ছবি সৃজনের চেষ্টা ছিল, তার থেকে সুনন্দার অনুভূতির দূরত্ব অনেকখানি। সুনন্দা সাম্প্রদায়িকতাকে ভাঙতে চেয়েছেন, তাই উচ্চবর্ণের হিন্দু সংস্কৃতির সমৃদ্ধ গ্রাম তাঁর স্মৃতিকে উদ্বেল করেনি। এমন ভাবা যেতেই পারে সেই সময়ে তিনি নেহাতই বালিকা ছিলেন বলেই সমসাময়িক জটিলতাকে বুঝতে পারেননি। কিন্তু পরিণত বয়সে স্মৃতিচারণের সময়ও তিনি সেই বালিকার দৃষ্টিকোণকেই ধরে রেখেছেন। তাই স্মৃতির মাঝে পরিণত মানুষের মন্তব্য বা বিশ্লেষণের অনুপ্রবেশ ঘটে নি তাঁর লেখায় — যে বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাঁর বিশিষ্ট রাজনৈতিক অবস্থানটি নির্ণীত হয়ে যেতে পারত। আসলে এ বিষয়ে তিনি আগ্রহী ছিলেন না। তাঁর যন্ত্রণা অনুভবের পরিপূর্ণ সত্তাকে চেপে রেখে খণ্ডিত সত্তাকে বয়ে বেড়ানোর জন্য। তিনি লিখেছেন — ''কোথায় ছিল অসংস্কৃত কণ্ঠে সোনা জারি-সারি ভাওয়াইয়া গান, কোথায় ছিল ফজরের নামাজের সেই বেদনাময় সংগীত, লা ইলাহি ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ। মনের কোন গহীনে এসব লুকিয়ে রেখেছিলাম। আর এই গোপন শৈশব জীবন গভীরে লুকিয়ে থেকে আমাকে করে তুলেছে এক ময়ূরপুচ্ছধারী কাক।''[97] এইভাবে আত্মসত্তা নির্মাণের রাজনীতি সুনন্দার অনুভবে আত্মখন্ডনের নামান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছে। আত্মখন্ডনের যন্ত্রণাকে তিনি এবং তাঁর পালিকা মা ভুলে থাকতে চেয়েছেন — ''মা আর আমার মধ্যে চিরকাল দেশের প্রসঙ্গ অনুচ্চারিত ছিল।''[98] এই ভাবেই সুনন্দার বিবৃতির গভীরে স্মৃতি ও সত্তার যন্ত্রণা মিশে গিয়েছিল।

সুতরাং দেশভাগকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের 'স্মৃতি'র আলোচনা থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে — দেশ ভাগের তাৎপর্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর কাছে বিভিন্ন। প্রান্তীয় স্বর ক্ষমতায়নের আকাঙ্ক্ষায় উচ্চবর্গীয় গোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় আখ্যানকে ভেঙে দিতে চেয়েছে। সবটুকু মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের দেশভাগকেন্দ্রিক স্মৃতির বয়ান ক্যালিডোস্কপিক নকশার মতই চিত্তাকর্ষক। সুতরাং দেশভাগকে বুঝতে হ'লে তার বহুমাত্রিক দিকটি নিয়ে আলোচনা অতি আবশ্যক হয়ে ওঠে।

তথ্যসূত্র

1. দীপেশ চক্রবর্তী, ''বাস্তুহারার স্মৃতি ও সংস্কার : ছেড়ে আসা গ্রাম'', *দেশভাগ স্মৃতি আর*

স্তব্ধতা, সম্পা-সেমন্তী ঘোষ, গাঙচিল, কলকাতা, ২০০৯, পৃ-১৬২

2. অন্নদাশঙ্কর রায়, *যুক্তবঙ্গের স্মৃতি ও মুক্তবঙ্গের স্মৃতি*, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৪২১, পৃ-১৬

3. তদেব, পৃ-৩২

4. তদেব, পৃ-৩২

5. তদেব, পৃ-৩২

6. তদেব, পৃ-৩৪

7. তদেব, পৃ-১৭৬

8. তদেব, পৃ-৫৩

9. তদেব, পৃ-৫৩

10. তদেব, পৃ-৬২

11. তদেব, পৃ-৬৪

12. তদেব, পৃ-১২৩

13. মিহির সেনগুপ্ত, ''বিষাদবৃক্ষ'', *উজানি খালের সোঁতা*, আনন্দ, কলকাতা, ২০০৭, পৃ-২৯৯

14. তদেব, পৃ-২৭২

15. তদেব, পৃ-২৭২

16. তদেব, পৃ-২২৭

17. তদেব, পৃ-২২৪

18. তদেব, পৃ-২২৪

19. তদেব, পৃ-২৮৭

20. তদেব, পৃ-২৮০

21. তদেব, পৃ-২৮০

22. তদেব, পৃ-৩৩৯

23. গোপালচন্দ্র মৌলিক, *দেশভাগ ও ননীপিসিমার কথা*, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১১, পৃ-১৬

24. তদেব, পৃ-২১

25. তদেব, পৃ-২৩

26. তদেব, পৃ-৫৯

27. তদেব, পৃ-৬১

28. তদেব, পৃ-৬১

29. তদেব, পৃ-৬৯

30. Bandyopadhyay, Sekhar, *Decolonization in South Asia,* Orient Blackswan, Hyderabad, 2012, p-34

31. মিহির সেনগুপ্ত, ''বিষাদবৃক্ষ'', *উজানিখালে সোঁতা*, আনন্দ, কলকাতা, ২০০৭, পৃ-২৬২

32. তদেব, পৃ-১৪৮

33. গোপালচন্দ্র মৌলিক, *দেশভাগ ও ননীপিসিমার কথা*, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১১, পৃ-৬০

34. তপন রায়চৌধুরী, *রোমন্থন অথবা ভীমরতিপ্রাপ্তর পরিচরিতচর্চা*, আনন্দ, কলকাতা, ২০১৪, পৃ-২৮

35. তপন রায়চৌধুরী, *বাঙালনামা*, আনন্দ, কলকাতা, ২০১০, পৃ-৪৪

36. তপন রায়চৌধুরী, *রোমন্থন অথবা ভীমরতিপ্রাপ্তর পরচরিতচর্চা*, আনন্দ, কলকাতা, ২০১৪, পৃ-২২

37. তপন রায়চৌধুরী, *বাঙালনামা,* আনন্দ, কলকাতা, ২০১০, পৃ-২৮

38. তদেব, পৃ-৩৫৮

39. তদেব, পৃ-১৪৩

40. তদেব, পৃ-১৪২

41. তপন রায়চৌধুরী, *রোমন্থন অথবা ভীমরতিরপ্রাপ্তর পরচরিতচর্চা,* আনন্দ, কলকাতা, ২০১৪, পৃ-৭৬

42. তদেব, পৃ-৭৭

43. তদেব, পৃ-৭৮

44. তপন রায়চৌধুরী, ''দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন'', *বাঙালনামা,* আনন্দ, কলকাতা, ২০১০, পৃ-১

45. Bandyopadhyay, Sekhar, *Decolonization in South Asia,* Orient Blackswan, Hyderabad, 2012, p-23

46. জাগরী বন্দ্যোপাধ্যায়, ''মেয়েলি জীবন, ভাগাভাগির পরের যুগ'', *দেশভাগ স্মৃতি আর স্তব্ধতা,* সম্পা- সেমন্তী ঘোষ, গাঙচিল, কলকাতা, ২০০৮, পৃ-১০৯

47. তপন রায়চৌধুরী, *রোমন্থন অথবা ভীমরতিপ্রাপ্তর পরচরিতচর্চা,* আনন্দ, কলকাতা, ২০১৪, পৃ-৬১

48. তদেব, পৃ-৬১

49. অশোক মিত্র, *আপিলা-চাপিলা,* আনন্দ, কলকাতা, ২০১৫, পৃ-১৬

50. তদেব, পৃ-১৬

51. তদেব, পৃ-২৩

52. তদেব, পৃ-২৩

53. তদেব, পৃ-২৫

54. স্মৃতিরঞ্জন মৃধা, ''তারকাঁটার বেড়া'', *বর্ডার বাংলাভাগের দেওয়াল,* সম্পা-অধীর বিশ্বাস, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১৬, পৃ-৭২

55. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ''প্রাঞ্জলতা'', *পঞ্চভূত, রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বিতীয়খণ্ড*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯৬৬, পৃ-৬১০

56. স্মৃতিরঞ্জন মৃধা, ''তারকাঁটার বেড়া'', *বর্ডার বাংলাভাগের দেওয়ার,* সম্পা-অধীর বিশ্বাস, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১৬, পৃ-৭৯

57. তদেব, পৃ-৮০

58. Bandyopadhyay, Sekhar, *Caste Culture and Hegemony,* Sage Publications, New Delhi, 2004, p-233

59. Chatterjee Joya, "Right or Charity", *The Partitions of Memory,* Edt-Suvir Kaul, Permanent Black, New Delhi, 2001, p-84

60. Chatterjee, Joya, *The Spoils of Partition,* Cambridge University Press, New Delhi, 2007, p-137

61. গণেশ হালুই, ''মৃত্যুর মিছিল, জীবনের জাগরণ'', *দেশভাগ বিনাশ ও বিনির্মাণ,* সম্পা-মধুময় পাল, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১১, পৃ-১১৮

62. তদেব, পৃ-১১৮

63. তদেব, পৃ-১১৮

64. তদেব, পৃ-১১৯

65. তদেব, পৃ-১২২

66. তদেব, পৃ-১১৮

67. মনোরঞ্জন ব্যাপারী, ''অনন্ত রাত্রির চণ্ডাল'', *দেশভাগ বিনাশ ও বিনির্মাণ*, সম্পা-মধুময় পাল, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১১, পৃ-২১১

68. তদেব, পৃ-২১২

69. তদেব, পৃ-২০৯

70. তদেব, পৃ-২১৩

71. তদেব, পৃ-২১০

72. তদেব, পৃ-২০৯

73. মনোরঞ্জন ব্যাপারী, *ইতিবৃত্ত চণ্ডাল জীবন*, দে পাবলিকেশন্‌স্, কলকাতা, ১৪২৬, পৃ-৩২

74. তদেব, পৃ-৩১

75. মনোরঞ্জন ব্যাপারী, ''অনন্ত রাত্রির চণ্ডাল'', *দেশভাগ বিনাশ ও বিনির্মাণ*, সম্পা-মধুময় পাল, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১১, পৃ-২১৯

76. তদেব, পৃ-২৩১

77. তদেব, পৃ-২৩৩

78. তদেব, পৃ-২০৭

79. Bandyopadhyay, Sekhar, *Caste Culture and Hegemony,* Sage Publications, New Delhi, 2004, p-234

80. যতীনবালা, ''যশোরের স্মৃতি ও উদ্বাস্তু ক্যাম্পের জীবন'', *পার্টিশন সাহিত্য দেশ-কাল-স্মৃতি*, সম্পা-মননকুমার মণ্ডল, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১৪, পৃ-২৫৭

81. তদেব, পৃ-২৫৭

82. তদেব, পৃ-২৬১

83. যোগেন্দ্রনাথ রায়, ''কুপার্স ক্যাম্পে ছেলেবেলা'', *দেশভাগ বিনাশ ও বিনির্মাণ*, সম্পা-মধুময় পাল মননকুমার মণ্ডল, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১৪, পৃ-১৫৫

84. তদেব, পৃ-১৬১

85. মণিকুন্তলা সেন, *সেদিনের কথা*, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৩, পৃ-১৭৪-১৭৫

86. নীলিমা দত্ত, *উজান স্রোতে*, মাইন্ডস্কেপ, কলকাতা, ২০০৭, পৃ-৮৪-৮৫

87. মণিকুন্তলা সেন, *সেদিনের কথা*, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৩, পৃ-৪৮-৪৯

88. তদেব, পৃ-১৮৩

89. জাগরী বন্দ্যোপাধ্যায়, ''মেয়েলি জীবন, ভাগাভাগির পরের যুগ'', *দেশভাগ স্মৃতি আর স্তব্ধতা*, সম্পা-সেমন্তী ঘোষ, গাঙচিল, কলকাতা, ২০০৯, পৃ-১০৬

90. তদেব, পৃ-৯৭

91. আরতি সেনগুপ্ত রবীন্দ্রকুমার দেব, ''পুলিশ হামলা করত খুব'', *গাঙচিল পত্রিকা, সূচনা সংখ্যা, বিষয়:-শরণার্থী*, কলকাতা, ২০০৭, পৃ-১৬৮

92. Chatterjee Joya, *The Spoils of Partitions,* Cambridge University Press, New Delhi, 2007, p-146

93. Ibid, p-153

94. জাগরী বন্দ্যোপাধ্যায়, ''মেয়েলি জীবন, ভাগাভাগির পরের যুগ'', *দেশভাগ স্মৃতি আর স্তব্ধতা*, সম্পা- সেমন্তী ঘোষ, গাঙচিল, কলকাতা, ২০০৯, পৃ-৯৭

95. সুনন্দা সিকদার, *দয়াময়ীর কথা*, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১০, পৃ-১১

96. তদেব, পৃ-১১

97. তদেব, পৃ-৪২

98. তদেব, পৃ-১৩৫

আত্মসচেতন আত্মনির্মাণের স্মৃতি

দেশ বিভাগজনিত অভিজ্ঞতা পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব বাংলার মানুষের এক রকম নয়। সাতচল্লিশের দেশ বিভাগ অধুনা বাংলাদেশীয় মুসলমানদের কাছে হিন্দু আধিপত্য ও ব্রিটিশ রাজ থেকে মুক্তির ক্ষণ। আবার ১৯৭১ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে বাঙালি হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠার লগ্ন। একটি জনগোষ্ঠীর বারংবার জাতিসত্তা বিনাশ ও বিনির্মাণ আমাদের এই সত্যে উপনীত করে যে সত্তার কোন একক আধিপত্য বা পরিচিতি নেই। বিশেষ কোন ঐতিহাসিক কারণে কোন এক বিশেষ গোষ্ঠীপরিচয় প্রতিষ্ঠার দাবি উচ্চকিত হয়ে ওঠে এবং এই ভাবেই সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রভাবে তৈরি হয় এক কাল্পনিক জাতিসত্তার। নির্মিত প্রতিটি জাতি বা গোষ্ঠীই কাল্পনিক; কারণ "the members even the smallest nation will never know most of their fellow members, meet them, or even hear of them, yet in the minds of each lives the image of their communion."[1] আজকের জ্ঞানমার্গ অনুযায়ী যেকোন জাতি-পরিচয় কাল্পনিক এবং অবশ্যই রাজনৈতিক। সুতরাং রাজনৈতিক প্রয়োজন পরিবর্তিত হলে জাতিসত্তার পরিবর্তনও ঘটে স্বাভাবিক নিয়মে। যেমন অধুনা বাংলাদেশের মানুষ এক সুদীর্ঘ সময় ধরে পৃথক পৃথক রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে জাতি-সত্তার বিভিন্ন অস্তিত্ব আবিষ্কার করতে চেয়েছে এবং এই ভাবেই সেখানে সংগঠিত হয়েছে জাতিসত্তা-পরিচয় ভাঙা-গড়ার এক স্বতন্ত্র রাজনীতি।

উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের শুরু — এই সময় থেকেই নবসৃষ্ট বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণি ক্রমশ হিন্দু 'ভদ্রলোক' গোষ্ঠীর প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠছিল এবং সেই প্রেক্ষিতে সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্তরে ক্ষমতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষাকে পরিপূর্ণতা দানের জন্য ধর্মীয় পরিচয়ের রাজনীতিকরণ প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। সাংবাদিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আবুল মনসুর আহমদের লেখাতেই পাই — ''বাংলার জমিদার হিন্দু প্রজা মুসলমান, বাংলার মহাজন হিন্দু খাতক মুসলমান, ডাক্তার হিন্দু রোগী মুসলমান, হাকিম হিন্দু আসামি মুসলমান।"[2] সুতরাং প্রান্ত থেকে কেন্দ্রে আসার সুতীব্র তাগিদ থেকেই সংহত হয়েছিল মুসলিম

আত্মপরিচয়ের রাজনীতি। মুসলিম নিম্নবর্গীয়দের — মূলত কৃষকদের হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এই রাজনীতির প্রাথমিক প্রকাশ ঘটলেও ক্রমশঃ নবজাগ্রত মুসলমান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি সেই অর্থনৈতিক আন্দোলনকে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের আন্দোলনে পরিণত করেন এবং হয়ে ওঠেন সেই আন্দোলনের মূল মেরুদণ্ড।

আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সমর্থক আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন — ''জানিলাম, আমাদের মুরুব্বিদের 'তুমি' বলা ও কাছারিতে বসিতে না দেওয়ার কারণ একটাই। নায়েব আমলারা মুসলমানদের ঘৃণা হেকারত করেন। ভদ্রলোক মনে করেন না।''[3] মনসুর সাহেবের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় যে বিষয়টি প্রধান হয়ে উঠেছে সেটি হল 'ভদ্রলোক' হিসাবে স্বীকৃতি না পাওয়ার অবমাননা বোধ। এই অবমাননা বোধ থেকেই মুসলমান মধ্যবিত্তের স্মৃতিচারণায় বারংবার উঠে এসেছে হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামি ও ছোঁয়াছুয়ির বিচারের কথা। জমিদার পরিবারের সন্তান মুজিবুর রহমানও একথা বলেছেন। তাঁর গ্রামের হিন্দুরা তাঁর পরিবারকে যথেষ্ট সম্মান করতো। কিন্তু তবুও তিনি ভুলতে পারেননি বাল্যকালে হিন্দু বন্ধুর বাড়ি গিয়ে তাঁর অশুচি স্পর্শ দোষের কারণে ঘর পরিষ্কার করা হয়েছিল। তিনি লিখেছেন — ''এই ধরণের ব্যবহারের জন্য জাত ক্রোধ সৃষ্টি হয়েছিল বাঙালি মুসলমান যুবকদের ও ছাত্রদের।''[4] লেখক আবু রুশ্‌দ্‌ও তাঁর আত্মকথাতে উল্লেখ করেছেন ছাত্রাবস্থায় মুসলমান হওয়ার কারণে হিন্দু শুচিবায়ুগ্রস্ত বিধবা মহিলার দ্বারা অপমানিত হওয়ার ঘটনার কথা। এই তিন জনেই ছিলেন পাকিস্তান আন্দোলনের সমর্থক।

মুসলিম আত্মপরিচয়কে সুসংহত করতে ভারতের বুকে মুসলমান রাজত্বের সুমহান অতীত-ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে চেয়েছিলেন তাঁরা। মুজিবুরের আত্মকথাতে আছে — ''শত শত বৎসর মুসলমানরা দিল্লি থেকে সমস্ত ভারতবর্ষের শাসন করেছে। তখন কি জানতাম, এই দিল্লির পর আমাদের কোন অধিকার থাকবে না। দিল্লির লালকেল্লা, কুতুবমিনার, জামে মসজিদ আজও অনন্য মুসলিম শিল্পের নিদর্শন ঘোষণা করছে।''[5] আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন — ''মাত্র দেড়শ বছর আগে দীর্ঘ সাড়ে ৬০০ বছর ধরিয়া এরা গোটা উপমহাদেশে সগৌরবে প্রবল প্রতাপে শাসন করিয়াছে, বিদেশি দখলকারী শক্তি হিসেবে নয় দেশবাসী হিসাবে।''[6] উনিশ

শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হিন্দুত্ব পুনরুভ্যুত্থানের সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখরা যেমন ভারতীয়ত্ব ও হিন্দুত্বকে সমার্থক ধরে নিয়ে হিন্দু ভারতের অতীত ইতিহাস অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছিলেন, বিশ শতকের প্রথমেও তেমনই এক সাদৃশ্যযুক্ত অথচ প্রতিস্পর্ধী প্রচেষ্টা। দুইজন রাজনীতিবিদ্‌ই ভারতীয়ত্বের সঙ্গে মুসলমান পরিচয়কে সংযুক্ত করতে চেয়েছেন অতীত ইতিহাসের সময় থেকেই। তথাপি তাঁরা 'পাকিস্তান আন্দোলন'-এর একনিষ্ঠ সমর্থক। তার থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে প্রাথমিক পর্যায়ে রাজনৈতিক আত্মপরিচয় নিয়ে তাঁদের চিন্তা-চেতনায় এক প্রকার দ্বন্দ্ব ছিল। ভারতীয়ত্ববোধ ও পাকিস্তান-আন্দোলনের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব ধরা পড়ে মুজিবুর রহমানের স্মৃতিচারণাতে — ''এই সময় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ হিন্দু ফৌজ গঠন করে ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমান সৈন্যদের দলে নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছেন। মাঝে মাঝে সিঙ্গাপুর থেকে সুভাষবাবুর বক্তৃতা শুনে চঞ্চল হয়ে উঠতাম। মনে হতো সুভাষবাবু একবার বাংলাদেশে আসতে পারলে ইংরেজকে তাড়ানো সহজ হবে। আবার মনে হতো সুভাষবাবু আসলে তো পাকিস্তান হবে না। পাকিস্তান না হলে দশকোটি মুসলমানের কি হবে? আবার মনে হতো যে নেতা দেশত্যাগ করে দেশের স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে পারেন তিনি কোনদিন সাম্প্রদায়িক হতে পারেন না।''[7] আবার প্রাগাধুনিক ধর্মীয় গোষ্ঠী পরিচয় ও আধুনিক জাতি পরিচয় নিয়েও একটা দ্বিধা যে মুসলিম জনমনে ছিল, তা বোঝা যায় মুসলমানদের 'নিজ দেশ' প্রাপ্তি আন্দোলনের প্রবল সমর্থক আবুল মনসুর আহমদের স্মৃতিচারণা থেকে — ''ভারতের মুসলমানরা এই যুগে ছিল কার্যত একটা দেশহীন ধর্ম সম্প্রদায় মাত্র।''[8] মনসুর সাহেব যেমন তাঁর পূর্বে উল্লিখিত বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন এই বক্তব্যে অর্থাৎ ভারতীয়ত্ববোধকে নাকচ করতে চেয়েছেন, তেমনই দেশহীন প্যান ইসলামিক ভ্রাতৃত্ববোধের ভাবনাও যে তাঁর চিন্তায় ক্রিয়াশীল ছিল, তার ইঙ্গিতও এখানে আছে। তাঁর অপর একটি বক্তব্যে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে। ভারতের মুসলমান রাজত্বকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে — ''এটা করিয়াছে তারা বিপ্লবাত্মক সাম্যভিত্তিক মানবাধিকারে নয়া জীবন বাণীর পতাকাবাহী এক নবজাগ্রত বিশ্ব মুসলিমের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে।''[9] এইভাবে অবস্থা বৈগুণ্যে ভারতীয় তথা বাঙালি মুসলমানদের কাছে 'দেশ' এর ধারণা ক্রমশঃ জটিল হয়ে উঠেছিল দেশবিভাজনের কিছু পূর্ব থেকেই।

পূর্ববঙ্গীয় মধ্যবিত্ত মুসলমানদের অনেকের কাছে দেশভাগ ছিল রাজনৈতিক কারণে কাঙ্খিত। কারণ ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের উনিশ শতকীয় সমসত্ত্ব ভারতীয়ত্বের ধারণার পিছনে তাঁরা হিন্দুধর্মের আগ্রাসনকে ক্রিয়াশীল দেখেছিলেন। মনসুর আহমদ লিখেছেন — ''তাঁরা বুঝিতেন মাইনরিটি মুসলমান সমাজ বিপুল বেগবান হিন্দু সম্প্রদায়ে 'হইবে লীন'।''[10] উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের স্মৃতিচারণায় দেশভাগ যেন আকস্মিক কোন ঘটনা অথবা রাজনৈতিক নেতাদের ষড়যন্ত্র, তাঁদের বয়ান অনুযায়ী দ্বিজাতিতত্ত্ব উত্থাপন ও দাঙ্গা শুরু হওয়ার পূর্বে দুই গোষ্ঠীর কোন সমস্যাই ছিল না। কিন্তু মনসুর সাহেব লিখেছেন — ''কিন্তু কোনও অবস্থাতেই হিন্দু-মুসলমানে সামাজিক ঐক্য হয় নাই।''[11] সুতরাং দেশভাগ হিন্দু-মুসলমানের আকস্মিক সংঘর্ষজনিত কারণে ঘটেছে, এমনটি তিনি বলতে চাননি। পরন্তু মনসুর সাহেব মনে করেছেন — ''সত্য কথা এই যে, দুই জাতি ঐক্যবদ্ধ হইয়াই আপোসে দুই রাষ্ট্র সৃষ্ট করিয়াছে।''[12] এপার বাংলার অভিজ্ঞতায় দেশভাগের জন্য সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশশক্তি দায়ী। এমনকি আধিপত্যবাদী ইতিহাসের বয়ানেও দায়ী করা হয়েছে বৃটিশের ভেদশক্তিকে। কিন্তু মনসুর সাহেবের অভিজ্ঞতায় ধরা পড়েছে সম্পূর্ণ বিপরীত বয়ান — ''বিজেতা কোনও বিদেশী শক্তিও দেশ দুই টুকরা করে নাই। জার্মান, পোলান্ড, তুরস্ক, কোরিয়া, ভিয়েতনাম ইত্যাদি বহুদেশকে আমরা দুই টুকরা হইতে দেখিয়াছি। কিন্তু ও-সবই করিয়াছে বিজয়ী বিদেশীরা। আমাদের দেশ ভাগ করিয়াছেন স্বয়ং আমাদের নেতারা, আলোচনার টেবিলে বসিয়া, একই রেডিওতে তা ঘোষণা করিয়া।''[13]

এপারে যখন বিষাদ, ক্রোধ, সংগ্রাম, ওপারে তখন দেশগঠনের আকাঙ্খা, উৎসাহ ও সমস্যার স্মৃতি। মনসুর আহমদ লিখেছেন — ''শাসনতন্ত্র, অর্থনীতি, শান্তি রক্ষা ও দেশ রক্ষা সব দিক হইতেই পাকিস্তানকে গড়িতে হইতেছিল একদম অ আ ক খ হইতে।''[14] লেখক আবুল হোসেনের স্মৃতিলেখায় পাই — ''ঢাকার মতো একটা পুরনো জেলা শহরকে রাজধানী হিসেবে গড়ে তুলতে এবং কাজ চালানোর মতো একটা প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু করতে হিমশিম খেতে হচ্ছিল তাকে। ... মেয়েদের ইডেন কলেজ ও হোস্টেলবাড়িতে বসল প্রাদেশিক সরকারের সেক্রেটারিয়েট, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে হলো হাইকোর্ট।''[15] সমাজতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন নেতা বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিতে আবার ধরা পড়েছে অন্য এক প্রতিজ্ঞা ও বিঘ্নের কথা — ''ডা. মালেক

বলেছিলেন, প্রথম কাজ হবে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করা। ফল হল উল্টো, তিনজন এমএলএ ছাড়া সকলেই ছিলেন সিলেটের জমিদার।"[16] বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিকথায় সত্তা-পরিচিতির দিকপরিবর্তনের ইঙ্গিত এরপর স্পষ্ট — ''পাকিস্তানের রাজনীতি শুরু হল ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে।"[17]

পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে দেশভাগ একটি দুর্ঘটনা, তাদের স্মৃতিচারণা বেদনাময়, কিন্তু পূর্ববাংলার মানুষের স্মৃতিতে দেশভাগের প্রতিক্রিয়া পৃথক ধরণের। পাকিস্তান আন্দোলনের সমর্থনকারী যাঁরা, দেশভাগের অব্যবহিত পরেই তাঁদের প্রতিক্রিয়া ছিল নিজেদেরকে পাকিস্তানী হিসেবে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতের দ্বারা প্রবঞ্চিত ভাবা। আবুল মনসুর আহমদ স্পষ্টতই বলেছেন — ''পার্টিশনে পাকিস্তানের উপর অবিচার করা হইয়াছে।"[18] এই অবিচারের অভিযোগ বাস্তুচ্যুত হওয়ার কারণে নয়, ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে 'অবিচার'-এর অভিযোগও নয়, তাঁদের বর্ণিত 'অবিচার' জাতীয় ক্ষেত্রে। আবুল মনসুর আহমদ ব্যাখ্যা করে বলেছেন — ''বাঁটোয়ারায় মুসলিম বাংলাকে তার প্রাপ্য মর্যাদা ও ন্যায্য হক হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে।"[19] মুজিবুর রহমানের স্মৃতিতেও ধরা আছে সেই জাতীয় বঞ্চনার ইতিহাস — ''যে কলকাতা পূর্ববাংলার টাকায় গড়ে উঠেছিল সেই কলকাতা আমরা স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিলাম।"[20] লেখক ও সাংবাদিক মনসুর সাহেব ও বঙ্গবন্ধু দুজনের বক্তব্যেই জাতির গঠনের প্রথম ধাপেই আর্থিক সমস্যার কথা ও প্রতিস্পর্ধী শক্তির দ্বারা বঞ্চিত হওয়ার আক্ষেপ ধরা পড়েছে। আবার দুজনের বক্তব্যেই 'পূর্ববাংলা' অথবা 'মুসলিম বাংলার'র গোষ্ঠীগত বেদনার অর্ধস্ফুট স্বরও ধরা পড়েছে — পাকিস্তানী একপেশে বিজয়োল্লাসের পরিবর্তে। অর্থাৎ দেশভাগজনিত বিজয়োল্লাসের স্মৃতি তাঁদের ক্ষেত্রে অবিমিশ্র ছিল না; আবুল মনসুর আহমদর কথায় — ''তবে পাকিস্তান হাসিলের বিজয়োল্লাসের প্রাথমিক উচ্ছ্বাসের মধ্যে উপরের তলার নেতারা কি নিচের তলার কর্মীরা আমরা এসব কথায় তত গুরুত্ব দেই নাই আনন্দে বিঘ্ন হইবে ভয়ে।"[21] সুতরাং দেশবিভাজনের মুহূর্ত থেকে পূর্ববাংলার মানুষের সত্তাপরিচয়ের ক্ষেত্রে এক নতুন দ্বন্দ্বের উন্মেষ ঘটেছিল — স্মৃতিচারণা থেকে একথা স্পষ্ট। কলকাতা হাতছাড়া হওয়ার বঞ্চনার অভিযোগের উদ্দিষ্ট ছিল ভারতের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানও — স্মৃতিলেখাগুলিতে সেকথা সুস্পষ্ট। মনসুর আহমদই বলেছেন — ''বাংলা বিভাগের সময় বাংলার মুসলমানের

স্বার্থের চেয়ে 'গোটা পাকিস্তানের স্বার্থের' দিকে নজর রাখা হইয়াছিল।"[22] 'গোটা পাকিস্তান' অর্থ ছিল কার্যতঃ পশ্চিম পাকিস্তান।

হিন্দুদের বাস্তুত্যাগের সমস্যাকেও তাঁরা রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে চেয়েছেন। হিন্দুদের বাস্তুত্যাগ প্রতিরোধ করার প্রয়োজন ছিল পূর্ববঙ্গের স্বতন্ত্র রাজনীতির স্বার্থে। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন — ''শহীদ সাহেবকে বললাম, ''চলুন স্যার পাকিস্তানে, এখানে থেকে কি করবেন?'' বললেন, ''... চেষ্টা কর, যাতে হিন্দুরা চলে না আসে। ওরা এদিকে এলেই গোলমান করবে, তাতে মুসলমানরা বাধ্য হয়ে পূর্ববাংলায় ছুটবে। ... এত লোকের জায়গাটা তোমরা কোথায় দিবা আমার তো জানা আছে।"[23]

সুতরাং দেশভাগের পর থেকেই পূর্বপাকিস্তানের রাজনীতি পশ্চিম পাকিস্তানের থেকে যে স্বতন্ত্র হয়ে উঠতে চাইছিল স্মৃতিকথায় তা ধরা পড়েছে। বস্তুতঃ প্রান্তীয় অবস্থা থেকে কেন্দ্রে আসার জন্য বাঙালি মধ্যবিত্ত মুসলমান শ্রেণি প্রথমবার অবলম্বন করেছে ধর্মকে, দ্বিতীয়বার স্বাধিকার অর্জনের সংগ্রামে তাঁদের অবলম্বন হয়েছে ভাষা ও সংস্কৃতি। বস্তুত ভাষাকেন্দ্রিক আত্মপরিচয়ের কাছে দায়বদ্ধতা দেশভাগের পূর্ব থেকেই বাঙালি মুসলমান সমাজে ছিল — যদিও সেই সময়ে হিন্দু গোষ্ঠীর থেকে পৃথকীকরণের সমস্যাই প্রাধান্য পেয়েছিল। মুসলমানত্ব ও বাঙালিত্বকে একত্রিত করার বাসনায় প্রাক্-স্বাধীনতা পর্ব থেকেই মুসলমানি বাংলা নির্মাণের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। আবার বাঙালি মুসলমান সমাজেই এই প্রবণতার আতিশয্য নিয়ে শুরু হয়েছিল নানা রকম তর্ক-বিতর্ক। লেখক আবু রুশ্‌দ্ উর্দুভাষী পরিবারের সন্তান হলেও কলকাতায় বাঙালি সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। ভাষা এবং ধর্ম দুটি ব্যাপারই বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের এক অংশের কাছে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শর্ত ছিল। আবুল মনসুর আহমদের স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায় স্কুল জীবনে তিনি হিন্দু ছাত্রদের সরস্বতী পূজার মত মুসলমানদের নিজেদের উৎসব মিলাদ শুরু করেন অনেক প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে। মনসুর সাহেব লিখেছেন — ''যথারীতি মিলাদের পরে আমি এক বাংলা প্রবন্ধ পড়িলাম। তাতে আরবি উর্দু-র বদলে বাংলায় মিলাদ পড়িবার প্রস্তাব দিলাম। মুসলমানদের মুখের অতো তারিফ এক মুহূর্তে নিন্দায় পরিণত হইল। হিন্দুরা কিন্তু আমার তারিফ করিতে লাগিলেন।"[24] সুতরাং পাকিস্তান আন্দোলন বাঙালি

মুসলমানদের আত্মসত্তা অনুসন্ধানের প্রবহমান পদ্ধতির প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। ক্রমশ শিক্ষিত মধ্যবিত্তের আধিপত্যবাদের কারণে এঁদের চেতনায় প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়ায় বাঙালি আত্মপরিচয়ের সন্ধান। এক্ষেত্রে তাঁদের কাছে 'অপর' হয়ে দাঁড়ায় ভিন্নভাষাভাষী পশ্চিম পাকিস্তানের জনগোষ্ঠী। পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রথমবার করাচি গিয়ে অভিজ্ঞতা কিরকম হয়েছিল সে সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কবি আবুল হোসেন জানান — ''আমি যেখানে মানুষ তার প্রকৃতি, মাটি, মাঠ-ঘাট-ঘরবাড়ি, গাছপালা, পশুপাখি, নদী-নালা-মানুষের পোশাক আশাক সম্পূর্ণ আলাদা। এই বালির দেশ, এই রুক্ষতা, বর্ণহীনতা — এই প্রথম দেখলাম; এ যেন এক ভিন্ন দেশ। কিন্তু করাচি তো এখন আমারও দেশ।''[25] মুজিবুর রহমানের লেখায় পাই — ''বালুর দেশের মানুষের মনও বালুর মত উড়ে বেড়ায়। আর পলিমাটির বাংলার মানুষের মন ঐরকমই নরম, ঐরকমই সবুজ।''[26] এই ভাবেই বাঙালি আত্মসত্তার রাজনীতি জাতীয়তাবাদী আবেগের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিতে চেয়েছে একটি ভূখণ্ডের ভৌগোলিক সীমা ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যকেও। এবারের জাতিসত্তা গঠনের ক্ষেত্রে 'অতীতে'র পরিবর্তে প্রাধান্য ছিল 'বর্তমান'-এর, অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে আধুনিক বাঙালির সংস্কৃতি, খাদ্য ইত্যাদি বিষয়। চীনের শান্তি সম্মেলনে গিয়ে মুজিবুর রহমানের মনোভাব তাঁর স্মৃতিচারণায় উঠে এসেছে — ''কেন বাংলায় বক্তৃতা করবো না? ভারত থেকে মনোজ বসু বাংলায় বক্তৃতা করেছেন। ... আমার বক্তৃতার পরে মনোজ বসু ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, ভাই মুজিব আজ আমরা দুই দেশের লোক, কিন্তু আমাদের ভাষাকে ভাগ করতে কেউ পারে না।''[27] এই সম্মেলনে পীর সাহেবের সঙ্গে মুসলমান হোটেলে তিনি খেতে যাননি। মুজিবুর লিখেছেন — ''কয়েকদিন পূর্বে কলকাতা থেকে বিখ্যাত লেখক বাবু মনোজ বসু এবং বিখ্যাত গায়ক ক্ষিতীশ বোস এসেছেন। তারা বাঙালি খানার বন্দোবস্ত করে ফেলেছেন, তাদের সাথে আমাদের আলাপ হওয়ার পরে আরও সুবিধা হয়ে গেল।''[28] দেশবিভাগের পূর্বে পোশাক হয়ে উঠেছিল মুসলিম সত্তার পরিচায়ক। অন্নদাশঙ্কর রায়ের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় পূর্বে মুসলমান বাঙালির অনেকেই ধুতি পড়তেন। কিন্তু পাকিস্তান আন্দোলনের সময় থেকেই তাদের পোশাক হয়ে গেল পাজামা-পাঞ্জাবি, টুপি ও দাড়ি। মনসুর আহমদ জানিয়েছেন মুসলিম আত্মসত্তা রাজনীতির অনুপ্রেরণায় তিনিও একসময় মুসলমানি পরিচয়ের এই চিহ্নগুলি ধারণ

করেছিলেন। জাতিসত্তা নির্মাণের দ্বিতীয় পর্যায়ে পোশাক কিন্তু স্থির হয়েই রইল, বাঙালি জাতীয়তাবাদের আবেগকে ত্বরান্বিত করল মূলত সংস্কৃতি — খাদ্য এবং অবশ্যই ভাষা। পাকিস্তানে কিছুদিন বসবাসের সময় মুজিবুর রহমানের স্মৃতিচারণা — ''তাই যা হবার পূর্ববাংলায় হোক, পূর্ব বাংলার জেলে ভাত পাওয়া যাবে, পাঞ্জাবের রুটি খেলে আমি বাঁচতে পারব না।''[29] 'ভাত' শব্দটি বাঙালিয়ানার সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে এক্ষেত্রে 'বাঙালি' আত্মপরিচয়ের দ্যোতক হয়ে উঠেছে। মুজিবুরের স্মৃতিলেখায় সমন্বয়ধর্মী বাঙালি সংস্কৃতির পরিচয় থাকলেও, মুসলিমত্ব নিয়েও কিন্তু একটা সচেতন বার্তা ধরা পড়ে যায় যখন তিনি বলেন — ''আমাদের বাঙালির মধ্যে দুইটা দিক আছে। একটা হল 'আমরা মুসলমান, আর একটা হল আমরা বাঙালি।''[30] তথাপি পাকিস্তান যখন তাঁর প্রতিস্পর্ধী, তখন দেশভাগের পরে হিন্দু-বাঙালির উপর রাজনৈতিক অত্যাচারের চিত্র অঙ্কণ করার ক্ষেত্রে মুসলমানত্বের উপরেও তিনি অসাম্প্রদায়িক নেতা — ''চন্দ্র ঘোষ স্ট্রেচারে শুয়ে আছেন। ... আমাকে দেখে কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, ভাই, এরা আমাকে 'সাম্প্রদায়িক' বলে বদনাম দিল; ... আর আমার চোখেও পানি এসে গিয়েছিল। বললাম, ''চিন্তা করবেন না, আমি মানুষকে মানুষ হিসাবেই দেখি। রাজনীতিতে আমার কাছে মুসলমান, হিন্দু ও খ্রিষ্টান বলে কিছু নাই। সকলেই মানুষ।''[31] সুতরাং এরপর দিল্লী ভ্রমণের সময় মুসলমান শাসকের সুমহান ঐতিহ্য আর তাঁর স্মৃতিলেখায় উঠে আসেনি, পরন্তু উঠে এসেছে বাস্তুত্যাগী হিন্দু বাঙালির দেশত্যাগের আবেগ ও যন্ত্রণার মুখোমুখি হওয়ার স্মৃতি — ''ভদ্রলোক বললেন, ''আমার বাড়িও বরিশাল জেলায় ছিল। এখন চাকরি করি দিল্লিতে।'' অনেক আলাপ হল, পূর্ববাংলার মাছ ও তরকারি, পূর্ববাংলার আলো বাতাস। আর জীবনে যেতে পারবেন না বলে আফসোস করলেন, কেউই নাই তাঁর এখন বরিশালে।''[32] মুজিবুর রহমানের স্মৃতিচারণায় দেশভাগের পূর্বে ও পরে আত্মপরিচয়ের এই প্রকার সরণ কৌতুহলোদ্দীপক ভাবে ধরা পড়েছে।

বস্তুত দেশের সম্পদের উপর আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে যে গোষ্ঠী সার্থক হয় সেই দেশে সেই স্বাধীন। ঐক্যবদ্ধভাবে সেই আধিপত্য বিস্তারের জন্য প্রয়োজন হয় জাতীয়তাবাদী আবেগের। একসময়ের হিন্দু মধ্যবিত্তের সঙ্গে ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল মুসলিম জাতীয়তাবাদী আবেগকে সংহত করার এবং পুনরায় পশ্চিম পাকিস্তানিদের আধিপত্য খর্ব করার

জন্য অবলম্বন করা হয়েছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদকে। জাতীয়তাবাদী নেতা মুজিবুর তাই বলেছেন — ''আমাদের জনগণ বুঝতে আরম্ভ করলো জাতীয় সম্পদ বিশেষ গোষ্ঠীর আর তারা যেন কেউই নন।''[33] সম্পদকে এইভাবে 'জাতীয়' করে তোলার ধারণা থেকেই গড়ে ওঠে রাষ্ট্র। সুতরাং এক্ষেত্রেও 'বাংলাদেশ' নামক রাষ্ট্রের জন্ম অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। বঙ্গদেশের পূর্বপ্রান্তের বাঙালিরা আর একবার দেশভাগ হতে দেখল। বাংলাদেশ হলো বাঙালির দেশ।

কলকাতা থেকে দূরে পূর্ববাংলায় বেড়ে ওঠা কবি শামসুর রাহমানের স্মৃতিচারণায় কিন্তু পাকিস্তান আন্দোলনের উত্তাপ একেবারেই ধরা পড়ে নি। মানবতাবাদী কবির স্মৃতিকথায় জাতিসত্তা রূপান্তরের দ্বিতীয় পর্যায় অর্থাৎ ভাষা আন্দোলন অনেক বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর 'হয়ে ওঠা' মূলত মফস্বলের ধার্মিক পরিবারের মানুষ থেকে প্রগতিশীল নাগরিক মানুষ — এই পথ ধরে। ম্যাট্রিক পাশ করার পর উনিশশ পঁয়তাল্লিশ সালে তিনি তাঁর আব্বার সঙ্গে আজমীর শরীফ দর্শনে যান। সেই স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন — ''হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষের ভিড় জমে সেই সুফির মাজারে, ... খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্‌তির প্রতি আমার শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও বলতে হয় এই মনষ্কামনা পূর্ণ হওয়ার ব্যাপারটি কোনও যুক্তিবাদী মনের কাছে গ্রাহ্য নয়।''[34] স্মৃতিচারণার এই বিশেষ ভঙ্গিটি বুঝিয়ে দেয়, কবি সমন্বয়বাদী ও ধর্মীয় আত্মপরিচয়কে তিনি জেরা করতে চান। উল্লেখযোগ্য বিষয়, দিল্লী ও তাজমহল দেখে পাকিস্তানপন্থীদের মত গৌরবময় মুসলিম ঐতিহ্যকে নিয়ে তিনি আত্মহারা হননি, পরন্ত তাজমহল দর্শনের স্মৃতি বর্ণনায় তাঁকে উদ্বেলিত করে রবীন্দ্রনাথের কবিতা। কবির স্মৃতিচারণায় তাঁর সত্তা পরিচয়ের উত্তরাধিকার এইভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর স্মৃতিলেখা থেকে জানা যায় দেশভাগের পরবর্তী সময়ে ঢাকা ক্রমশঃ কলকাতার সমান্তরাল অপর একটি বাঙালি শিল্পসাহিত্য সংস্কৃতিচর্চার কেন্দ্র হয়ে উঠছিল। উচ্চাকাঙ্খী মুসলিম মধ্যবিত্ত বাঙালির জাগরণের উদ্বেলতায় ভাস্বর শামসুরের স্মৃতিলেখায় তাই উঠে এসেছে ঢাকায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন, সাহিত্য পত্রিকা সৃষ্টির কথা। তিনি জানাচ্ছেন ১৯৫০ সালে পূর্ববাংলা থেকে প্রথম আধুনিক কাব্যগ্রন্থ 'নতুন কবিতা' প্রকাশের কথা, জানাচ্ছেন 'জেগে আছি' নামক গ্রন্থের সমালোচনায় 'সত্যযুগ' পত্রিকায় যা লেখা হয়েছিল, সেই বিষয়ে — '''জেগে আছি' মুসলিম বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ গল্পগ্রন্থ এবং সমগ্রভাবে বাংলা সাহিত্যের

অন্যতম সেরা বই।”[35] লেখকের উল্লেখে মুসলিম বাঙালির সাহিত্য ও সমগ্র বাংলা সাহিত্যের মধ্যে ভারসাম্যরক্ষার মনোভাব স্পষ্ট।

বস্তুতঃ মুসলিম বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র বাঙালি সংস্কৃতি নিয়ে তাঁর আবেগময় ও ভেদহীনতার স্মৃতিচারণা আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। দেশভাগের মতো ছেদকে তিনি অনায়াসে অতিক্রম করে যান বাঙালির অখণ্ড সাংস্কৃতিক চেতনা দিয়ে। কবি হিসেবে দুই বাংলাতেই তাঁর অনায়াস সঞ্চরণের কাহিনি বলেন তিনি — ‘‘ইতিমধ্যে সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত মাসিক ‘পূর্বাশা’ পত্রিকায় আমার একাধিক কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। কায়সুল হকের মনে এমন ধারণা জন্মে যে, কলকাতার ‘পূর্বাশা’য় প্রকাশিত কবিতাবলির রচয়িতা এবং ঢাকার পত্রিকায় যার কবিতা এতদিন মুদ্রিত হয়েছে তারা দুই ভিন্ন ব্যক্তি। ... ‘পূর্বাশা’র সম্পাদকের ত্বরিত জবাব জানিয়ে দিল যে, শামসুর রাহমান ঢাকার বাসিন্দা এবং সে কবিমনের অধিকারী।”[36] সুতরাং শিল্পিত স্বভাবই তাঁর আত্মপরিচয় — এটি বারংবার তাঁর স্মৃতিলেখায় ব্যঞ্জিত। শিল্প-সংস্কৃতির এইরূপ প্রবহমানতা রাষ্ট্রের সীমারেখাকে অকিঞ্চিৎকর করে দেয় — তাঁর স্মৃতিকথা পড়ে এই প্রতীতি জন্মায়। সেইকারণেই দেশভাগের পরেও তাঁর স্মৃতি দাঙ্গা অথবা রাজনৈতিক অবহেলার কাহিনিকে অনুসরণ করে না, পরন্তু সে লেখায় অনায়াসে উঠে আসে ব্যতিক্রমী চরিত্র মেজ ভাই-এর কণ্ঠে ‘ভারততীর্থ’ আবৃত্তির স্মৃতি। স্মৃতির গল্পে তিনি সেই কবিতার কিছু পঙ্‌ক্তিও লিখেছেন — ‘‘শক-হুণ-দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।” রাজনীতি সচেতন মনসুর সাহেবের আত্মপরিচয় রাজনীতি-ব্যাখ্যার এক বিপরীত চেতনা শামসুরের স্মৃতিকথাকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। আবার যৌবনের স্মৃতিচারণায় অবলীলাক্রমে তিনি লিখছেন — ‘‘... দিন কাটছিল কিছুই না করে, ... তাজমহল সিনেমায় হিন্দি ফিল্‌ম উপভোগ করে। ... ঘুম ভাঙা চোখে ‘গল্পগুচ্ছ’ নতুন করে পড়তে শুরু করলাম...। ...অনুপম এক মুগ্ধতাবোধ আমাকে কৌতুহলী করে তুলল তাঁর অন্যান্য লেখা সম্পর্কে — ...। ... বঙ্কিমচন্দ্র এবং শরৎচন্দ্রের সঙ্গেও পরিচিত হয়ে উঠলাম।”[37] লেখকের বয়ানে মুসলিম-বাংলাভাষা সাহিত্য প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের একপেশে আত্মখণ্ডনের বিরুদ্ধে এক সহজ প্রতিবাদের সুর ধরা পড়েছে। তাই দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথকে পাকিস্তানের সাহিত্যজগৎ থেকে হিন্দু কবি বলে নির্বাসিত করার প্রচেষ্টা এবং তার বিরুদ্ধে শামসুর রাহমান ও সচেতন

বুদ্ধিজীবীদের প্রখর প্রতিবাদের স্মৃতি তাঁর লেখনীতে বিস্তৃত ও উজ্জ্বল — ''... বাঙালি সত্তাকে খারিজ করে পয়লা বৈশাখ-উদ্‌যাপন এবং রবীন্দ্র-সংগীতকে হিন্দু সংস্কৃতির অংশ ঠাউরে নিয়ে বক্তৃতা দিলেন। এইসব অসার বক্তব্যের বিরোধিতা করে সংবাদপত্রে বিবৃতি দেন আঠারোজন বাঙালি বুদ্ধিজীবী।''[38] তাঁর লেখা থেকেই জানা যায় এই প্রচেষ্টায় পাকিস্তানী সরকারের প্রচেষ্টার মদতদাতা ছিলেন বেশ কিছু সংখ্যক মুসলমান বাঙালি বুদ্ধিজীবীও। সুতরাং যে মুসলিম আত্মপরিচয় রাজনীতির পরিণতি দেশভাগ, সেই ঘটনার কিছু বছর পরেই সেই রাজনীতির উগ্রতার প্রতিস্পর্ধী প্রতিবাদের স্বর শোনা যাচ্ছিল শামসুর রাহমানের মতো গুটিকতক বাঙালি মুসলমান বুদ্ধিজীবীর কণ্ঠেই এবং তারই পরিণতি পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাভাষী মানুষদের জাতিসত্তা নির্মাণ-আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ের উদার প্রাঙ্গণে উত্তরণ।

ধর্মীয় আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার রাজনীতি অপেক্ষা শামসুর রাহমানের কবিসত্তাকে অনেক বেশি আকর্ষণ করেছিল সাংস্কৃতিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। সেই কারণেই সংস্কৃতির প্রবহমানতায় তাঁর প্রত্যয় যা দেশের সীমারেখা মানে না। তিনি একথাও তাঁর স্মৃতিচারণায় স্বীকার করেছেন যৌবনে তিনি রাজনীতি বিমুখ ছিলেন, সুতরাং মুসলমান সত্তাপরিচয় প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্যায় নিয়ে তাঁর স্মৃতিচারণা নীরব। এই নীরবতা তাঁর সমর্থন-অসমর্থনের বিশেষ ইঙ্গিতবাহী। কিন্তু দলীয় রাজনীতির বাইরে তাঁর ব্যক্তিগত রাজনৈতিক বোধ কিন্তু অন্তরালে থেকে যায়নি — ''একদিন কলেজ প্রাঙ্গণে এক সভায় তাজুদ্দিন আহমদকে প্রথম দেখি। ... তখন চলছে পাকিস্তান আন্দোলন, মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রায় সবাই সমবেত হচ্ছে মুসলমান লিগের পতাকার নীচে নিজেদের জন্যে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। তাজুদ্দিন আহমদ ... মুসলিম লিগের নিষ্ঠাবান কর্মী। ... দূর থেকে দেখেছি সেই প্রত্যয়ী, কর্মিষ্ঠ দেশপ্রেমিককে।''[39] কবির বক্তব্যভঙ্গিমায় নৈর্ব্যক্তিক হওয়ার প্রচেষ্টা, দূর থেকে আন্দোলনকে দেখার মনোভাব সুস্পষ্ট হলেও তাঁর মনোভঙ্গি নির্বিকার নয়। বিশেষতঃ যখন তিনি তাজুদ্দিনকে 'দেশপ্রেমিক' বলেন, তখন কবির দেশের অনুসন্ধান বিষয়েও কৌতূহল জাগে। অখণ্ড বাংলা সংস্কৃতির অনুপ্রেরণা তাঁর হৃদয়ে ছিল একথা যেমন ঠিক, তেমনই পূর্ববাংলার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের স্বীকার যে তাঁর মর্মে ছিল, একথাও তাঁর স্মৃতিকাহিনিতে ধরা পড়েছে। উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। তিনি স্মৃতিচারণা করেছেন, পূর্ববাংলার প্রতিনিধি হিসেবে পশ্চিমবাংলার

শান্তিনিকেতনের সাহিত্যমেলায় যোগদানের ঘটনার। এই বর্ণনায় কবি আপ্লুত, শ্রদ্ধাশীল, কিন্তু সেই মেলার গল্প শেষ হয় কবির 'স্বদেশ' প্রত্যাবর্তনের ভাবপ্রবণ বর্ণনায় ''পরদিন কায়সুল হক এবং আমি রওয়ানা হলাম প্রিয় স্বদেশের উদ্দেশে। ... পশ্চিমবঙ্গ পেরিয়ে ট্রেনের জানালা থেকে পূর্ব বাংলার অপরূপ রূপ দেখতে দেখতে চলেছি। গাছপালার সবুজ, ফসলের ঢেউ, আকশের নীলিমা, ... আমাকে উদ্দীপিত করে তুলল।''[40] বাঙালি জাতীয়তাবাদী আবেগের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা — ইতিপূর্বে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিকথায় দেখেছি। শামসুরের স্মৃতিকথায় পশ্চিমবাংলার সঙ্গে পূর্ববাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ভিন্নতা না থাকা সত্ত্বেও, পূর্ববাংলার প্রতি তাঁর জাতীয়তাবাদী আবেগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে পূর্ববাংলার প্রকৃতির প্রতি মুগ্ধতায়। সমরূপ প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের প্রসঙ্গকে স্থগিত রেখে পূর্ববাংলায় তাঁর স্বদেশ অনুসন্ধান দেশভাগের ঘটনাকে ন্যায়সঙ্গত করে তোলে।

অথচ দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার হিংস্রতা ও সর্বস্ব হারানো উদ্বাস্তু মানুষগুলির দুরবস্থা তাঁর মানবতাবাদী সৃজনশীল সত্তাকে যে প্রতিনিয়ত খণ্ডিত ও দগ্ধ করেছে তাও তিনি স্মৃতিলেখায় বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছেন। কবি হিসেবে এক প্রেমময় আদর্শ স্বাধিষ্ঠানভূমির স্বপ্ন দেখেন তিনি প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে। তাঁর প্রেমিক কবিসত্তাকে হিংসা ও বিচ্ছিন্নতা কষ্ট দেয় বলেই তিনি লেখেন — ''সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগ আমাদের অনেককেই বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে চিরতরে। কখনও আর দেখা হবে না আমাদের।''[41] রবীন্দ্রনাথ অতীতের সৌন্দর্য জগৎ থেকে বর্তমানের কোলাহলমুখর বাস্তবের বিচ্ছিন্নতা জনিত যন্ত্রণাকে বর্ণনা করতে গিয়ে ম্যাথু আর্নল্ডের একটি কবিতার উল্লেখ করেছেন 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থের 'মেঘদূত' প্রবন্ধতে। বাঙালি সত্তার দ্বিধাবিভক্তির কারণে শামসুর রাহমানের যে কাতরতা সেই প্রসঙ্গেও স্মরণ করা যায় কবি-কথিত ম্যাথু আর্নল্ডের উক্তিটি — ''... কোনো ইংরেজ কবি লিখিয়াছেন, মানুষেরা এক-একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো, পরস্পরের মধ্যে অপরিমেয় অশ্রু-লবণাক্ত সমুদ্র। দূর হইতে যখনই পরস্পরের দিকে চাহিয়া দেখি, মনে হয়, এক কালে আমরা এক মহাদেশে ছিলাম, এখন কাহার অভিশাপে মধ্যে বিচ্ছেদের বিলাপরাশি, ফেনিল হইয়া উঠিতেছে।''[42] একদিকে মানবতাবাদী রোমান্টিক কবিসত্তার স্বপ্ননীল ঐক্যের ভূমি অন্বেষণ, অন্যদিকে বাস্তবের কঠোরতায় পশ্চিমবঙ্গের প্রতি 'অপরতারবোধ ও পূর্ববাংলায় স্বদেশ-আত্মার

মজ্জাগত অনুভূতি শামসুর রাহমানের দেশভাগের স্মৃতিতে ধরা পড়ে।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ববঙ্গে চলে গেছিলেন যাঁরা, দেশভাগের পরে, তাঁদের মধ্যে লেখক হাসান আজিজুল হক কিন্তু তাঁর মনোভাবে অনেক দৃঢ়, স্পষ্ট ও দ্বন্দ্বহীন। দেশভাগ সংক্রান্ত স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কোন দ্বিধা না রেখেই তিনি লিখেছেন — ''সুবিস্তৃত বাংলাদেশে হাজার বছর ধরে হিন্দু-মুসলিম দুই মোটা হিসেবের সম্প্রদায়সহ যে অসংখ্য ধর্মমত ও পথের মানুষের জীবনবিন্যাস, সেই বিন্যাস খুঁজলে সাম্প্রদায়িকতার নানারকম ভেদ অবশ্যই দেখা যাবে — কিন্তু সেখান থেকে দাঙ্গা আসতে পারে না, দেশভাগ তো নয়ই। আমার নিজের অভিজ্ঞতায় এখানে কোনও যৌক্তিক ন্যায় নেই।''[43] হাসান আজিজুল হকের স্মৃতিতে গ্রামের জীবনের দুধরনের স্মৃতি ধরা আছে। তাঁর গ্রামে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কথা বলতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের স্মৃতি সামনে চলে এসেছে — ''বেশ ছোটবেলায় এটাও কি আমার সংস্কারে চলে গেল যে হিন্দুর বাড়িতে গেলে আমি সে বাড়ির কোনও কিছু ছুঁয়ে দিতে পারব না, উঠোনে শাড়িধুতি শুকোতে দেওয়া থাকলে কোনও অবস্থাতেই স্পর্শ করতে পারব না, ঘরের মধ্যে ঢুকতে পারব না, জল চেয়ে খেতে পারব না।''[44] তাঁর বক্তব্য অনুসারে সামন্ততান্ত্রিক গ্রামীণ সমাজে উচ্চবর্ণ হিন্দুদের স্পর্শদোষ বাঁচিয়ে চলা যেন একটি প্রচলিত আচারমাত্র — এইভাবেই দুই সম্প্রদায়ের মানুষ মেনে নিয়েছিল। কিন্তু আধুনিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমান মন এই নিয়মের অপর দিকটি নিয়ে সোচ্চার হয়েছিল। সেই দিক হল উচ্চবর্ণের অহংকার ও মুসলমান ও নিম্নবর্গের অপমান। হাসান আজিজুল হকের মানবপ্রেমী দার্শনিক প্রজ্ঞা বিষয়টিকে সামগ্রিকভাবে দেখতে চেয়েছে। এই আচরণের 'অপমান'-এর দিকটি তিনি স্বীকার করেছেন — ''মানুষ ঠিক সেই আচরণটি করত, যে আচরণে অন্য মানুষ একেবারে ভিতরে সঙ্কুচিত ক্ষুদ্র হয়ে যায়, তার মূল সত্তাটি ধ্বসে পড়ে — যে স্বীকৃতিটুকুতে মানুষের মর্যাদা সেই স্বীকৃতিটুকুই প্রত্যাখ্যান করা।''[45] এই আচরণকে তিনি 'নীরব নিষ্ঠুরতা, সাম্প্রদায়িক নিষ্ঠুরতা'[46] হিসেবে চিহ্নিত করেও বললেন — 'সাধারণভাবে অসচেতন নিষ্ঠুরতা।''[47] প্রতিবেশীর প্রতি অপরতার বোধ তাঁর ছিল না বলেই তিনি জানতেন, যে হিন্দুবাড়িতে তাঁকে মুসলমান হিসেবে স্পর্শদোষ বাঁচিয়ে চলতে হয়, সেই বাড়ির গৃহিণী তাঁকে সত্যিই ভালবাসতেন। সুতরাং দুই সম্প্রদায়ের ভিতর 'স্নেহ ঘৃণা'-র সম্পর্ক একসঙ্গে থাকতো এটাই বাস্তব

এবং এটাই বিস্ময়ের তাঁর কাছে।

কবি শামসুর রাহমানের মতই বাঙালির আত্মসত্তা নির্মাণের ক্ষেত্রটি তাঁর মন ও মননকে আকর্ষণ করেছে বেশি। কিন্তু কবি শামসুর রাহমানের মত তিনি স্বপ্নসন্ধানী নন, কথাসাহিত্যিক হিসেবে এই সত্তার নির্মাণ ও অনুসন্ধান প্রসঙ্গে তিনি বিশ্লেষণধর্মী। তাঁর সাম্যবাদী মানবতায় বিশ্বাসী আধুনিক মন বাঙালির আত্মসত্তার সন্ধান করতে গিয়ে আধুনিক যুগের মধ্যবিত্ত দ্বারা পরিচালিত ভাষা আন্দোলনকে অবলম্বন করেননি, তিনি সেই সত্তাকে খুঁজতে চেয়েছেন — ''... বাঙালির লৌকিক জীবন থেকে'', ''নিম্নবর্ণের মানুষের করণ-কর্ম'' থেকে।[48] এইকারণে তাঁর গ্রামের স্মৃতিতে নিজের ছেলেবেলাকে যেভাবে তিনি বর্ণনা করেছেন, তা আভিজাত্যের-জীবন-ধারণা থেকে দূরবর্তী, নিম্নবর্গীয় ভূমিসংলগ্ন মানুষের প্রাকৃতিক জীবনচর্যার সঙ্গে তার আত্মিক যোগাযোগ — ''...চন্দ্রবোড়া সাপের মাথায় পা দিয়ে দেখেছি। পুকুরে ভেসে ওঠা সোনা রঙের গোসাপ পিটিয়ে মেরেছি, কাশ চিবিয়ে দেখেছি ... অদ্ভুত স্বাদ-গন্ধের ফুল পাতা, শেকড়, ফল, মূল খেয়ে দেখেছি ... ।''[49] আভিজাত্যবিহীন এই গ্রামজীবনের বর্ণনা উচ্চবর্ণীয় হিন্দু — যাঁরা পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে এসেছেন, তাঁদের রোমান্টিক গ্রামরূপ কল্পনার থেকে স্বতন্ত্র। মাটির কাছাকাছি গ্রামবাংলার লৌকিক জীবনচর্যায় বাঙালির প্রকৃত আত্মরূপ সন্ধান করে নিজেকে তাঁদেরই একজন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য, বাঙালির এই সত্তারূপ অবশ্যই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মবোধহীন। মিহির সেনগুপ্ত তার 'বিষাদবৃক্ষ' নামক গ্রন্থে বরিশালের লৌকিক সংস্কৃতিতে তুলে আনতে চেয়েছেন। কিন্তু সে বর্ণনা তাঁর অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় আজিজুল হকের মত, পরন্ত অনেক বেশি কৃত্রিম ও আরোপিত মনে হয়।

অথচ দেশভাগ ও দাঙ্গাও তো ভয়ংকর বাস্তব। হাসান আজিজুল হকের ন্যায়ধর্মকে তা বিনষ্ট করতে না পারলেও, দেশভাগের অব্যবহিত পূর্বে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা স্মরণ করতে গিয়ে তিনি এক প্রগাঢ় আতঙ্কের কথাও লিখেছেন — ''কলকাতায় ভয়াবহ দাঙ্গা হল। ভারতের অন্যান্য জায়গায়ও। ... আমার যেন মনে হল, গ্রামের ওপর একটা কালো ছায়া যেন পুরো গ্রামটাকে ঝেঁপে ধরেছে। তখনই ভয়ের একটা ভাব এল।''[50] ভয় দেখানো ও ভয় পাওয়া — উভয় বঙ্গের বাস্তুচ্যুত সংখ্যালঘু মানুষের স্মৃতির একটি সাধারণ বিষয়। হাসান আজিজুল হক এই ভয়ের কথা — অন্য

গোষ্ঠীকে আক্রমণকারী হীন হিসেবে বর্ণনা না করেও — একাধিক জায়গাতে বলেছেন তাঁর স্মৃতিচারণাতে — ''একবার বাবাকে আনতে গেলাম। ট্রেন এল ধোঁয়া উড়িয়ে ফিরে গেল। বাবা এলেন না। সে-দিন ফেরার পথে আচমকা ভয় পেলাম। ওইরকম তীব্র অসম্ভব ভয় খুব কমই পেয়েছিলাম।''[51] এই আতঙ্ক ও অবিশ্বাস থেকেই দুই সম্প্রদায়ের মানুষের বাস্তুত্যাগ। হাসান আজিজুল হকের সমগ্রতাবোধে বিশ্বাসী ন্যায়বোধ তাঁর স্মৃতিতে উজ্জ্বল করে তুলেছে শেয়ালদা স্টেশনে পূর্ববঙ্গ থেকে বিতাড়িত হিন্দু উদ্বাস্তুতের পশুবৎ জীবনযাপনকেও — ''... তখন শিয়ালদহ স্টেশনে উড়ে-যাওয়া, ছিঁড়ে-যাওয়া, ন্যাকড়া হয়ে-যাওয়া লক্ষ মানুষ থিকথিক করছে। তাদের মাড়িয়ে ট্রেনে উঠি, ট্রেন থেকে নেমে তাদের মাড়িয়ে কলকাতায় আসি।''[52] নিপীড়িত জনজীবনের প্রতি সমব্যাথী-স্মৃতিচারণে লেখক দেশভাগ ও আত্মপরিচয়ের রাজনীতিকে কশাঘাত করতে চেয়েছেন যেন। দেশভাগের পরে তাঁর পশ্চিমবঙ্গ বসবাসের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও সংখ্যালঘুর নিরাপত্তাহীনতা ও আত্মপরিচয়ের সংকটকে ব্যক্ত করে — যা দেশভাগের ব্যর্থতাকেই প্রমাণ করে। — ''... একবার যখন আমার বেতন বন্ধ হয়ে গেল এই অভিযোগে যে আমি পাকিস্তানি, কারণ আমার ডিগ্রি রাজশাহি বিশ্ববিদ্যালয়ের, ... ইন্সপেক্টর মহোদয় ... কড়া চোখে আমার দিকে চেয়ে রইলেন, তারপর বিড়বিড় করে বললেন, আপনার ডিগ্রি পাকিস্তানের, আপনি পাকিস্তানি। আমি কোনও কথা না বলে আমার ভারতীয় পাসপোর্টটি তার মুখের সামনে এগিয়ে ধরে বললাম, এই ভারতীয় পাসপোর্ট একজন ভারতীয় ছাড়া কেউ পেতে পারে কি?''[53]

দেশভাগের পর আত্মপরিচয় সংকটের হাহাকার আমরা মনোরঞ্জন ব্যাপারীর লেখায় পেয়েছি, মিহির সেনগুপ্ত জানিয়েছেন, সংখ্যালঘু হওয়ার কারণে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। দেশহীন মানুষদের আত্মপরিচয়ের সংকট বিষাদের সঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে অধুনা বাংলাদেশ নিবাসী মোবারক হোসেনের স্মৃতিচারণায়। পশ্চিমবাংলার বসিরহাটের কোন গ্রামের মানুষ তিনি। দেশভাগ বিভক্ত করে দিয়েছিল তাঁর পরিবারকেও। তাই কোন একটি দেশের মানুষ হয়ে ওঠা তাঁর পক্ষে ছিল যন্ত্রণার ও প্রায় অসম্ভব। মোবারক হোসেন লিখেছেন — ''কিন্তু কিছুদিন বড় ভাইয়ের বাসায় থাকার পর আবার দেশে ফিরে আসি। আমার ভালো লাগেনি।''[54] একদেশে থেকে গেছেন তাঁর মা-বাবা, অন্য দেশে তিনি। বাবা-মায়ের মৃত্যুর সময়

কাছে থাকতেও পারেননি। জাতিসত্তার পরিচয়ের খোঁজ এই ভাবেই ব্যক্তিসত্তাকে বিভক্ত করে দিয়েছিল। তাঁর লেখা থেকে এও জানা যায় পূর্ববঙ্গে গিয়ে — ''পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি রিফিউজিরা কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। ... দেশ ছেড়ে মানুষগুলো ক্রমশ পিছিয়ে পড়তে থাকে।''[55] লেখক গিয়েছিলেন বসিরহাটের একটি গ্রাম থেকে। সুতরাং গ্রামীণ মানুষ হিসাবে নতুন ভূমিতে তাঁর অভিজ্ঞতা নাগরিক মানুষদের সঙ্গে অবশ্যই এক ছিলনা। মোবারক হোসেন পুনরায় বাস্তুচ্যুত হয়েছেন সেই নতুন ভূমি থেকেও। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে রিফিউজি পরিচয়ে তিনি ফিরে আসেন নিজেরই জন্মভূমি গ্রামে। বাংলাদেশ গঠনের পর আবার ফিরে গেছেন। মোবারক বা তাঁর মত অনেক মানুষের 'দেশ' পরিচয় এভাবেই খণ্ডিত হয় গেছে বলে মোবারক মনে করেছেন। তিনি লিখেছেন — ''সরকারগুলোর দ্বিমুখী নীতি এবং ধর্ম প্রীতির কারণে উভয় দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু মানুষকে উসকে দিয়েছে দেশ ত্যাগে। যার চরম খেসারত দিচ্ছি আমার মতো মানুষেরা যারা আত্ম-পরিচয়ের সংকটে ভুগছে।''[56] এই আত্মপরিচয়ের সংকট পশ্চিম থেকে পূর্বে যাওয়া অনেক মানুষের মধ্যেই ছিল — একথা অস্বীকার করা যায় না। এমনকি নাগরিক মানুষজনের মধ্যেও সেই সমস্যা ছিল। তবে কার্যকারণ পরিস্থিতি ও প্রকাশ অবশ্যই ছিল আলাদা। নাগরিক মধ্যবিত্ত আদর্শগতভাবে পাকিস্তান চেয়েছিলেন। কিন্তু সেই 'স্বপ্নের দেশে' তাঁরা নিজেদের শিকড় খুঁজে পাননি অনেক সময়েই। যেমন অধ্যাপক রুবেয়া মঈনের কাছে তাঁর দেশ ঢাকা। জোরের সঙ্গে সে কথা বলার পরও তিনি নিজেকে রুটলেস বলে মনে করেছেন।

কলকাতা শহরবাসী দুজন সাহিত্যিক আবু রুশ্‌দ্‌ এবং আবুল হোসেন দেশভাগের পর তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তান চলে যান। আবু রুশদ্‌ ছিলেন পাকিস্তান আন্দোলনের সমর্থক। কলকাতার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের সুদৃঢ় অবস্থান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আবু রুশ্‌দ্‌-এর ছিল উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। এঁদের মন ও মনন ছিল সম্পূর্ণভাবে নাগরিক ও পাশ্চাত্য অনুগামী। এই সময় থেকেই হিন্দু 'ভদ্রলোক' শ্রেণির মতই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমান যুবকরা সত্তাপরিচয়ের নির্ণায়ক হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে। আবু রুশদের কলকাতা বাসের স্মৃতিচারণায় বিষয়টি স্পষ্ট ধরা পড়ে। তাঁর স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, কেন ও কেমন ভাবে মুসলিম শিক্ষিত যুবকরা কলকাতায় তাঁদের অস্তিত্বকে সুদৃঢ় করার জন্য সংস্কৃতির

সঙ্গে ধর্মকে সম্পৃক্ত করেছিলেন এবং এই প্রচেষ্টা যে ছিল পাকিস্তান আন্দোলনের দ্বারা অনুপ্রাণিত, সেই বিষয়টি সম্পর্কেও তাঁর স্মৃতিলেখা থেকে জানা যায়। তিনি নিজের সেইসময়ের মনোভাব জানিয়েছেন এইভাবে — ''যদি নিজেদের এক সাংস্কৃতিক সংস্থা গড়ে তুলি তবে মন্দ হয়না। ... সকলে মিলে নাম ঠিক করলাম কালচারাল মজলিস।''[57] তিনি জানাচ্ছেন বেঙ্গল মুসলিম লীগের সাংস্কৃতিক সভায় সোহরাওয়ার্দীর বক্তৃতা শুনে বেরিয়ে এসে অনুপ্রাণিত মুসলমান যুবকরাই এই সংস্থাটি নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর বক্তব্যে 'নিজেদের' শব্দটির ব্যবহার স্পষ্টতই বুঝিয়ে দেয় সংস্থার উদ্দেশ্য। সেসময় কল্লোলগোষ্ঠীর আন্দোলন ও তাঁর কিছু পরে সাম্যবাদী সাহিত্যিকদের বিকাশ — কলকাতার সাহিত্য-অঙ্গণকে সচকিত করে রেখেছিল বটে, কিন্তু সে সব সাহিত্য প্রচেষ্টার মূল ব্যক্তিরা ছিলেন হিন্দু ধর্মীয়। নজরুল ইসলাম ছাড়া সেসময় অপর কোন বাঙালি মুসলমান কবি অথবা সাহিত্যিক সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে ওঠেননি। আবু রুশ্‌দ্‌ জানাচ্ছেন — ''নাচগান তখনকার বাঙালী মুসলিম সমাজে প্রায় নিষিদ্ধ ছিলো। ... আবুল কাসেম মল্লিক 'কে মল্লিক' নামে রেকর্ড করতেন। মুসলমানরা টের পেতো না তার ধর্ম কি আর হিন্দুরা মনে করতো তিনি তাদেরই একজন। নাচগানে তো বটেই শিক্ষা ও সাহিত্যের ব্যাপারেও বাঙালী মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে মস্ত এক ফারাক ছিলো।''[58] সুতরাং পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত আত্মসম্মানী মুসলিম যুবকরা চেয়েছিলেন হিন্দুদের দ্বারা প্রভাবিত সাহিত্য-সংস্কৃতির সমান্তরাল মুসলিম বাঙালির সংস্কৃতিসত্তার জাগরণ ও প্রতিষ্ঠা — দেশভাগের আগে কলকাতাতেই। যদিও স্বকীয় সমাজের সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় নির্মাণ তাঁদের উদ্দেশ্য হলেও সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ তাঁদের উদ্দিষ্ট ছিল না — একথা আবু রুশ্‌দ্‌ তাঁর স্মৃতিলেখায় জানিয়েছেন। লক্ষণীয়, তাঁরা কিন্তু প্রাক্‌-স্বাধীনতাপর্ব থেকে একান্তভাবেই বাংলাসাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী, বাংলার বাইরে বৃহত্তর মুসলিম সমাজের সাহিত্য-সংস্কৃতির ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী তাঁরা হতে চাননি; তাঁরা — অর্থাৎ কলকাতার পাশ্চাত্য শিক্ষিত আবু রুশ্‌দ্‌ ও তাঁর মতো আধুনিক মুসলমান যুবাপুরুষরা। অথচ দেশভাগ তাঁদের কাছে ছিল একান্ত কাঙ্খিত এবং মুসলমানদের নিজেদের ভূমি পাকিস্তান হলে — ''... বিরাট এক সামাজিক পরিবর্তনের ঢেউ আসবে ... আমার মনে সে-স্বপ্ন তখন অটুট ছিল।''[59] — একথা জানিয়েছেন রুশ্‌দ্‌। আবার অন্যদিকে নাগরিক সুখসুবিধায় অভ্যস্ত মন কলকাতার সঙ্গে অনুভব

করতো এক নিবিড় আত্মিক যোগ। পাকিস্তান আন্দোলন ও কলকাতা প্রেম, অর্থাৎ তাঁর মুসলমান সত্তা ও সাংস্কৃতিক নাগরিক সত্তার একটা দ্বন্দ্বের কথা লেখক নিজেই তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন — ''... কলকাতা আমার রক্তে থাকলেও জিন্না সাহেবের দাবী অনুযায়ী আমরা যদি পাকিস্তান পেয়ে যাই কলকাতা ছাড়তে আমার কেমন লাগবে তখন মনে মনে তার এক ছবি আঁকবার চেষ্টা করতাম।''[60]

পাকিস্তান আন্দোলনকে তিনি সমর্থন করতেন। তথাপি তিনি তাঁর স্মৃতিচারণায় লিখেছেন — ''ক্রীপস মিশনে একবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল যে ভারতবর্ষের অখণ্ডতা হয়তো বজায় রাখা যাবে। ... তখন পাকিস্তান আর হবেনা সে কথা মনে করে আমি সাময়িকভাবে দমে গিয়েছিলাম কিন্তু কলকাতা ছাড়তে হবে না সে কথা মনে করে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছিলাম।''[61] লেখক আবুল হোসেন স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরের দিন ঢাকা বিমানবন্দরে এসে যখন নামলেন, তখনকার তাঁর মনোভাব তিনি ব্যক্ত করছেন এইভাবে — ''প্লেনের দরজা খোলা হলে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে তেজগাঁওয়ে ঢাকার মাটিতে পা রাখতেই সেই ভালো লাগাটা দপ করে নিভে গেল। ... দমদমের জমজমাট এয়ারপোর্টের পর তেজগাঁওয়ের এই করুণ হাল দেখে কার না মন খারাপ হবে?''[62] আবু রুশ্‌দ্‌ অথবা আবুল হোসেনের কাছে কলকাতা ত্যাগ ছিল সত্তার সঙ্গে বিচ্যুতি। খুব স্বাভাবিক কারণেই তাঁরা পূর্ববাংলার গ্রামীন পরিবেশের সঙ্গে সহজে মানিয়ে নিতে পারেননি। নিজেদের 'দেশে'-এও এক ধরনের বিচ্ছিন্নতাবোধ এঁদের ছিল। আবুল হোসেন ঢাকা শহর ছেড়ে যখন ময়মনসিংহ যাচ্ছেন তখন পাকিস্তান পাওয়ার আনন্দে আত্মহারা জনগণের উন্মাদনা দেখে তিনি লিখেছেন — ''আর গাড়ি থামা মাত্রই সবার একসঙ্গে হুড়মুড় করে গাড়িতে উঠার চেষ্টা কামরা-টামরার বাছবিচার নেই। আর গাড়ি থামলেই আওয়াজ তুলছে পাকিস্তান জিন্দাবাদ। গার্ড আর ড্রাইভার ট্রেনে আছে কিন্তু গাড়ি তারা চালাচ্ছে না। গাড়ি চলছে যারা বিনা টিকিটে কামরায় ঢুকে ছাদে চড়ে দরজার হাতলে ঝুলতে ঝুলতে যাচ্ছে তাদের মর্জি মতো।''[63] রাষ্ট্রীয় আইনের অনুশাসনে শিক্ষিত ও নাগরিক সুশৃঙ্খলতায় অভ্যস্ত পাশ্চাত্য মন কিন্তু এই পরিস্থিতিতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেনি। তাই তিনি লিখেছেন — ''ছয় ঘণ্টায় ময়মনসিংহ পৌঁছাবার কথা। লাগলো সাড়ে আট ঘণ্টা। ... ময়মনসিংহ আসতে নিজেকে একরকম টেনে হিঁচড়ে কামরার বাইরে এনে হাফ

ছাড়ি।”[64] সুতরাং পূর্ববাংলার গ্রামীণ দরিদ্র মুসলমানদের সঙ্গে এঁদের শ্রেণিগত দূরত্ব ছিল। গ্রামীণ কৃষকের সামাজিক আর্থিক চাহিদা ধর্মবোধ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত থেকেই জাতি গঠনের দায়িত্ব এঁরাই গ্রহণ করেছিলেন এবং জনসাধারণ সম্পর্কে এঁদের মনোভাব ছিল ‘‘মানুষের রুচির পরিবর্তন ও পরিবর্ধনই আমাদের সবার লক্ষ্য।”[65] এদের নিজস্ব এলিট অবস্থান থেকেই রাষ্ট্রের কাছে এঁদের আশা প্রকাশিত হয়েছে। আবুল হোসেন লিখেছেন — ‘‘ব্যবসা-বাণিজ্য তো প্রায় সবই চলে গেল অবাঙালিদের হাতে, শিল্পায়নেরও একই অবস্থা। ... চাকরি-বাকরিতে ভাগ দিতে হচ্ছিল মোহাজেরদের। শুধু চাষবাসই রয়ে গেলো আমাদের জন্য।”[66] এই বক্তব্য একটি বিশেষ শ্রেণি চরিত্রকে নির্দিষ্ট করে দেয় — যে শ্রেণি নিজেদের স্বার্থে শিল্পায়ন ও নগরায়ন চায়, যারা পশ্চিমের অনুকরণে উন্নয়নের ধারণা গড়ে তোলে। সুতরাং খুব স্বাভাবিক কারণেই তাঁরা কৃষি নিয়ে ভাবিত নয়।

নাগরিকতার প্রতি এই অহেতুক আকর্ষণ থাকার কারণেই পশ্চিম থেকে যারা পূর্বে গেলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই, বিশেষত যাঁরা মূলত কলকাতা থেকে গেছেন, তাঁরা এক ধরনের সামাজিক সম্মানের অধিকারী হন এবং অর্থনৈতিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। হায়াত মাহমুদ লিখেছেন — ‘‘সেসময় পশ্চিমবাংলা থেকে আসা লোকজনদের এখানকার বাসিন্দারা খুব উঁচু মনে করত ...”[67] বুলবন ওসমান লিখেছেন — ‘‘নাস্তায় রুটি বিস্কুট কেক খেতে শেখালাম। খেত তো পান্তাভাত আর মুড়ি।”[68] গ্রামীণ জীবনের উপর এই ভাবেই নাগরিক বোধ ক্ষমতার বিস্তার ঘটিয়েছিল। বস্তুত গ্রামীণ মানুষের কাছে আত্মপরিচয়ের এই রাজনীতি ও দেশ বিভাজন কতটা প্রাসঙ্গিক ছিল তা সন্দেহ সৃষ্টি করে। রুবেয়া মঈন-এর লেখায় গ্রামীণ চেতনার সঙ্গে নাগরিক মধ্যবিত্তের উচ্চাকাঙ্ক্ষার এই পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে — ‘‘বাবাও চাকরি করতেন কলকাতাতে। দেশভাগের পর যখন অপশন দেওয়ার বিষয়টা সামনে আসে তখন বাবা নানার কাছে লিখেছিল পরামর্শের জন্য। নানা শুধু একটাই কথা বলেছিলেন বিদেশে যাও নয় তো ছেলে মানুষ হবে না। বাবা নানাকে মানতেন। কথা রেখেছিলেন। কিন্তু দাদাকে দেশত্যাগের কথা বলতে পারেননি। সিদ্ধান্ত নিয়ে কাগজপত্র জমা দেওয়ার পর দেশ ছাড়ার অল্প কিছুদিন আগে বলেছিলেন। দাদা প্রচণ্ড কষ্ট পেয়েছিলেন।”[69] লেখক-এর দাদা ছিলেন চাষী। উনিশ শতকীয় জাতীয়তাবাদ অথবা

পাকিস্তান আন্দোলন তাঁর কাছে কোন স্বতন্ত্র তাৎপর্য বহন করে আনে নি। তাই নিজস্ব ভূমি ও জীবিকা ছেড়ে যেতে তিনি রাজি হননি।

আবুল হোসেন আধুনিক নগর ঢাকাতে কলকাতার সমান্তরাল সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল নিয়ে উৎসাহিত ছিলেন — শামসুর রাহমানের মতই। তিনি লিখছেন — ''এত তাড়াতাড়ি ঢাকায় সাংস্কৃতিক জীবনের উন্মেষ দেখেও কম অবাক হইনি। ... এক বছরের মধ্যেই কলকাতা থেকে 'দৈনিক আজাদ' ঢাকায় চলে এল। তার সঙ্গে তাদের আনুষঙ্গিক প্রকাশনা 'মাসিক মোহাম্মদীও।''[70] তাঁর স্মৃতিকথায় একটা বড় অংশ জুড়ে জায়গা পেয়েছে দেশভাগের পর ঢাকায় সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক পরিমণ্ডল সমৃদ্ধতর হওয়ার ইতিহাস। তিনি জানাতে ভোলেননি — ''আসলে দেশ বিভাগের এই প্রাথমিক পর্যায়ে লেখক, শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিকদের পৃষ্ঠপোষকতার ভার অনেকখানি নিয়েছিল রেডিও পাকিস্তান।''[71] কলকাতায় শিক্ষা-সংস্কৃতি নির্ভর আত্মপরিচয় গড়ে তোলার প্রচেষ্টা আবু রুশ্‌দ্ প্রমুখ মুসলমান যুবকরা শুরু করেছিলেন, — দেশভাগের পরে ঢাকায় তা কেমনভাবে সম্পূর্ণতা পাচ্ছে, সেই ভাষ্য ধরা পড়েছে আবুল হোসেনের স্মৃতিচারণায়। কিন্তু এইভাবে উনিশ শতকের কলকাতার মতই এলিটদের আবাসভূমি ঢাকার সঙ্গে বৃহত্তর গ্রামবাংলার বিভেদীকরণও ঘটে গেল। নাগরিক বাঙালির মুখের ভাষাই শিক্ষিত বাঙালির বুলি হিসেবে স্বীকৃতি পেল এবং পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলায় প্রচলিত 'বাঙাল' উপভাষাগুলি হারিয়ে ফেলতে শুরু করলো নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও সত্তাকে। নাগরিক ভাষার আধিপত্য বিস্তারকারী এই শক্তির কথা জানা যায় হায়াত মাহমুদের স্মৃতিচারণা থেকে — ''ওপার থেকে আসার ফলে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাগত কোন সমস্যা হয়নি। তার কারণ সেন্ট গ্রেগরি স্কুলের পড়াশোনা। ওখানে যারা পড়তো তাদেরকে সহজ বাংলায় কথা বলতে হতো। টিচার কড়া ভাষায় বলে দিয়েছিলেন বাড়িতে যে ভাষায় কথা বলোনা কেন স্কুলে এসে স্ট্যান্ডার্ড ভাষায় অর্থাৎ বইয়ের ভাষায় কথা বলবে।''[72] বস্তুত উনিশ শতকেই রাঢ়ি বাংলার অনুসরণে বাঙালির ছাপার ভাষা তৈরি হয় এবং সেই ভাষাই ক্রমশ ক্ষমতার ভাষা হয়ে ওঠে। ইউরোপে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে Benedict Anderson যা বলেছেন, তা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য, "Certain dialects inevitably were "closer" to each print language and dominated

their final forms. Their disadvantages cousins, ... they were unsuccessful (or only relatively successful) in insisting on their own print form.”।[73] শামসুর রহমান লিখেছেন — ‘‘ঢাকাইয়া ভাষার প্রতি বেশ কিছু ব্যক্তির এক ধরনের বিদ্বেষ রয়েছে এটা আমি ছেলেবেলা থেকে লক্ষ্য করে আসছি। এই ভাষাটির প্রতি বিদ্রুপ মিশ্রিত ছে ছে ভাব রয়েছে।”[74] সুতরাং এই ভাবেই স্বাধীন মুক্ত দেশে জাতীয়তাবাদের সত্তাপরিচয় নির্ধারিত হয়েছে ক্ষমতার ভাষার দ্বারা এবং নাগরিক শিক্ষিতের এই ভাষা ও সংস্কৃতি-কেন্দ্রিক জাতীয়তাবোধ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের আধিপত্য বিস্তারকারী প্রচলিত বয়ান তৈরি করে দিয়েছে। কারণ আধুনিক সময়ে, “reading classes meant people of some power.”।[75] এই সাংস্কৃতিক আন্দোলন কেমন ছিল? ভাষাদিবস ও পহেলা বৈশাখ পালন হয়ে উঠলো বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রকাশ। এর উদ্দেশ্য কি? সনজীদা খাতুন লিখেছেন — ‘‘নগরে গ্রামে আদান প্রদানের ভেতর দিয়ে শাশ্বত বাঙালি সত্তা পরস্পরের মধ্যে রাখি বন্ধনে বাঁধা পড়বে, এই ছিল উদ্দেশ্য।” এই মেলায় গ্রামের কুটির শিল্প প্রদর্শনী ও বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু সনজীদা নিজেই জানিয়েছেন — ‘‘আর তার চেয়ে বড় সমস্যা ছিল গ্রামের বৈশাখী মেলা, হালখাতা ইত্যাদি ফেলে শহরে আসবার আকর্ষণ তখনকার গ্রামের মানুষের ছিলনা।”[76] এইভাবে গ্রামবাংলার হালখাতা খোলার মত অর্থনৈতিক ঘটনাকে সাংস্কৃতিক রূপদান করার যে প্রচেষ্টা তার মধ্যে বিশেষ একশ্রেণির সামাজিক আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টা প্রকট হয়ে ওঠে। মধ্যবিত্ত মুসলমান সমাজের এই আবদ্ধতা ও বিভেদীকরণ আবুল হোসেনের নজর এড়িয়ে যায়নি। তিনি লিখেছেন — ‘‘আর আমাদের বুদ্ধিজীবীরা? তারা চোখ কান বন্ধ করে এক ধরনের ফাঁপানো অন্তঃসার শূন্য স্লোগানসর্বস্ব অন্ধ দেশপ্রেমের জোয়ারে ভাসছিলেন। ... যে পোকায় খাওয়া পাকিস্তানের বিচ্ছিন্ন অংশ হিসেবে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছিলাম, সেই পরিবেশে আত্মপ্রসাদের স্থান ছিল সামান্যই।”[77] প্রতিবাদস্বরূপ সে সময়ে যে কবিতা তিনি লিখেছিলেন, তাও উল্লেখ করেছেন তিনি তাঁর স্মৃতিকথাতে। সেই কবিতার শেষ কয়েকটি পংক্তি এরকম — ‘‘আমাদেরও দেশ আছে। / গানে গানে গল্পে ও গাথায় / ম্যাপের পাতায়।”[78] সুতরাং সংস্কৃতি পরায়ণ নাগরিক মুসলিম মনের সঙ্গে বৃহত্তর কৃষিজীবী পূর্ববাংলার সাধারণ জীবনের বিচ্ছিন্নতাও তিনি অনুভব করেছিলেন — তাঁর

প্রতিবাদের কবিতায় তা স্পষ্ট।

অধুনা বাংলাদেশের বিখ্যাত সাংবাদিক বদরুদ্দিন উমর মতাদর্শে কম্যুনিস্ট। হাসান আজিজুল হক, আবু রুশ্‌দ, আবুল হোসেনের মত তিনি সংস্কৃতির জগতের লোক ছিলেন না, তিনি রাজনৈতিক পরিবারের সন্তান — মুসলিম লিগ নেতা আবুল হাশিমের পুত্র। সুতরাং দেশভাগের পরবর্তী সময়ে তাঁর পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান নিবাসের স্মৃতি সংঘর্ষময়। কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁর পরিচিতি ও সংলগ্নতার স্মৃতি উঠে এসেছে তাঁর স্মৃতিচারণায়। কম্যুনিস্ট পার্টির রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা তাঁর স্মৃতিকথায় আছে। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তাঁর বিরুপতা ছিল। তাঁর স্মৃতিতে উজ্জ্বল বর্ধমানের দাঙ্গা ও তাঁদের বাড়ি পুড়ে যাওয়ার ছবি। বাবার হিন্দু বন্ধুর কপট আচরণের কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন — ''মনে খুব দাগ কেটেছিল বলেই তখনকার ঘটনাটা এখনও আমার এত স্পষ্ট ভাবে স্মরণ হয়।''[79] তাঁর বাবার হিন্দু বন্ধু তাঁদের ঠকিয়ে সব আসবাবপত্র আত্মসাৎ করেছিলেন। সুতরাং সংখ্যালঘুর আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতারবোধ কম্যুনিস্ট মানুষটির স্মৃতিলেখাতে প্রাধান্য দেয় ভারতীয় নেতাদের হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার দিকগুলি, পক্ষান্তরে মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা চাপা পড়ে যায় — এমনকি বালক বয়সে ১৯৪৬-এর ১৬ই অগাস্ট-এর দিন মুসলিম লিগের সভার ছবি আঁকতে গিয়েও। পরন্তু সেই সভার বর্ণনা এক জনজাগরণের ইঙ্গিতবহ হয়ে উঠেছে তাঁর স্মৃতিকথায় — ''উপরে উঠে — যে দৃশ্য দেখা গেল তা ভোলার নয়। জীবনের বেশি দিন তখন পর্যন্ত না দেখলেও সেই জীবনে এমন আর কিছু দেখিনি। চারিদিকে মানুষ ছাড়া আর কিছুই নেই, যাকে বলে একেবারে জনসমুদ্র।''[80]

দেশভাগ হওয়ার পরেও যে সকল হিন্দুরা পূর্ববাংলাতেই থেকে গেলেন তেমনই একজন অধুনা বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত বিচারবিভাগের বিচারক দীনেশ চন্দ্র দেবনাথ। সংখ্যালঘু হিসেবে পাকিস্তানী আমলে তাঁর স্মৃতি বড়ই কঠোর। সংখ্যালঘুর সত্তাপরিচয়ের সংকট তাঁর স্মৃতিলেখাটিকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। বর্ণহিন্দু গোষ্ঠীর অন্তর্গত হওয়া সত্ত্বেও, নিজেকে তিনি ওই গোষ্ঠীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিম্নবর্গীয়দের সঙ্গে একাত্মতা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। নিজ গ্রামের সুদর্শন ব্রাহ্মণ শিক্ষক সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য এ বিষয়ে উল্লেখ্য — ''সেই সময়ে একটি ভালো স্কুলে হেডমাস্টারি করা সম্ভবত খুব সম্মানের কাজ ছিল, তা না হলে চক্রবর্তী মশায় এমএ পাস করে

আর্যসুলভ চেহারা নিয়ে এই অনার্য অঞ্চলে কেন হেডমাস্টারি করতে আসবেন!"[81] উচ্চবর্গীয় হিন্দুর অবজ্ঞা ও মুসলমান ও নিম্নবর্গীয়দের অপমানবোধ সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন বলেই ইসলামিক রাষ্ট্রে টিঁকে থাকার প্রচেষ্টায় তাঁর পরবর্তী জবাবদিহি — ''... জমিদার তালুকদার শ্রেণীর মানুষ চলে যাচ্ছেন তার সঙ্গত কারণ আছে, এ যাবৎ তাঁরা ইংরেজ ছত্রছায়ায় নিজেদের খুশিমতো প্রজাশাসন করেছেন, প্রয়োজনে জুলুমও করেছেন, এ জুলুমের বদলা নেওয়া হতে পারে আশঙ্কায় তাঁরা চলে যাচ্ছেন। চাকরিজীবী বাবুদের অনেকেই কলকাতা অঞ্চলে আগে থেকেই বিভিন্ন চাকরির উচ্চপদে আছেন, ..."[82] দেশভাগের পর পূর্বপাকিস্তানে আতঙ্ক ছিল তাঁর নিত্য সহচর। নিজ ধর্মীয় পরিচয় গোপন করে আত্মরক্ষার কথা পাই তাঁর স্মৃতিকথায় — ''এ বগির কারো কল্পনাতেও নেই যে তাদের মধ্যে একজন হিন্দু কালো কোট গায় দিয়ে প্যান্ট পরে বসে আছে। বগির পাশ দিয়ে মিঠাইঅলা অনবরত মিঠাই, মিঠাই চাই বলে হাঁকছিলো। আমি জানতে চেয়েছিলাম। মিঠাই যে খাব, ভালো পানি আছে কিনা। মিঠাই খাওয়ার আমার কোনো প্রয়োজন ছিলো না, প্রয়োজন ছিল পানি কথাটা বার বার বলার।"[83] নতুন সৃষ্ট মুসলমান রাষ্ট্রে নাগরিকের অধিকার বারংবার এইভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তাঁর স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, দেশভাগের পর থেকে প্রতি বছর ডাকাতি হয়েছে তাঁদের বাড়িতে, নিঃস্ব হয়ে গেছেন তিনি ও তাঁর পরিবার। হাসান আজিজুল হককে যেমন পাকিস্তানী ডিগ্রীর কারণে অর্থনৈতিক অবরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, দীনেশবাবুর জীবনেও প্রায় অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল। তাঁর স্মৃতিকথায় তিনি জানিয়েছেন, সাম্প্রদায়িক বলে দাগিয়ে দিয়ে পাকিস্তান সরকার তাঁর ন্যায্য প্রমোশন আটকে দিয়েছিল। তাঁর সম্পত্তি, বৃত্তি তথা ধর্মীয় আত্মপরিচয় এতটাই অরক্ষিত ছিল সেই সময়ে। খান সেনাদের কাছ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য সাময়িকভাবে তিনি ইসলামধর্মও গ্রহণ করেন। এতদ্‌সত্ত্বেও মাটির টান তাঁর এত প্রবল, ভারতের নাগরিকত্ব গ্রহণ করার কথা তিনি ভাবেননি। তাঁর কাছে 'দেশ' হল পূর্ববঙ্গ — এক্ষেত্রে শামসুর রাহমানের সঙ্গে তাঁর কোনো প্রভেদ নেই। কলকাতায় চাকরির ইন্টারভিউ দিতে এসেছিলেন তিনি দেশভাগের পূর্বে। তাঁর সেইসময়কার ঘটনার স্মৃতিচারণ — ''... আমাকে দেশের মানুষ পেয়ে সম্ভবত ঐ দিকটির দিকে তাঁর খেয়াল ছিলো না। বিদেশে দেশের মানুষের কাছে দেশের মানুষের আন্তরিক হওয়ার একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে।"[84] তাঁর দেশের

সীমা ও বিদেশের পরিসর উক্ত সংজ্ঞায় স্পষ্ট। আধুনিক রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ইত্যাদি দিয়ে এই আবেগকে ব্যাখ্যা করা দুরূহ। পরিচিত পরিবেশ, পরিস্থিতি থেকে তিনি বিচ্যুত হতে চাননি। কারণ দেশভাগের পরবর্তী সময়ের সত্তার সংকট ছিল তাঁর 'ঘরে'র সমস্যা, বাইরের অপরিচয়ের রাষ্ট্র ভারতে তিনি নিরাপত্তার আশ্রয় লাভ করতে চাননি।

পূর্বপাকিস্তানে দেশভাগের অব্যবহিত পরেই জাতিসত্তা নির্মাণ ও নির্ধারণের ক্ষেত্রে মেয়েরা বিভিন্নভাবে সাংস্কৃতিক আন্দোলন সংগঠিত করে। সাইদা খানম নারী পরিচালিত 'বেগম' পত্রিকা সম্পর্কে লিখেছেন — ''দেশ বিভাগের পর 'বেগম' পত্রিকা কলকাতা থেকে ঢাকায় চলে আসে। বেগম ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এখানে অনুষ্ঠিত হতো সাহিত্য সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ... ভাষা আন্দোলনের সময় বেগম পত্রিকার অফিস ছিল আন্দোলনের একটা কেন্দ্র।''[85] পূর্ব পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে সনজীদা খাতুন অন্যতম প্রধান নাম। সনজীদা লিখেছেন — ''সংস্কৃতির যথার্থ চর্চায় মানুষের চেতনার উৎকর্ষ ঘটে একথা পাকিস্তানিরা জানতো। তাই বিভিন্ন পথে দেশীয় ঐতিহ্য অনুসারী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিরোধিতা করেছে তারা।...

... দেশব্যাপী এই প্রতিকূলতার মধ্যে ছায়ানট প্রতিরোধ দিয়ে গেছে বহুদিন।''[86] 'ছায়া নট' সনজীদা খাতুনের পরিচালনায় গড়ে ওঠা সাংস্কৃতিক সংস্থা। সংস্থাটির কার্যপ্রণালী সম্পর্কে সনজীদা লিখেছেন — ''সংগঠনের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রেরণা হলেও ছায়ানট সঙ্গবদ্ধ হলো সমগ্র বাঙালি সংস্কৃতির উজ্জীবন ও প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে চলার জন্য। এতদিন শাসককুল অত্যন্ত বক্রভাব নিয়ে রবীন্দ্রনাথের গান পর্যন্ত কোনরকমে সহ্য করে আসছেন। বিদ্যাপতির গান দ্বিজেন্দ্রলাল অতুলপ্রসাদ রজনীকান্ত প্রমুখ গীতিকারের গান যে চলতে পারে আর এ দেশের ঐতিহ্য বলে স্বীকৃত হতে পারে — এ কথা ভাবা যেত না এতকাল।''[87] নারীর এই অগ্রগমনে আক্রমণ এসেছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ থেকে — কখনো বিদেশি শাসকের বেশে আবার কখনো দেশীয় বন্ধুদের ছদ্মবেশে। সনজীদার ছাত্রীরা তাকে সিঁদুরের টিপ দিয়ে সাজিয়ে দেওয়ার কারণে অথবা পালদের তৈরি শিল্পকর্ম বাড়িতে রাখার কারণে পাকিস্তানি শাসকরা তাঁর আচরণ বিধর্মীদের তুল্য মনে করে তাঁকে প্রায় নজরবন্দি করে ফেলে। আবার অন্যদিকে দেশীয় পুরুষদের দিক থেকে নারীর অগ্রগমনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয় আর একভাবে। সাইদা খানম লিখেছেন — ''পূর্ব

পাকিস্তান আমলের কথা। সেই সময়ে দুই বাংলার সাহিত্যিকদের লেখা নিয়ে আমার একটা সংকলন বের করবার ইচ্ছা ছিল।... ঢাকায় ফিরে এসে এখানকার সাহিত্যিকদের কাছে যখন লেখা চাইলাম তারা যেমন উৎসাহ দেখালোইনা, বরং বইটা যাতে বের করতে না পারি সেজন্য নওরোজ কিতাবিস্তানকে বাগড়া দেয়। তারা বলেন ও আবার কী বই বের করবে?"[৪৪]

এই ভাবেই দেশভাগের স্মৃতিচারণায় নারী নিজের জন্য এক মুক্ত পরিসর নির্মাণ করে নিয়েছে ও জাতীয়তাবাদের পরিসরে নিজেদের সক্রিয় ভূমিকাকে নির্দিষ্ট করেছে। তাঁরা পুরুষ নির্মিত নির্দিষ্ট অবস্থানে আবদ্ধ থাকতে চায়নি। নারী নিজেকে সমন্বয়ের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছে। সনজীদা খাতুন বা সাইদা খানমের লেখায় তাই সীমানার বেড়াজালকে উপেক্ষা করে দুই বাংলার সাংস্কৃতিক স্রোতধারার অনাবিল স্বচ্ছন্দ প্রবাহ বয়ে গেছে। এই স্বচ্ছন্দ প্রবাহ থেকে একটি সত্যই ধরা পড়ে, বাঙালি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে 'দিত্বকে' তাঁরা মানেননি। তাই এক সম্পূর্ণতা বোধের প্রকাশ তাঁদের লেখায়।

একসময়ে পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ববঙ্গীয়দের সঙ্গে নিজেদের অবস্থানগত ফারাক নির্মাণ করেছিল শুদ্ধ-অশুদ্ধ বাঙালিত্বের ধারণা দ্বারা। বাঙালি জাতীয়তাবাদের কারণে শুদ্ধ-অশুদ্ধ বাঙালিত্বের ধারণা পুনরায় প্রান্তীয় করে দিল কিছু মানুষকে। মঈন আহমদের স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায় — ''স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন আমরা মোহাম্মদপুরে থাকা অবস্থায় যে লাঞ্ছনার মধ্যে পড়লাম তা হলো উর্দুভাষীরা আমাদের বাবা বিহারী মা বাঙালি বলে টিটকারি করত। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার প্রাক্কালে আমরা গৃহছাড়া হয়ে প্রাণ রক্ষার্থে আমার ছোট খালু শিশুসাহিত্যিক চৌধুরী আব্দুর রহমানের সঙ্গে বাংলা একাডেমির প্রাঙ্গণে আশ্রয় গ্রহণ করি। বিহারির বাসগৃহ মনে করে মুক্তিবাহিনীর একদল বাড়িটা তাদের দখলে নিয়ে নেয়। আমরা দ্বিতীয়বার বাস্তুহারা হয়ে গেলাম।"[৪৯] এখান থেকেই স্বাধীন বাংলাদেশে সত্তা-পরিচয় সংক্রান্ত পরবর্তী প্রশ্নটি তৈরি হয়। সদ্য স্বাধীন ভূখণ্ডের লোকেরা কি বাঙালি? অথবা বাংলাদেশি? বাঙালি পরিচয়কে রাষ্ট্র পরিচয়ের সঙ্গে এক করে ফেললে সমস্যা তৈরি হয় তখনই। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কোনো বিশেষ ধর্ম বা ভাষাকে জাতীয় পরিচয় করে তোলা এক ধরনের স্ববিরোধিতা। কারণ এর ফলে প্রান্তিক হয়ে যায় রাষ্ট্রে বসবাসকারী অবাঙালিরা, উপজাতীয়রা। এক্ষেত্রে আরেকটি দিকও লক্ষণীয়, যে বাঙালি

সংস্কৃতিকে অবলম্বন করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে মধ্যবিত্তরা রূপ দিয়েছিলেন, তা কিন্তু একেবারেই নাগরিক এলিট সংস্কৃতি। যে ভাষাকে তারা প্রমিত বাংলা হিসাবে গ্রহণ করলেন তার ভিত কলকাতার রাঢ়ী বাংলা। এক্ষেত্রে ধর্মপরিচয় থেকে তাঁরা বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। পাকিস্তানি আমলেই ভাষার মধ্যে অহেতুক আরবি ফারসি শব্দের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। শামসুর রহমান লিখেছেন — ''কোনও কোনও ক্ষেত্রে আরবি ফারসি শব্দের ব্যবহার করা যেতেই পারে। ... অনর্থক প্রত্যেকটি বাক্যে জোরজবরদস্তি করে বিদেশি শব্দের ব্যবহার কোন সুস্থ মস্তিষ্কের ব্যক্তি করতে পারে না।''[90] কিন্তু এক্ষেত্রে বাংলাদেশে অপর যে প্রশ্নটি মূল্যবান হয়ে ওঠে পার্শ্ববর্তী দেশের ''বাঙালি''দের থেকে স্বতন্ত্র সংস্কৃতি পরিচয় গড়ে উঠবে কিভাবে? সুতরাং সত্তাপরিচয় নির্মাণের ক্ষেত্রে অধুনা বাংলাদেশের মানুষ সংশয় উত্তীর্ণ হতে পারেনি আজও।

দেশভাগ যে আত্মপরিচয় রাজনীতির ফল, দেশভাগের এতবছর পরেও ভারত উপমহাদেশে সেই রাজনীতি সমানভাবে সক্রিয়। কখনও ধর্ম, কখনও ভাষা, কখনও আরও ভিন্নতর কিছু সাংস্কৃতিক চিহ্নকে অবলম্বন করে আমরা / ওরা বিভেদীকরণ ও অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা আজও ভারতীয় উপমহাদেশকে, সেই উপমহাদেশের মানুষকে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সংকটের মধ্যে রেখে দিয়েছে। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যযুগীয় সমান্তরাল সহাবস্থান ও পারস্পরিক আদান-প্রদান পরিবর্তিত হয়ে গেছে আধুনিক প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতার রাজনীতিতে। কিন্তু সংস্কৃতির প্রবহমানতাকে রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমা অথবা কোনপ্রকার গোষ্ঠীবদ্ধ আন্দোলন স্তব্ধ করে দিতে পারে না — সে সত্যও অনস্বীকার্য। বলা যায়, সেই সত্য-ই বারংবার জেরা করে আত্মপরিচয় কেন্দ্রিক সকল প্রকার অনুমান ও সিদ্ধান্তকে। সেই কারণেই দেশভাগের কাহিনি আজও আমাদের কাছে এতটা মূল্যবান।

তথ্যসূত্র

1. Benedict Anderson, *Imagined Communities,* Verso / New Left Books, Uk / USA, 1991, p-7

2. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার-দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ-বছর,* খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ২০১৩, পৃ-১২৫

3. তদেব, পৃ-৫

4. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী,* দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৩, পৃ-২৩

5. তদেব, পৃ-৫৫

6. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার-দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর,* খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ২০১৩, পৃ-২৩৪

7. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী,* দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৩, পৃ-৩৫-৩৬

8. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার-দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর,* খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ২০১৩, পৃ-১৩১

9. তদেব, পৃ-২৩৪

10. তদেব, পৃ-১২২

11. তদেব, পৃ-১২২

12. তদেব, পৃ-২৩১

13. তদেব, পৃ-২৩১

14. তদেব, পৃ-২১৬

15. আবুল হোসেন, *আর এক ভুবন,* অবসর, ঢাকা, ২০০৫, পৃ-২৯

16. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী,* দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৩, পৃ-৭৭

17. তদেব, পৃ-৭৮

18. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার-দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর,* খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ২০১৩, পৃ-১৯৯

19. তদেব, পৃ-২২১

20. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী,* দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৩, পৃ-৭৯

21. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার-দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর,* খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ২০১৩, পৃ-২০০

22. তদেব, পৃ-২০১

23. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী,* দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৩, পৃ-৮২

24. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার-দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর,* খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ২০১৩, পৃ-২০

25. আবুল হোসেন, *আর এক ভুবন,* অবসর, ঢাকা, ২০০৫, পৃ-৭৫

26. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী,* দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৩, পৃ-২১৪-২১৫

27. তদেব, পৃ-২২৮-২২৯

28. তদেব, পৃ-২২৬

29. তদেব, পৃ-১৪২

30. তদেব, পৃ-৪৭

31. তদেব, পৃ-১৯১

32. তদেব, পৃ-১৪৫

33. তদেব, পৃ-২৩৪

34. শামসুর রাহমান, *কালের ধুলোয় লেখা*,প্রতিভাস, কলকাতা, ২০০৮, পৃ-৩৮

35. তদেব, পৃ-৮৪

36. তদেব, পৃ-৮৬

37. তদেব, পৃ-৩০-৩১

38. তদেব, পৃ-১৯৮

39. তদেব, পৃ-৩৫

40. তদেব, পৃ-৯৯

41. তদেব, পৃ-৮২

42. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ''মেঘদূত'', *প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চমখণ্ড*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯৭৪, পৃ-৫০৯

43. হাসান আজিজুল হক, ''ক্রমাগত আত্মখণ্ডন'', *দেশভাগ বিনাশ ও বিনির্মাণ*, সম্পা- মধুময় পাল, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১১, পৃ-১৩৩

44. তদেব, পৃ-১২৫

45. তদেব, পৃ-১২৬

46. তদেব, পৃ-১২৬

47. তদেব, পৃ-১২৬

48. তদেব, পৃ-১৩৪

49. হাসান আজিজুল হক, ''হারানো দেশ-কালের কথা'', *পশ্চিম থেকে পূর্ববঙ্গ দেশবদলের স্মৃতি*, সম্পা-রাহুল রায়, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১৫, পৃ-৫৩

50. তদেব, পৃ-৫২

51. তদেব, পৃ-৫৫

52. হাসান আজিজুল হক, ''ক্রমাগত আত্মখণ্ডন'', *দেশভাগ বিনাশ ও বিনির্মাণ*, সম্পা- মধুময় পাল, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১১, পৃ-৮৬

53. তদেব, পৃ-১২৭

54. মোবারক হোসেন, ''কদম্বগাছি না যশোহর, কোন্‌টা ঠিকানা'', *দেশভাগ বিনাশ ও বিনির্মাণ*, সম্পা- মধুময় পাল, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১১, পৃ-৮৬

55. তদেব, পৃ-৮৯

56. তদেব, পৃ-৮৯

57. আবু রুশ্‌দ্‌, *আত্মজীবনী*, এ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ-১০৫

58. তদেব, পৃ-১০৩-১০৪

59. তদেব, পৃ-১৪৬

60. তদেব, পৃ-১০৪

61. তদেব, পৃ-১০৯

62. আবুল হোসেন, *আর এক ভুবন*, অবসর, ঢাকা, ২০০৫, পৃ-১১

63. তদেব, পৃ-১৪

64. তদেব, পৃ-১৫

65. তদেব, পৃ-২৬

66. তদেব, পৃ-৮২

67. হায়াত মামুদ, ''দেশটাকে কখনও বিদেশ মনে হয়নি'', *পশ্চিম থেকে পূর্ববঙ্গ দেশবদলের স্মৃতি*, সম্পা-রাহুল রায়, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১৫, পৃ-৬৫

68. বুলবন ও সমান, ''সাবধান, ওরা সজনেফুল হয়ে আসছে গো'', *পশ্চিম থেকে পূর্ববঙ্গ দেশবদলের স্মৃতি*, সম্পা-রাহুল রায়, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১৫, পৃ-৬৫

69. রুবেয়া মঈন, ''নখফুলে শৈশব'', *পশ্চিম থেকে পূর্ববঙ্গ দেশবদলের স্মৃতি*, সম্পা-রাহুল রায়, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১৫, পৃ-৯৫

70. আবুল হোসেন, *আর এক ভুবন*, অবসর, ঢাকা, ২০০৫, পৃ-৩৩

71. তদেব, পৃ-৩৪

72. হায়াত মামুদ, ''দেশটাকে কখনও বিদেশ মনে হয়নি'', *পশ্চিম থেকে পূর্ববঙ্গ দেশবদলের স্মৃতি*, সম্পা-রাহুল রায়, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১৫, পৃ-১০২

73. Benedict Anderson, *Imagined Communities,* UK / USA, Verso / New Left Books, 1991, p-28

74. শামসুর রাহমান, *কালের ধুলোয় লেখা*, *প্রতিভাস*, কলকাতা, ২০০৮, পৃ-১৭২

75. Benedict Anderson, *Imagined Communities,* UK / USA, Verso / New Left Books, 1991, p-28

76. সন্‌জীদা খাতুন, *স্বাধীনতার অভিযাত্রা*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭, পৃ-৭১-৭২

77. আবুল হোসেন, *আর এক ভুবন*, অবসর, ঢাকা, ২০০৫, পৃ-৩০

78. তদেব, পৃ-৩২

79. বদরুদ্দীন উমর, ''দেশভাগ এবং কিছু স্মৃতি'', *পশ্চিম থেকে পূর্ববঙ্গ দেশবদলের স্মৃতি*, সম্পা-রাহুল রায়, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১৫, পৃ-১৭৯

80. তদেব, পৃ-১৬৯

81. শ্রী দীনেশ চন্দ্র দেবনাথ, *কত কথা কত স্মৃতি*, শুদ্ধস্বর, ঢাকা, ২০১০, পৃ-১৯

82. তদেব, পৃ-১১৬

83. তদেব, পৃ-১৩০

84. তদেব, পৃ-৯৯

85. সাইদা খানম, *স্মৃতির পথ বেয়ে*, যুক্ত, ঢাকা, ২০১৩, পৃ-৪৯

86. সন্‌জীদা খাতুন, *স্বাধীনতার অভিযাত্রা*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭, পৃ-১০০

87. তদেব, পৃ-৯২

88. সাইদা খানম, *স্মৃতির পথ বেয়ে*, যুক্ত, ঢাকা, ২০১৩, পৃ-৯৪

89. মঈন আহমদ, ''যুদ্ধটা যদি পাঁচদিন পরে হত'', *পশ্চিম থেকে পূর্ববঙ্গ দেশবদলের স্মৃতি*, সম্পা-রাহুল রায়, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১৫, পৃ-১২৮-১২৯

90. শামসুর, রাহমান, *কালের ধুলোয় লেখা*, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০০৮, পৃ-১৫৫

স্মৃতি ও সৃজন

স্মৃতিকথা ইতিহাসচর্চার প্রাথমিক আকর হলেও এটি একটি শিল্পরূপও বটে। ইতিহাসের সঙ্গে স্মৃতির সম্পর্ক কি — সে বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু একথাও অনস্বীকার্য স্মৃতিকথার ভিতরে থাকে শিল্পস্বভাব। অন্যদিকে থাকে স্মৃতিকথার বস্তু উপাদান। বর্ণিত বিষয় ও বর্ণনাভঙ্গি — এই দুই অন্বিত হয়েই একটি নির্মাণ গড়ে ওঠে। উত্তর আধুনিক সময়ের ভাবনা অনুযায়ী যেকোন লেখাই প্রকৃতপক্ষে ভাষাব্যবস্থা। সুতরাং যেকোন লেখা — এমনকি স্মৃতিলেখাতেও বিষয়বস্তু বচনের মাধ্যমেই শিল্পিত রূপে ধরা দেয়। অর্থাৎ স্মৃতির কাজ যান্ত্রিক, নিষ্ক্রিয় বর্ণনামাত্র নয়, তার বচন অনেকগুলি পরিসর যুক্ত হয়ে নির্দিষ্ট রূপ পায় এবং এইভাবেই স্মৃতিলেখা হয়ে ওঠে সৃজন। বিবিধ প্রেক্ষিত ও পরিসর, অর্থাৎ স্থান ও কাল; আবার ব্যক্তিভেদে শ্রেণি, জাত, লিঙ্গ, পেশা, বর্ণ প্রভৃতি বচনকে প্রভাবিত করে এবং এইভাবে স্মৃতিচারণ করছেন যিনি সেই কর্ত্তৃরূপের সামাজিকীকরণ ঘটে যায়। এইভাবে স্মৃতিলেখাকে দেখলে সত্য প্রতিফলনের দায়বদ্ধতাকে অস্বীকার না করেও তাকে সৃজনশীল লেখার পর্যায়ভুক্ত করে ফেলা যায়।

সৃজনশীলতার সঙ্গে অন্বিত থাকে কল্পনা। আবার অন্যদিকে স্মৃতিচারণাকে তো ইতিহাসকাররা অতীতের সাক্ষ্য হিসেবেই বুঝতে চেয়েছেন। সাক্ষ্য তো বাস্তবের উপর নির্ভরশীল। বাস্তবের পরিপূর্ণতা স্মৃতিলেখার মাধ্যমে পুনঃ উপস্থাপিত হবে এটাই প্রত্যাশা। তাহলে স্মৃতিলেখা যদি বাস্তবের কাছে এতটাই দায়বদ্ধ হয় যে স্মৃতিচারণা কোন প্রেত-বাস্তবতাকে যান্ত্রিকভাবে বর্ণনা করে চলে, তাহলে সেক্ষেত্রে লেখাটি সৃজনশীলতার পরিসরটিকে হারিয়ে ফেলে। কিন্তু একটু ভাবলেই বোঝা যায়, স্মৃতিলেখা যখন অতীতের পুনঃ উপস্থাপন, তখন তা প্রকৃতপক্ষে পুনর্নির্মিতি। আবার অন্যদিকে নিছক সাক্ষ্যদান ধারণাটিও কোন না কোনভাবে অনুপস্থিত অতীতকেই পুনর্নির্মিত করে। কারণ সাক্ষ্য বস্তুতঃ সেই ঘটনাকেই জীবন্ত করে, যা কর্তৃকারকের স্মৃতিচারণার ‘বর্তমানে’ অনুপস্থিত, যাঁরা পাঠক বা শ্রোতা, তাদের কাছেও অনুপস্থিত। সুতরাং অনুপস্থিতির নির্মাণ স্মৃতিচারণাকে — তা ইতিহাসের সাক্ষ্যদান হলেও, আখ্যানধর্মী করে তুলতে পারে। বলাবাহুল্য, এই নির্মাণ ঘটে বিভিন্ন প্রেক্ষিত ও পরিসরের

বাচনভঙ্গির সমবায়ে।

আবার অন্যদিকে কাহিনিনির্ভর সংরূপ ছোটগল্পকে ধরে নেওয়া হয় তা বাস্তব নয়, কল্পনানির্ভর। কিন্তু কাহিনিকে বাচনিক পরিসরে এমনভাবে মূর্ত করা হয় যে তাকে বাস্তব হিসেবে প্রতীতি সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তা থাকে। কাহিনি কল্পিত হতে পারে, কিন্তু সামাজিক ভাষাকাঠামোর মূর্ততা তাকে 'বাস্তব' করে তোলে। সেইকারণেই স্মৃতিচারণ — যার দাবি বাস্তব উপস্থাপনের, এবং কাহিনি — যার সেই দাবি নেই; এ দুয়ের ভিতর এক চিত্তাকর্ষক টানাপোড়েন তৈরী হয়।

স্মৃতিলেখার ভিতর আখ্যান বোনা হয় বিভিন্ন ভঙ্গিতে। মিহির সেনগুপ্তর 'বিষাদবৃক্ষ' গ্রন্থটিতে তাঁর অতীত-বাস্তবতার বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে আসে, সমাজতাত্ত্বিক, ইতিহাসভিত্তিক আলোচনা। এমন নয় যে এই গ্রন্থটির কাহিনি অংশ টুকরো টুকরো ঘটনার সমাহার — যা সময়ের পর্যায়ক্রমিক ধারাকে ভেঙে দেয়। পরন্তু উত্তমপুরুষের ব্যক্তিগত কাহিনি আখ্যানের প্রথাসিদ্ধ চলন মেনে এগিয়ে গেছে অতীত থেকে সামনে — মিহিরের জন্মপূর্বের পিতামাতা ও পিছারার খালের সমৃদ্ধির বহুপূর্ব অতীত থেকে তাঁর শৈশব ও যৌবনপ্রাপ্তি ও পিছারার খালের ক্রমশঃ গৌরব হারিয়ে ফেলার অগ্রবর্তী সাম্প্রতিক অতীতের দিকে। এরই মাঝে এসেছে পিছারার খাল সংক্রান্ত আরও বহুমানুষের টুকরো জীবনকাহিনি — যা পিছারার খালের ধ্বংসকে তাৎপর্যময় করে তোলে। স্মৃতিচারণার এই ধারাটিকে মাঝে মাঝেই কেটে দিয়েছে মিহিরের পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ, আলোচনা। বিচিত্র সংরূপ গ্রন্থটিকে অতীত স্মৃতিচারণার কাহিনিনির্ভর একটি সন্দর্ভতে পরিণত করেছে। কাহিনিরূপ ও প্রবন্ধরূপ একত্রে সম্পন্ন করেছে মিহিরের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটিকে। মিহির তাঁর দেশভাগের ও দেশত্যাগের কাহিনিকে বিষাদময় ও আবেগময় করে তুলতে চেয়েছেন, অন্যদিকে একইসঙ্গে তার সত্যতা প্রমাণ করার কাজও করতে চেয়েছেন। সেই কারণেই স্মৃতিচারণায় কাহিনির সঙ্গেই সম আধিপত্যবিস্তার করেছে জ্ঞানতাত্ত্বিক ভাষাভঙ্গিমার নিজস্ব পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণগুলি। দেশহীন উদ্বাস্তু হিসেবে ভারতে আসার পর পূর্বপাকিস্তানের সংখ্যালঘু হিসেবে অসহায়ত্বের স্মৃতিচারণার উপরোক্ত ভঙ্গিটি অনিবার্য হয়ে উঠেছিল এদেশে তাঁর অস্তিত্বকে অবাঞ্ছনীয়তার তকমা সরিয়ে সুদৃঢ় করে তোলার জন্য।

সুনন্দা সিকদারের 'দয়াময়ীর কথা' গ্রন্থটিতে আবার ছোট ছোট কাহিনি ও বর্ণনা আবেগের অনুষঙ্গে প্রাণময় হয়ে উঠেছে। তাঁর স্মৃতি দেশত্যাগ, মৃত্যু অথবা দারিদ্র্যের হতে পারে, কিন্তু ভঙ্গিটি মায়াবী। কোন প্রবন্ধধর্মী আলোচনা আখ্যানধর্মীতাকে ব্যাহত করেনি অথবা দূরত্ব তৈরী করে নি। পরন্তু ভাষাভঙ্গিমার আন্তরিকতা ও বিবেকী ঘনিষ্ঠতাই পাঠ-প্রতিক্রিয়ার ভাললাগাকে তৈরী করে। তাঁর নিজ গ্রামজীবন এবং তার সঙ্গে তাঁর দেখা গ্রামসম্পর্কের বিভিন্ন মানুষের টুকরো কাহিনি আখ্যানের বহুবাচনিক বুনোট তৈরী করেছে। তাঁর স্মৃতিতে আছে তাঁর পিসির গল্প, ভুলি পিসিমার গল্প, আজম-মাজমের কথা, 'রিপুচি' সমসের চাচা ও আজগরচাচার নতুন দেশে মিশে যাওয়ার আখ্যান, রিফুইজি নারী রহিমা বিবির তিনমুষ্টি মাটি নিয়ে চোখের জলে গ্রামত্যাগের কাহিনি, আইলাকেশির অন্ধকারের লজ্জার জীবন ও মায়ের মৃত্যুর গল্প। এরকম অজস্র মানুষের গল্প তিনি বলেছেন; পূর্ববাংলার গ্রামের মানুষের জীবনআলেখ্যকে বিস্তার দেওয়ার জন্য। তাঁর আখ্যানের গতি নদীর মত নয়, সময়ের ধারাবাহিকতা মেনেও মানতে চায় না। যেন আদিগন্ত প্রসারিত ভূমিতে পূর্ববঙ্গের মুসলমান ও নিম্নবর্গীয় জনজীবনের বিচিত্র কার্নিভাল — টুকরো, বিচ্ছিন্ন অথচ একই তলে ঘটে যাওয়া। এই উপস্থাপনা পূর্ববাংলার মুসলমান ও নিম্নবর্গীয় মানুষদের সঙ্গে তাঁর আত্মার সম্পৃক্ততাকে বোঝায় যা উচ্চবর্গীয় মিহিরের বিষণ্ণতাবাদী একবাচনিক আখ্যানের কেন্দ্রকে ভেঙ্গে ফেলতে চায়।

মিহির সেনগুপ্তর স্মৃতিকথা সচেতনভাবে বিশ্লেষণধর্মী সন্দর্ভ হয়ে উঠতে চেয়েছে। কিন্তু সুনন্দা সিকদারের স্মৃতিকথার আখ্যান বুননে আছে একধরনের ঘরোয়া মেজাজ। অথচ তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনের সঙ্গেই সেই অভিজ্ঞতার সমাজ-প্রেক্ষিতের একটি আলেখ্যও রচিত হয়। এই দুটি স্মৃতিকথাই কাহিনি বর্ণনার আদলটিকে বহু পরিমাণে অনুসরণ করেছে এবং তাঁদের স্মৃতিকথা সেই কারণেই কালানুক্রমিক তথ্যপঞ্জী হয়ে ওঠেনি। অধ্যাপক অলোক রায় বলেছেন — ''ইংরেজিতে অটোবায়োগ্রাফি ও মেময়ারসের মধ্যে সুস্পষ্ট ভেদরেখা লক্ষ্য করা যায়। আত্মজীবনী যেখানে একান্তভাবে ব্যক্তিনির্ভর, ... স্মৃতিকথা সেখানে সমাজনির্ভর, ...।''[1] যদিও সমাজনির্ভর স্মৃতির বয়ানে স্মরণকর্তার জীবন অথবা অভিজ্ঞতাকেও পাওয়া যায়। যেমন পেয়েছি মিহিরের অথবা সুনন্দার লেখায়। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'তেও আমরা রবীন্দ্রনাথকে পেয়ে যাই।

‘জীবনস্মৃতি’ ইতিহাস নয়, কিন্তু সেই লেখায় রবীন্দ্রনাথের বাল্যের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে তাঁর ব্যক্তিকথার বাইরেও বৃহত্তর জীবন ও সমাজের রূপ ধরা পড়েছে অত্যন্ত সৃজনশীল সরস ভাষাভঙ্গিমায়, আখ্যানের বুনোটে। স্মৃতিকথার বয়ানে সমাজনির্ভর বস্তুনিষ্ঠতার সঙ্গে ব্যক্তিনিষ্ঠতার ভারসাম্য রক্ষার বিষয়টি স্মৃতিকথা-ভাষ্যের নানারকম নকশা তৈরী করে। একটি ধারায় কাহিনি গ্রন্থণের আদলটি বচনের মধ্যে ধরা থাকে, আবার অন্য ধারাটি সেই আদলটিকে সচেতনভাবে এড়িয়ে গিয়ে তথ্যানিষ্ঠ ইতিহাস বর্ণনার আদলটিকে অনুসরণ করে। মিহির সেনগুপ্তর রচনাটি প্রবন্ধের বিশ্লেষণধর্মীতাকে আত্তীকরণ করেও কাহিনিধর্মী — তথ্যনিষ্ঠ বস্তুতান্ত্রিক লেখা নয়; যদিও তাঁর ইতিহাস সচেতনতা সংগুপ্ত থাকেনি উল্লিখিত লেখাটিতে। কিন্তু সেই ইতিহাসবোধ অবশ্যই ব্যক্তিনিষ্ঠ।

কিন্তু কোন কোন স্মৃতিচারণার নৈর্ব্যক্তিকতা লেখাটিকে তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাস রচনার সমধর্মী করে তোলে। যেমন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথায় মার্ক্সবাদী বুদ্ধিজীবী আন্দোলনের একটি ধারাবাহিক ঐতিহাসিক বিবরণ পাওযা যায়। এরকমই অপর একটি স্মৃতিকথা মুজফ্ফর আহ্মদের ‘আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি’ নামক গ্রন্থটি। গ্রন্থের ভূমিকাতে তিনি বলেছেন — ‘‘এই পুস্তকখানি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সম্বন্ধে আমার স্মৃতিকথা, কোনো অবস্থাতেই এ পুস্তক ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস নয়। তবে ইতিহাস লেখকেরা আমার পুস্তক হতে প্রচুর মাল-মশলা পাবেন। প্রচুর তথ্যের সমাবেশ আমি করেছি।’’[2] সুতরাং এইধরনের স্মৃতিকথা ইতিহাস না হয়েও তথ্যসমৃদ্ধ ও বস্তুনিষ্ঠ। বলা যেতে পারে বাচনভঙ্গিতে ব্যক্তিনিষ্ঠতা এই বর্ণনায় তুলনামূলকভাবে অনেক কম। কিন্তু গ্রন্থগুলি যেহেতু স্মৃতিকথা এবং বিশেষ ব্যক্তিরই স্মৃতি, সুতরাং ব্যক্তিকেও বাদ দেওয়া যায় না।

আবুল মনসুর আহমদের স্মৃতিগ্রন্থটি এরকমই একটি স্মৃতিগ্রন্থ। তাঁর লেখায় ব্যক্তিনিষ্ঠতার অনুপাত সুনন্দার স্মৃতিচারণার তুলনায় অনেক কম। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ছোট ছোট কাহিনির সমাবেশও কম। এমনকি মিহিরের গ্রন্থের সঙ্গে তুলনা করেও বলা যায়, মনসুর সাহেবের গ্রন্থটি কাহিনিনিষ্ঠ হতে চায়নি, ব্যক্তিগত জীবনকে সরিয়ে রেখে ইতিহাসনিষ্ঠ হতে চেয়েছে। কিন্তু সেই ইতিহাসনিষ্ঠ বস্তুতান্ত্রিক স্মৃতিচারণা ‘স্ব’ কে সরিয়ে রেখে নয়।

আহমদ সাহেবের স্মৃতিগ্রন্থটির নাম ‘‘আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশবছর’’। নামকরণই বুঝিয়ে দেয় তিনি দেশভাগ পূর্ব সময় থেকে দেশভাগ পরবর্তী সময়ের অনেকদিন পর্যন্ত রাজনীতির ইতিহাস বলবেন এবং অবশ্যই সেই ইতিহাস তাঁর নিজ অভিজ্ঞতায় যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, তাই তিনি লিখবেন। তাঁর গ্রন্থটি দেশভাগের ইতিহাস পাঠের ক্ষেত্রে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে গৃহীত হলেও একথাও অস্বীকার করা যায় না গ্রন্থের নামকরণে উত্তম পুরুষের ব্যবহারে ধরা পড়ে ইতিহাস গ্রন্থের নৈর্ব্যক্তিকতা এই স্মৃতিগ্রন্থটিতে ক্ষুণ্ণ হতে পারে, যদিও সাংবাদিক, আইন ব্যবসায়ী মনসুর সাহেব তাঁর স্মৃতিচারণার বাচনভঙ্গিকে যুক্তি পরম্পরায় সাজিয়েছেন, নিতান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরিধিকে প্রসারিত করে সমসাময়িক দেশ-কালের রাজনীতির প্রসঙ্গ তুলে আনতে চেয়েছেন নৈব্যক্তিক ভঙ্গিতে। সেই সকল রাজনীতির কথাকে তিনি এমন ভাবে সময়ের কালানুক্রমিকতার সঙ্গে টেনে নিয়ে গেছেন, যে গ্রন্থটি একটি জাতির আত্মনির্মাণ ও আত্মখণ্ডনের আখ্যানে পরিণত হয়েছে। আবার অন্যদিকে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিভাষ্য অনেক বেশি আবেগপ্রবণ, অনুভূতির গভীরতায় যান্ত্রিকতা বর্জিত ও বিবেকী উষ্ণতায় সমৃদ্ধ। মনসুর আহমদের মতো তা Monologic বা একস্বরীয় আখ্যান বুনোটে গড়ে ওঠেনি, পরন্তু পূর্ববঙ্গের মানুষের আত্মসত্তার রাজনীতির পরিবর্তনের ইতিহাসটি তাঁর গ্রন্থটিতে দ্বিবাচনিকতায় তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কবি শামসুর রাহমানের স্মৃতিকথার ভাষাবিন্যাস পেলব ও রোমান্টিক হয়ে উঠেছে স্বভাবতই। স্মৃতির কথা লিখতে গিয়ে প্রথানুগত আখ্যানধর্মিতাকে অনুসরণ করে সময় ক্রম অনুসরণ করেছেন, আবার সেই ফর্মকে ভেঙে ফেলে ফ্লাশব্যাক পদ্ধতি ব্যবহার করে পিছন দিকে ফিরে গেছেন। তাঁর স্মৃতিকথার অরাজনৈতিক শিল্পস্বভাব মূর্ত হয়ে ওঠে আখ্যানের মাঝে পর্যবেক্ষণ বা বিশ্লেষণের পরিবর্তে তাঁর একান্ত নিজস্ব গভীর অনুভূতির প্রগাঢ় প্রকাশে। এইভাবেই দেখবো, হাসান আজিজুল হকের দার্শনিক প্রজ্ঞা তাঁর স্মৃতির বচনকে বিশ্লেষণধর্মী করে তুলেছে, মনোরঞ্জন ব্যাপারীর নিম্নবর্গীয় ক্রোধ প্রকাশ পেয়েছে তাঁর অপভাষা ব্যবহারে, আখ্যান-নির্মাণে ক্ষমতাসীনদের নিষ্ঠুরতা বর্ণনার বাড়াবাড়িতে।

মনোরঞ্জন ব্যাপারীর মতই অপর দলিত লেখক যতীনবালার স্মৃতিচারণায় ক্রোধ না থাকলেও নির্মমতা অতি তীব্র। যতীনবালা শরণার্থী হয়ে তাঁদের পরিবারের শিয়ালদহ স্টেশনে

চলে আসার বর্ণনা করতে গিয়ে প্রায় একটি ছোটগল্পের প্যাটার্ন ব্যবহার করেছেন। তাঁর স্মৃতিকথা শুরু হচ্ছে এইভাবে — ''স্বভূমি থেকে উৎপাটিত মানুষ ভর্তি একটি গোটা ট্রেন শিয়ালদহ স্টেশনে এসে থামল। ছেঁড়া কাথা, শতচ্ছিন্ন ন্যাকড়া বাঁধা বোঁচকা বুঁচকি — ঘাড়ে মাথায় কাঁধে নিয়ে, খালি গা, খালি পা, ধুলোবালিতে ময়লা নোংরা কাপড় পরনে, অসংখ্য নরনারী শিশু বুড়োবুড়ি নামছে প্ল্যাটফর্মে।''[3] একটি বিশেষ ট্রেনের শিয়ালদহ স্টেশনে এসে থামার ঘটনা দিয়ে লেখাটি শুরু হয়ে পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের প্রত্যাশা সৃষ্টি করে। তারপর অসম্পৃক্ত থেকে ট্রেন থেকে যে উদ্বাস্তুরা নামলেন, তাঁদের নিয়ে একটি অনুপুঙ্খ বর্ণনার চিত্র অঙ্কণ। এরপর তিনি ঢুকে পড়েন তাঁর পরিবারের কাহিনিবৃত্তে — ''মাথায় বোঝা নিয়ে বড়দাদা জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছে, স্টেশন চত্বরে এ মাথা থেকে ও-মাথা।''[4] ক্রিয়ার কাল ব্যবহার কাহিনি রচনার ন্যায়। এই সংক্ষিপ্ত স্মৃতিকথায় তিনি বলেছেন তাঁদের পরিবারের উদ্বাস্তু জীবনের একটি ক্ষুদ্র সময়-পরিসরের ইতিবৃত্তান্ত। পূর্ববাংলার গ্রাম থেকে উৎপাটিত হয়ে তাঁরা এলেন এপার বাংলায়, আশ্রয়গ্রহণ করলেন শিয়ালদহ স্টেশনের প্লাটফর্মে, সেখানে খাদ্যের জন্য, একটু স্থানের জন্য তাঁর দুই দাদার জীবনযুদ্ধ, তারপর পরিবার ভাগ হয়ে তাঁরা চলে গেলেন দুটি পৃথক উদ্বাস্তু ক্যাম্পে। এইভাবেই সময়ের ধারাবাহিকতা মেনে তিনি কাহিনিবৃত্ত সাজিয়েছেন। কিন্তু উত্তমপুরুষে কাহিনি বর্ণনার সঙ্গেই তিনি চলে যান সর্বজ্ঞ কথকের বর্ণনা ভঙ্গিতে — যেখানে শিয়ালদহ স্টেশনে আশ্রয় পাওয়া উদ্বাস্তুদের মানবেতর নির্মম জীবনচিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে একের পর এক। সেই বর্ণনাতে যে সকল মানুষের ছবি তিনি আঁকেন, তাঁর শব্দব্যবহার ও বাচনভঙ্গি তাদেরকে 'ক্যারেকটার' হিসেবে গড়ে তুলেছে। যেমন — ''একজন পশ্চিমবঙ্গবাসী বাঙালি জামার নীচে পৈতে দেখিয়ে মারমুখী ধেয়ে এলেন। আমাকে ঠেলে দিয়ে বিকৃত মুখভঙ্গি করে বললেন, আরে পুরো আপদ, এখানে মরতে এলি কেন। ভাগ এখান থেকে। পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছিস, বেজন্মারা তাড়া খেয়ে এখানে মরতে এসেছে। থু-থু, যত-সব বেজাতের দল ছুঁয়ে দিলে রক্ষে নেই।''[5] অথবা ''পিসিমা অফিসারের হলদেটে মুখের দিকে তাকান, আর শোনেন তাঁর তীক্ষ্ণ কাঁপা ভাঙা স্বর। বুঝতে পারেন লোকটা একটা দুশমন। ওর মধ্যে দয়ামায়া নেই। উদ্বাস্তু মানুষের ওপর ওর রীতিমতো আমিরি ঘৃণা।''[6] এই অনুপুঙ্খ বর্ণনাভঙ্গি, সংলাপের ব্যবহার এবং মানস-গতি প্রকৃতির বিবরণ নিছক স্মৃতিচারণার কথনভঙ্গি নয়। ''ওর মধ্যে দয়ামায়া

নেই" এটি কথকের নয়, পিসিমার ভাবনা। এই ধরনের প্রতিবেদন বাক্যের ব্যবহার একেবারেই উপন্যাস-ছোটগল্পের কথনশৈলীর ন্যায়। কিন্তু অপর যে বিষয়টি লক্ষণীয়, লেখকের নিজস্ব স্বর অর্থাৎ নিম্নবর্ণীয় আত্মসচেতনতা ও পশ্চিমবঙ্গীয় উচ্চবর্ণের মানুষ ও প্রশাসনিক কর্তাদের প্রতি বিতৃষ্ণাও গোপন থাকেনি তাঁর বর্ণনায়। অর্থাৎ গল্পকার হয়ে উঠতে চাইছেন যতীনবালা, তথাপি তাঁর স্মৃতিচারণার বিশেষ অভিপ্রায়টি তাঁর সত্তাপরিচয়কে নির্দিষ্টভাবে চিনিয়ে দিয়েছে। এই অভিপ্রায়টিই অসহায় বিপর্যস্ত উদ্বাস্তু জীবনের খণ্ড খণ্ড ঘটনা ও বাচনভঙ্গিকে নির্মম করে তুলেছে — ''বাঁচতে তো হবে মানুষকে। বাঁচতে তো হবে। কটা চুলের মস্ত মাথা, খুদে চেহারার এক আধবুড়ো মানুষ দুহাতে ধরা ভাতের হাঁড়ি নিয়ে ভিড় ঠেলে হাঁটতে হাঁটতে বার দুই একই কথা উল্টে-পাল্টে বলছে আর জিভ দিয়ে ঠোঁটদুটি চাটছে। ... উস্ক-খুস্ক চুলে ভরা একমাথা চুল নিয়ে বেঁটেখাটো একটা মানুষ তাদের সামনে দাঁড়ালো। খালি পা; খালি গা মুখটা লম্বাটে, চোখদুটো মরচে ধরা ছেঁড়া ন্যাকড়া। এক টুকরো কাপড়ের ফালিতে বাঁধা টিনের থালায় কিছুটা খাবার।... ওরা ভাত খেতে বসলো আর পাশেই পড়ে আছে বে-আবরু উলঙ্গ মহিলার আধমরা শরীরটা।"[৭] এরকম অনেক উদ্বাস্তু মানুষের অর্ধমৃত, অনাহারী, নরকতুল্য জীবনের আখ্যান তিনি গেঁথে তুলেছেন তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নিরিখে, স্মৃতিকথা হিসেবে। নিষ্ঠুরতার এই বিবরণ বাংলাভাষায় রচিত দেশভাগ সংক্রান্ত সাহিত্যে বিরল। ছেড়ে আসা দেশগ্রাম নিয়ে উচ্চবর্ণের মধ্যবিত্ত মানুষের বিষাদাচ্ছন্ন মায়াবী আখ্যানের এক বিপরীত আখ্যান এইভাবে যতীনবালা প্রভৃতি দলিত লেখকদের স্মৃতিচারণায় তৈরী হয়েছে। বাচনের প্রতীকগুলি যেন সমস্ত রকমের বিবেকী অনুভবকে বিবমিষায় পরিণত করে, উচ্চবর্ণীয় আখ্যানের নৈতিকতার প্রশ্নগুলিকে ভেঙে ফেলতে চায়।

''দেশভাগ স্বাধীনতার গল্প সংকলন'' হিসেবে চিহ্নিত দেবেশ রায় সম্পাদিত 'রক্তমণির হারে' নামক গ্রন্থটি। দেশভাগকেন্দ্রিক গল্পের সঙ্গেই সংগৃহীত হয়েছে বুদ্ধদেব বসু রচিত 'নোয়াখালি' রচনাটি। সংকলনে এটি গল্প হিসেবেই গৃহীত। কিন্তু ভঙ্গিটি স্মৃতিচারণার। নোয়াখালি নামক জনপদটির বর্ণনা দিতে গিয়ে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদেই লেখক বললেন — ''খুব সবুজ, মনে পড়ে।"[৪] এটি লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের গল্প কিনা এ প্রশ্ন এখানে বাহুল্য — যদিও এটি

উত্তমপুরুষের বর্ণনা। গল্প হ'লেও মানুষের কথা এখানে নেই। স্মৃতিকথার আদলে লেখা গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্র নোয়াখালি। বুদ্ধদেব বসু প্রধানতঃ রোমাণ্টিক কবি! সুতরাং নোয়াখালির স্বপ্নভূমি তাঁর কাব্যিক বর্ণনায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। —'এমন কোন পথ ছিল না নোয়াখালির, যাতে হাঁটিনি, এমন মাঠ ছিল না যা মাড়াইনি, দূরতম প্রান্ত থেকে প্রান্তে, শহর ছাড়িয়ে, বনের কিনারে, নদীর এবড়োখেবড়ো পাড়িতে, কালো-কালো কাদায়, খোঁচা-খোঁচা কাঁটায়, চোরা-বালির বিপদে। ... শান্তাসীতার নীলাভ রেখাটি যেখানে শেষ হয়েছে, দিগন্তের সেই কুহক থেকে দেখা দিয়েছে আগুন-রঙের সূর্য, প্রথমে কেঁপে-কেঁপে, তারপর লম্বা লাফে উঠে গেছে আকাশে, বিস্তীর্ণ জলকে ঝলকে-ঝলকে লাল করে দিয়েছে।"[9] অপূর্ব সুন্দরী স্বপ্ন-রাজকন্যা নোয়াখালি অবশেষে ভ্রষ্টা হ'ল। ভয়ঙ্কর দাঙ্গাকে সরাসরি তুলে না এনে, লেখায় ব্যবহার করলেন অনুভবী কবিতার প্রতীক। কিন্তু নেতিবাচকতায় এ গল্প শেষ নয়, নোয়াখালিতে গান্ধীর প্রব্রজন ও তাঁর নিঃসঙ্গ একাকী মূল্যবোধের স্বর্গমহিমা ও নোয়াখালির জন্য বিনম্র প্রার্থনায় গল্প শেষ। গল্পটির শৈলী কাহিনি ও স্মৃতিচারণার টানা পোড়েনে, বাচনে ও প্রতীকে কাব্যধর্মীতা। এই বিশেষ ফর্মটি ব্যবহার করে লেখক নোয়াখালির দাঙ্গার পরে তাঁর অশ্রুসিক্ত বেদনাটিকে মুদ্রিত করে রাখলেন। স্বল্প কথা, অনতিদীর্ঘ বাক্য এই লেখায় — বস্তুতঃ দাঙ্গার ভয়াবহতা ও বেদনা অতিকথনের কোলাহলকে এড়িয়ে চলতেই চায়।

যতীনবালার নির্মম লেখার সঙ্গে 'নোয়াখালি'কে তুলনা করলে উচ্চবর্গ নিম্নবর্গের নৈতিক ও রাজনৈতিক পরিসরের পার্থক্যটি স্পষ্ট হয় আরও। বাসবী ফ্রেসার তাঁর একটি প্রবন্ধতে দেশভাগ বিষয়ক ছোটগল্প নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে 'মিলনভূমি' ও 'বিবাদভূমি' এই দুটি শব্দবন্ধ ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন — ''ভারতবর্ষের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষ নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক মেলামেশা ও আদানপ্রদান করবার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন যে মিলনভূমিতে, গত দুই থেকে তিনদশকের উপনিবেশবাদ বিরোধী প্রক্রিয়ায় তা ক্রমে পরিণত হল এক বিবাদ ভূমিতে, ...।"[10] প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সমান্তরাল সহাবস্থান ও পারস্পরিক আদান-প্রদান বিঘ্নিত হ'ল বিশ শতকে দেশীয়গণের স্বায়ত্ত শাসন লাভ করার পর। ভোটের রাজনীতি গোষ্ঠীর সম্পর্ককে প্রতিযোগিতামূলক করে তুলেছিল ক্রমশঃ। এরই চরম পরিণতি দাঙ্গা ও দেশভাগ।

পূর্বদিকের দেশবিভাগ বিষয়ক উচ্চবর্গীয়দের লেখাগুলি — স্মৃতিকথা অথবা ছোটগল্প-উপন্যাস — উভয়ক্ষেত্রেই, ঝোঁক মূলতঃ মিলনভূমির সন্ধানের দিকে। বুদ্ধদেবও সেই মিলনভূমিকে রূপ দিতে চেয়েছেন কাব্যধর্মী প্রতীকের মাধ্যমে, অন্যদিকে যতীনবালার লেখায় দেখি উদ্বাস্তু জীবনে স্বদেশ হয়ে উঠেছে বিবাদভূমি। এই প্রাসঙ্গিক তুলনার সঙ্গেই অপর যে কথাটি উল্লেখ্য যতীনবালার লেখাটি একটি স্মৃতিচারণা — যা কাহিনির শৈলীতে রচিত। বাস্তবের কাছে তার দায়বদ্ধতা অনেক বেশি। অন্যদিকে বুদ্ধদেবের লেখাটি স্মৃতিচারণার কায়দায় রচিত ছোটগল্প। কল্পনা ও অনুভূতির দিগন্ত প্রসারিত, তুলনায় বাস্তবের কাছে দায়বদ্ধতা কম; কারণ এটি বুদ্ধদেবের স্মৃতিকথা নয়। আবার সত্তারাজনীতির প্রেক্ষিতেও লেখা দুটি ভিন্নতাচিহ্নিত; বিষয়বস্তুতে এবং ভাষাবিন্যাসে। যদি কেবল দেশভাগ বিষয়ক ছোটগল্প ও উপন্যাসের কথাই ধরি, তাহলে দেখব, নিম্নবর্গীয়দের দেশভাগ-পরবর্তী জীবন যন্ত্রণার ক্ষেত্রে একরকমের নীরবতাই সাহিত্যিকরা পালন করেছেন। খুব স্বল্প কিছু গল্পে ক্যাম্পজীবন, শিয়ালদহের মানবেতর জীবনযাপনের উল্লেখ আছে, কিন্তু গল্পগুলির মূল ঝোঁক বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রতিসরিত হয়েছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পুরী এক্সপ্রেসের রক্ষিতা' গল্পটিতে এক ধর্ষিতা পাগলির কাহিনি বলা হয়েছে — যার অতীত জীবন নিয়ে কোন নির্দিষ্ট তথ্য নেই, কেবল কিছু অনুমান রয়েছে। সেই অনুমান পাগলির পার্শ্ববর্তী অনাত্মীয় মানুষগুলির। তাদের কথোপকথনেই উঠে আসে পাগলির পরিচয় নিয়ে এক ধারণা — সে রিফিউজি। সেই অনুমান নির্ভর পরিচয় প্রসঙ্গে গল্পের অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে এসেছে মরিচ ঝাঁপির উদ্বাস্তুদের প্রসঙ্গ — ''কতদিন আগে দেশ স্বাধীন হল তবু এখনো রিফিউজি।... ওরা ইছামতী নদী সাঁতরে মরিচঝাঁপি দ্বীপে উঠেছিল।... ওরা থাকলে জঙ্গলের বাঘের নাকি ক্ষতি হবে, তাই একদিন পুলিশ গিয়ে ওদের ঘরের খুঁটি উপড়ে, দিলে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে, ...।''[11] অথবা রিফিউজিদের সম্পর্কে দরদী উচ্চারণও আছে উচ্চবর্গীয়দের তরফ থেকে — ''ওরা তিনবার ঘর ছেড়েছে, একবার ওদের বাংলাদেশের নিজেদের বাড়ি-ঘর, দ্বিতীয়বার দণ্ডকারণ্যের ক্যাম্পের ঘর, আর এই সেদিনকে সোঁদরবনের ঘর।''[12] সংলাপটিতে আমরা/ওরা-র পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং এইটুকু মাত্র পরিসরে পাগলি নারীর ঘর হারানোর যে ইঙ্গিত লেখক দিলেন, তার সঙ্গে পরিণতিতে 'মা' সম্বোধন শুনে পাগলির শব্দহীন কান্নায় ভেঙে পড়ার একটি মনস্তাত্ত্বিক সংযোগ স্থাপিত হয়েছে বটে, কিন্তু গল্পটি মূলতঃ দারিদ্র্যজনিত কারণে মানবিক অস্তিত্বের বিপর্যয়ের গল্প।

নারায়ণ সান্যালের তিনটি উপন্যাসে কলোনীর মানুষের কথা, ক্যাম্পের মানুষের বৃত্তান্ত উঠে এসেছে। কিন্তু তিনটি উপন্যাসই উচ্চবর্গীয় দৃষ্টিবিন্দু থেকে লেখা। 'অরণ্যদণ্ডক' উপন্যাসের নামকরণেই একটা চমক সৃষ্টি করা হয়েছে। দণ্ডকারণ্যের সরকারি প্রকল্প উদ্বাস্তুদের জন্য পুনর্বাসন নয়, শাস্তি — মনে হয় এইভাবেই যেন গড়ে তোলা হবে উপন্যাসের কাহিনিবৃত্ত। কিন্তু বাস্তবে উপন্যাসের প্রায় অর্ধেক অংশ জুড়ে আছে প্রাক্-বিভাজন পর্বে পূর্ববাংলার গ্রামের জনজীবনের মিলনভূমির ছবি, মূলতঃ অভিজাত সামন্তপ্রভুদের সমীহ উদ্রেককারী জীবনচিত্র। দেশভাগ ও উদ্বাস্তু হওয়া মানুষগুলির জীবনের নির্মমতার সন্ধান করেছেন লেখক পূর্ববঙ্গীয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাতে, মুসলমানের হাতে হিন্দুজনগণের নির্যাতনের ভয়ংকর উপকাহিনিগুলিতে। কিন্তু এপারে আসার পরে তাদের জীবনবর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা পশ্চিমবঙ্গের ঘটিপুরুষের স্বপক্ষে, রাষ্ট্রের স্বপক্ষেও। এ উপন্যাস এইকারণে কার্যতঃ monologic হয়ে উঠেছে। লেখকের সত্তা ও স্বর ঘোষণা করেছে — ''ছিন্নমূল মানুষগুলো নতুন করে শিকড় গাড়তে চায় — নতুন জমিতে, নতুন আবহাওয়ায়। পশ্চিমবাঙলার মানুষ কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। ... তাঁর চাষ যোগ্য জমির শেষ কাঠা পর্যন্ত দিয়েছে ওদের। তার চাকরির বাজারে উদ্বাস্তুদের অগ্রাধিকার মেনে নিয়েছে অপ্রতিবাদে। ... তাই পশ্চিমবাঙলার শহরে-গ্রামে আনাচে-কানাচে ওরা মাথা গুঁজবার আশ্রয় খুঁজে নিচ্ছে।''[13] বাক্য-বিন্যাসে দয়াপ্রদর্শনকারী ও আশ্রয়প্রার্থীর ভেদচিহ্নের রাজনীতি ধরা পড়ে যায়। দণ্ডকারণ্যের পুনর্বাসন প্রকল্প সম্পর্কে লেখকের প্রতিষ্ঠানমুখী স্বর জানিয়ে দেয় — ''এত বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও কিন্তু কাজ হচ্ছে। গড়ে উঠছে গ্রাম। হাঁসিল হচ্ছে অরণ্যভূমি। পুকুর কাটা হচ্ছে, রাস্তা তৈরী হচ্ছে, কুয়োকাটার কাজ চলছে এগিয়ে। মেডিক্যাল বিভাগের রিপোর্টও ভাল। বাঙলাদেশের উদ্বাস্তুদের চেয়ে দণ্ডকারণ্যে অসুখ-বিসুখ রীতিমতো কম।''[14] দণ্ডকারণ্যের ওয়ার্কসাইট ক্যাম্পে উদ্বাস্তুদের পাথর ভাঙা, মাটি কাটার কাজ করানো হ'ত। সেই দুর্ভোগের স্মৃতি মনোরঞ্জন ব্যাপারীর স্মৃতিকথায় ধরা আছে — ''মনে আছে এক মাসে আমাদের লোহার গাঁইতি ক্ষয়ে গিয়েছিল। হাতের তালুতে প্রথমে ফোসকা পড়েছিল, পরে কড়া পড়ে যায়।''[15] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের কথনে প্রতিষ্ঠানের স্বর শোনা যায় বিপরীতে — ''এখানে ওদের হাতে ফোস্কা পড়বে, ক্রমে ঘাঁটা পড়বে। এখানে প্রথমে ওদের গায়ে গতরে ব্যথা হবে, ক্রমে সে ব্যথা

সারবে। ধীরে ধীরে ডোলের পরিমাণ কমিয়ে আনতে হবে। মাস ছয়েক পরে ওরা সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর হতে শিখবে। তখন জমি পেলে চাষও করতে পারবে — তার আগে নয়।"[16] মনোরঞ্জন ব্যাপারী অবশ্য রাষ্ট্রের এই পুনর্বাসন প্রচেষ্টার পিছনে অন্য ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করেছেন তাঁর স্মৃতি কথায় — ''এখানে যদি কোনওভাবে ফুঁসলে পূর্ববঙ্গের রিফিউজীগুলোকে এনে ফেলা যায়, নামমাত্র পারিশ্রমিকে মজুর সমস্যার সমাধান ঘটে যাবে। অন্য দিকে মিটে যায় উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের বিদঘুটে সমস্যাও।"[17] ক্যাম্প আন্দোলন ও তাদের দাবি ইত্যাদির কারণ সম্পর্কে নিম্নবর্গীয় রাধিকারঞ্জন বিশ্বাস জানিয়েছেন — ''কিন্তু মাথাপিছু হিসেবে যে ক্যাশ ডোল আমরা পেতাম তাতে মাসভর কিছুতেই চলত না। ... আর এ জন্যই তাদের পরিবারের ছেলেমেয়েরা অপুষ্টিতে ভুগে কঙ্কালসার চেহারা হয়ে যেত। সব মিলিয়ে ক্যাম্পবাসী উদ্বাস্তুদের মনে দিনে দিনে ক্ষোভ জমা হতে থাকে।"[18] ক্যাম্পবাসীর দাবি সম্বলিত দরখাস্ত সম্বন্ধে 'বকুলতলা পি.এল.ক্যাম্প' উপন্যাসের সরকারি চাকুরীজীবী প্রধান চরিত্রটির মনোভাব — ''আর কিছু না হোক খবরের কাগজে সম্পাদকীয় লিখেও এরা অন্নসংস্থান করতে পারত। ... মাসে মাসে যে লক্ষ লক্ষ টাকা ক্যাশ ডোল হিসাবে বিতরণ করা হচ্ছে ঐ বড়খোকা মার্কা পি.এল.দের, তার বেলা —"[19] লেখকের উচ্চবর্গীয় অপরতার বোধ ক্যাম্পবাসীদের দাবি ও বঞ্চনাকে এইভাবে অস্বীকার করতে চেয়েছে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে। ক্যাম্পবাসীদের সম্পর্কে সরকারি কর্মচারী তফাদারের উক্তি — ''রোজগার করবার ক্ষমতা আছে প্রমাণিত হয়ে গেলে স্থায়ী পোষ্য হবে কি করে? ডোলের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তটা কেউ অত সহজে খোয়াতে চায়? ... দে আর এ ক্লাস অফ পারপেচুয়াল প্রফেসনাল লিগালাইজড বেগার্স।"[20] — ক্যাম্পবাসীদের প্রতি উচ্চবর্গীয় ঘৃণা উক্তিটিতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে যেন। অন্যদিকে ক্যাম্পজীবন নিয়ে রাধিকারঞ্জন বিশ্বাসের স্মৃতি — ''মনে হল যেন যুদ্ধক্ষেত্রে আছি।"[21] কিন্তু এ যুদ্ধ তো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে, আধুনিক সভ্যতার ভিত্তিমিনার রাষ্ট্রের সঙ্গে, সুতরাং, ভারসাম্য রক্ষা করা উচ্চবর্গীয়দের অস্তিত্বরক্ষার সমতুল হয়ে ওঠে বলেই নারায়ণ সান্যাল সেই বিবাদভূমির বাস্তবতাকে এড়িয়ে গিয়ে নিম্নবর্গীয় আখ্যানের বিপরীত আখ্যান রচনা করেন। তাঁর উচ্চবর্গীয় সমর্থন-অসমর্থনের দিকটি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে — 'বল্মীক' উপন্যাসে। ক্যাম্প নয়, কলোনিবাসীদের জীবন সংগ্রাম নিয়ে এ উপন্যাসের ঘটনার বিন্যাস। এক্ষেত্রে সর্বনিয়ন্তা কথকের

স্বর বলে — ''ঘোষ, বোস, মল্লিক, নন্দী তো আছেই — তাছাড়া রায়, চাটুজ্জে, গাঙ্গুলী, ভট্টাচার্যিও আছে। বাগচি উৎসাহিত হয়ে বলেন : এইসব ভদ্রলোকের ছেলে যে মাটি কাটার কাজে এগিয়ে আসবে তা কিন্তু ভাবাই যায়নি।''[22] উপন্যাসের কাহিনি অনুযায়ী এদের অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে আসে নিম্নবর্গীয় রিফিউজিরা — যারা শিয়ালদহ স্টেশনে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। রাষ্ট্রের কাছে এরা বেআইনি জনগণ, কারণ — ''পাশপোর্ট, ভিসা মানে না।''[23] কিন্তু রাষ্ট্রের অনুগ্রহ তাই — ''ওদের জেলে দেওয়া হয়নি।''[24] আখ্যানটিকে এইভাবে সাজিয়েছেন লেখক। পরিশ্রমী কলোনিবাসীরা এদের বিপক্ষে, রাষ্ট্র তাদের সহায়তা করে। কিন্তু এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিণতিতে নিম্নবর্গীয়দের রাষ্ট্রীয় মদতে জবরদস্তি উচ্ছেদ করা সত্ত্বেও কলোনিবাসীরা ভিলেন হয়ে ওঠে না এই উপন্যাসে। অন্যতম প্রধান চরিত্র ভূষণের ভাবনাতে তাই কলোনিবাসীদের স্বপক্ষে যুক্তির সমাবেশ — ''এটা স্বার্থের কথা নয়, মুক্তির কথা। গোটা দেহটাকে বাঁচাতে যেমন পচনশীল একটা অঙ্গকে কেটে বাদ দেন সার্জেন, এ তেমনই। দেশের মুক্তি, জাতির মুক্তির জন্যে আপাত নিষ্ঠুর আদেশ দেন সেনাপতি।''[25] উচ্চবর্গীয় কলোনিবাসী পূর্ববঙ্গ থেকে দেশ হারিয়েও এইভাবে 'দেশ' খুঁজে পায়, কিন্তু উচ্চবর্গীয় বিদ্বেষ নিম্নবর্গীয়দের নাগরিকত্বকে স্বীকার করতে চায় না, জাতির অন্তর্ভুক্তও করতে চায়না। কদর্মাক্ত আবর্জনার মতোই এঁদের অস্তিত্ব নবলব্ধ রাষ্ট্রদ্বয়ের কাছে, উচ্চবর্গীয়দের কাছেও। জাতির নতুন মিলনভূমি সৃজনের ক্ষেত্রে এঁরা গৃহীত হয় না। অমিয়ভূষণের 'নির্বাস' উপন্যাসেও তাই ক্যাম্পজীবনের নিম্নবর্গীয় দুরবস্থার চিত্র নেই। কাহিনি কেন্দ্রে বিমলা, ভুবনবাবু, সৌম্য প্রমুখ শিক্ষিত মানুষের চেতনাপ্রবাহ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব।

উচ্চবর্গীয় গোপালচন্দ্র মৌলিকের স্মৃতিকথায় পূর্ববাংলার গ্রাম রোমান্টিক সৌন্দর্যের মিলনভূমি, তপন রায়চৌধুরীর বরিশাল শহর জাতীয়তাবাদী চেতনার মিলনভূমি। মিহির সেনগুপ্তের শৈশবের বরিশালের গ্রাম ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত মর্যাদার বিষাদভূমি, কিন্তু মিহির অতীতের সামন্ত মর্যাদার সমৃদ্ধির মধ্যে, নারীর ব্রতপালনে ও পূজা অর্চনায়, বরিশালের লোকগানে সেই মিলনভূমির সন্ধান করেছেন। তাঁদের স্ব স্ব মিলনভূমি যেন এক পুরাণকথার জগৎ। বাংলা গল্প উপন্যাসেও এই পুরাণ ভূমি নির্মাণকে আমরা খুঁজে পাই। প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়াপাতার নৌকো' উপন্যাসটিতেও কল্পনার চূড়ান্ত স্বাধীনতা নিয়ে সেই মিলনভূমির সামগ্রিক রূপ অঙ্কিত হয়েছে।

উপন্যাসটিতে পূর্ববঙ্গে হিন্দুর আধিপত্যবাদী সংস্কৃতির আনন্দময় বিস্তার। দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, নারীর দেওয়া আলপনা ও নাড়ু, যাত্রা, শিক্ষিত হিন্দুর উচ্চাঙ্গের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এসব অত্যন্ত পরিচিত হিন্দু ধর্মের ও সংস্কৃতির প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম খণ্ড যেন ভ্রমণবিলাসীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা। তাই বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, মানুষ, জিনিসপত্রের কম দাম সব কিছু দেখেই পশ্চিমবঙ্গ থেকে সদ্য আগত বালক বিনু ও তার পরিবার মুগ্ধ ও আত্মহারা। অন্নদাশংকর যেমন 'বাংলার মুখ' দেখার আবেগ ব্যক্ত করেছিলেন পূর্ববঙ্গে গিয়ে, যেমন ভাবে পূর্ববাংলার মানুষ ও জীবনকে বিদেশীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জটিলতাহীন মনে করেছিলেন, সেইরকমই আবেগ এখানে প্রথম খণ্ডের কাহিনিবৃত্তে ধরা পড়েছে। কাহিনিতে মুসলমান চরিত্র খুবই কম — তারা মূলত সমৃদ্ধশালী হিন্দু পরিবারের চাকর, গাড়োয়ান অথবা ভূমিহীন ভাগচাষী। ব্যতিক্রম মজিদ মিঞা। মজিদ মিঞা সমৃদ্ধশালী মুসলমান চাষী। কিন্তু সরলতা ও অকপটতায় পূর্ববঙ্গীয় বাঁধাধরা উদাহরণ হিসেবেই অঙ্কিত। বিনুর বাবাকে আপন করে নেওয়া, নিজস্ব লাভ ক্ষতির বিষয়ে না ভেবে হেমকর্তার নির্দেশে তাঁকে জমি দিয়ে দেওয়া, অথবা কিশোর বিনুর অধঃপতনে তাকে অভিভাবকের মত প্রহার করে সারারাত বিনুকে স্নেহ ভালবাসায় সিক্ত করা — এ সব কিছু চরিত্র লক্ষণের মধ্যেই মিলনভূমির উদ্‌যাপন। কিন্তু এই মিলনভূমির প্রেক্ষণবিন্দু অবশ্যই উচ্চবর্গীয় হিন্দুর। সেইকারণেই দেখবো অস্পৃশ্যতা জনিত বিভেদ — যা উচ্চবর্গীয় হিন্দুর অত্যাচার-অপমান হিসেবেই দেখেছে পূর্ববঙ্গীয় আত্মসচেতন মুসলমান সমাজ — তাকে অস্বীকার করে দেখানো হয়েছে হেমকর্তা অক্লেশে, অনায়াসে মজিদ মিঞার সঙ্গে একত্রে, এমনকি তার বাড়িতে বিনুরাও, খাদ্যগ্রহণ করে সানন্দে। এখানে কোন দ্বিধা অথবা প্রশ্নের প্রসঙ্গমাত্র আসেনি। যেন মনে হয় — এরকমই স্বাভাবিক, এরকমই সকলের অভ্যাস। অথচ সম্পর্কের মানদণ্ড, এমনভাবে গড়ে তোলা হয়েছে যে মজিদ মিঞা ও হেমকর্তা সমপর্যায়ের নন। হেমকর্তার সমপর্যায়ের চরিত্র একমাত্র শ্বেতাঙ্গ লারমোর এবং এঁরাই বুদ্ধিতে, চিকিৎসাবিদ্যার প্রয়োগে পিছিয়ে পড়া নিম্নবর্ণ ও মুসলমান সমাজের অভিভাবক ও উদ্ধারকর্তা। লক্ষণীয়, উচ্চবর্ণীয় হেমকর্তা অথবা অন্যান্য হিন্দু পরিবারগুলি কেউই বাঙাল ভাষায় কথা বলে না। বাঙাল ভাষায় কথা বলে মূলত নিম্নবর্গীয় হিন্দু ও মুসলমানরা। মুসলমান সমাজ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হিন্দুর এই মিলনভূমির প্রেক্ষিত থেকে মজিদ

মিঞার মুসলিম লীগের পাণ্ডা হওয়া ও স্বভাবের পরিবর্তন আকস্মিক মনে হয়, যেমনটি মনে হয়েছিল তপন রায়চৌধুরীর তাঁর সাজুকাকাকে মুসলিম লীগের ঝাণ্ডা নিয়ে বেরোতে দেখে। এই যে বিবাদভূমি তৈরী হ'ল, তার জন্য এইভাবেই একপেশে দায়ী করে দেওয়া হ'ল মুসলিম মানুষদের আত্মপরিচয় সচেতনতাকে।

হারিয়ে যাওয়া মিলনভূমিকে পূর্বপাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে সন্ধান করতে চেয়েছেন ''নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'' উপন্যাসের লেখক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। দেশভাগের এই উপন্যাস শেষ হয় মুসলিম লীগের সক্রিয় নেতা সামসুদ্দিনের গ্রামে ফেরায়। সামসুদ্দিনের গ্রামে ফেরা যেন এক মিলনভূমির উৎসতে ফিরে আসার প্রতীক। দেবেশ রায় 'রক্তমণির হারে' গ্রন্থের ভূমিকাতে সামসুদ্দিনের গ্রাম-অনুভবকে এই ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন — ''পুরুষাণুক্রমিক বসবাসে ও জীবনরচনায় সেই গ্রামই সামসুদ্দিন-মালতীর অশেষ বাল্যপ্রণয়ের ভূমি, সামসুদ্দিন কন্যা ফতিমা ও সোনার বাল্যরূপকথার ভূমি, সামসুদ্দিনের মুসলমান চৈতন্য জাগরণের ভূমি ও বাঙালিচৈতন্য সৃষ্টির ভিত, ... হিন্দু ও মুসলমান সমাজের পরস্পর বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক সব রীতিবিধি ও বিশ্বাস; আবার একই গ্রামের একই পরিবেশের অন্তর্গত এই দুই ধর্মের মানুষজনের বেঁচে থাকার এক সমবায়; পারস্পরিক বিনিময়, ... এই উপন্যাসটিতে খুব গোপনে এক ব্রতপালনের দিকে আমাদের ঠেলে দেওয়া হল — নীরবতা যদি ভাঙতে হয় তাহলে বেঁচে থাকার সেই একটি সমবায়কে, টুকরো টুকরো সব সমাজকে, বিচ্ছিন্ন ধর্মকে পুনর্নির্মাণ করতে হবে। ... সেই দেশ-বিভাজন আর স্বাধীনতা পর্যন্ত সময়টিতে, কী ভুল বেঁচে ছিলাম আমরা, বা কী ভুল বাঁচতে হয়েছিল আমাদের, জানতে।''[26] কিন্তু ভুল বাঁচার আত্মানুসন্ধান কিন্তু 'আমাদের' নয়, বহুবচনের এই উত্তমপুরুষ থেকে বাদ থেকে যায় উৎখাত হওয়া হিন্দুরা। কাহিনির শেষে পড়ে থাকে কেবল সামসুদ্দিন একা, অথবা পূর্ববাংলার বাঙালি সত্তায় জেগে ওঠা মুসলমান বাঙালিরা। হারিয়ে ফেলা গ্রামজীবনের স্মৃতি খুঁজতে গিয়ে সামসুদ্দিনের মনে প্রথমেই ফিরে আসে আধিপত্যবাদী হিন্দু সংস্কৃতির দুর্গাপুজার আনন্দে তাদের সামিল হওয়ার স্মৃতি — ''সে ঘুম থেকে উঠে বাইরে আসত। ... দশমীর বাজনা বাজছে না। বিসর্জন হয়ে গেছে ঠাকুরের। ... সে দুগ্‌গা ঠাকুরের তলোয়ারটা বালিশের নিচে রেখে দিত। সকাল হলে সে রাজা সেজে বাড়ি বাড়ি ঘুরে

আসত, মাথায় তার আমপাতার মুকুট।"[27] এইভাবে রাজা সাজাকে আত্মপ্রতারণা ভেবে উচ্চবর্গীয় হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমান বাঙালির আত্মসচেতন সংঘবদ্ধতা। কিন্তু সামসুদ্দিন সেখানেই আবার ফিরে থেকে চাইছে যেন, সেটি-ই যেন তার সত্তার প্রকৃত পরিচয় এমনটিই উপন্যাসের পাতায় ভেবেছে সে — ''সামুর মনে হল ওর সেই আম-জামপাতার মুকুট এখনও কে যেন মাথায় তার পরিয়ে রেখেছে। সে যতই হিন্দু বিদ্বেষের কথা বলুক আম-জামপাতার মুকুট সে ফেলে দিতে পারেনি। ফেলে দিতে গেলেই দেখেছে ভিতরটা তার হাহাকার করে উঠেছে। ... আবেগে সে বলে উঠল, আজ আমাদের আন্দোলনের দিন, মায়ের ঋণ শোধ করার দিন। আমাদের মা, বাংলামার চেয়ে বড় কিছু নেই। যতদিন ঋণ শোধ না হবে, ততদিন আমাদের রেহাই নেই।"[28] এ যেন কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ। অর্জুন গাছের গায়ে সোনার লেখা যেন এক তীব্র অপরাধবোধকে সদাজাগ্রত রাখতে চায় — ''গাছ বড় হয়ে যাওয়ায় অক্ষরগুলি আরও বড় হয়ে গেছে। যেন দেশের মানুষকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর জন্যই অক্ষরগুলি যতদিন দিন যাবে তত বড় হয়ে যাবে। বাংলাদেশের মানুষ বড় বড় হরফে পড়বে, জ্যাঠামশায়, আমরা হিন্দুস্তানে চলিয়া গিয়াছি ... বড় বড় অক্ষর কী গভীর ক্ষত নিয়ে মহাবৃক্ষ দাঁড়িয়ে আছে"[29]। ক্ষমতা হারানো হিন্দু-যন্ত্রণার প্রতিষেধক যেন অনুতাপের এই চিত্র। সেই যন্ত্রণার রূপকেও ধরেছেন ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসের পাতায় — ''কী করে যে সোনা এমন ভীতু মানুষ হয়ে গেল! ... সেই যে সে ভেবেছিল, এই দেশে এসেই ওরা সবাই রাজার মতো হয়ে যাবে, কত সমারোহ থাকবে জীবনে, ..."[30] ক্ষমতা হারানো ভঙ্গুর সত্তার সোনা তাই মিলনভূমির স্বপ্ন দেখে এইভাবে — ''... মনে হয় সকাল হলেই সে ঘুম থেকে উঠে দেখবে, পাগল জ্যাঠামশাই — এসে গেছেন এদেশে। ... তিনি বড় মানুষ, তাঁর অর্থবল অনেক। কোথাও তিনি এক রাজবাড়ি কিনে রেখেছেন। সবাইকে নিয়ে তিনি এখন সেখানে যাবেন।"[31] জ্যাঠামশাই ও রাজবাড়ির স্বপ্ন সোনার মিলনভূমির প্রতীক — যা হারিয়ে গেছে অথচ এককালে যেখানে ছিল সম্পদ, প্রাচুর্য ও আধিপত্য। তার বিপ্রতীপে ভারত-জীবনের জাহাজের চাকরির অধীনতা যেন তাকে ক্লাউন বানিয়েছে — এমনই ভেবেছে সোনা। এই পদানত পরাধীন জীবনে একমাত্র সম্বল ছিল সম্ভ্রম। সে সম্ভ্রম বিনষ্ট হল একটি মাত্র হুঙ্কারে — ''জাহাজ মে নোকরি করনেসে বিফ তুমকো খানেই হোগা।"[32] এই সম্ভ্রমবোধ ছিল অবশ্যই হিন্দুগোত্রীয়। সম্ভ্রম নষ্ট হওয়ার

প্রতিরোধ-যন্ত্রণার ভাষায় তাই ধর্মীয় পবিত্রতার চিহ্নসকল শিল্পের নিয়মে প্রকাশ পেয়েছে — ''... এক আজন্ম সংস্কার, তীব্র ঘৃণা বোধ সারা শরীরে দগদগে ঘা হয়ে ফুটে উঠল। তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায় শরীর নীল হয়ে যাচ্ছে। সে এবার মরে যাবে যেন। চারপাশে ঋষিপুরুষেরা দাঁড়িয়ে আছেন। কী সব মন্ত্রগাথা তাঁরা উচ্চারণ করে চলেছেন। যেন হোমের কাঠ থেকে এক পবিত্র গন্ধ উঠে সারা শরীরময় ভেসে বেড়াচ্ছে। ওর চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছা হল, ... আমাকে আমার জন্ম থেকে আমার বাবা মা, আমার পূর্বপুরুষ, মাটি ফুল ফল এক আশ্চর্য পরিমণ্ডলে মানুষ করেছেন, আমি সব পারি স্যার, কিন্তু সেই পরিমণ্ডল ভেঙে দিতে পারি না। ভেঙে দিলে আমার আর কিছু থাকে না।''[33] সেই পরিমণ্ডল সোনার সত্তা এবং সেই সত্তা গড়ে উঠেছে পূর্ববঙ্গের গ্রাম-প্রকৃতি ও সনাতন ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকার সহযোগে। এই উপন্যাসের পরিসমাপ্তিতে এসেছে ভূমিহীন ভৃত্য ঈশমের মৃত্যুর কথাও। ঈশমের সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক। বিনাশর্তে আনুগত্য দান করে এসেছে মুসলমান ঈশম চিরকাল। কিন্তু সেই আনুগত্যের রূপ কেমন? গ্রাম থেকে বিদায় নেওয়ার সময় সোনা দেখেছে — ''ঈশম আর আশ্বিনের কুকুর ওদের এগিয়ে দিতে যাচ্ছে।''[34] ঈশমের দুরবস্থার কথা বলতে গিয়ে বারংবার কুকুরের প্রসঙ্গ এনেছেন ঔপন্যাসিক। কারণ ঈশম ভূমিহীন চাষী। কিন্তু উপন্যাসে দেখি এতদিন সে টেরই পায়নি সে ভূমিহীন। সুতরাং তার এই উপলব্ধির কারণ হিসেবে হিন্দু প্রভুর ঔদার্যের প্রসঙ্গ এসে যায় স্বাভাবিক নিয়মে। অন্যদিকে নতুন মুসলমান জমির মালিকের সঙ্গে ঈশমের সম্পর্ক বর্ণিত হয় এইভাবে — ''হাজি সাহেবের বেটারা সকালে তরমুজ তুলতে এসে টের পাবে একজন ভিখারি মানুষ তরমুজ পাতার নিচে মরে পড়ে আছে। প্রথমে ঈশমকে ওরা চিনতেই পারবে না। এই ঈশম। ওর কাঠা দুই ভুঁই ছিল বাড়ির পাশে। সেটাও তারা কাঁচা বাঁশের বেড়ায় নিজের করে নিয়েছে। চিনে ফেললেই ভয়। যদি ওটা আবার সে ফিরে চায়।''[35] সুতরাং নতুন দেশের মুসলমান প্রভু তাকে প্রতারণার দ্বারা নিঃস্ব করেছে। পূর্ববর্তী মিলনভূমিতে হিন্দু-মুসলমানের যে সমবায় সম্পর্ক ইঙ্গিতবহ হয়ে উঠেছে এই উপন্যাসে, সেই মিলনভূমি হল একটি সম্প্রসারিত পরিবারের ধারণা — হিন্দু সমৃদ্ধশালী কর্তার অধীনে মুসলমান ভৃত্যও সেই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। স্তরবিন্যাসে ভৃত্যের নিম্ন অবস্থান, প্রভুভক্তি ও আনুগত্য এবং হিন্দু পরিবারের উচ্চ অবস্থান থেকে অভিভাবকতুল্য আচরণের কোন দ্বন্দ্ব অথবা তর্ক ছিল কিনা তা

উপন্যাস থেকে একেবারেই জানা যায় না। এই 'পরিমণ্ডল'-এর কথাই বলেছে সোনা — যেখানে তার সত্তার সংলগ্নতা। ঈশমের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে সামু বুঝেছে ভূমিহীন, অন্নহীন ঈশমের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য অপ্রয়োজনীয় ছিল দ্বিজাতিতত্ত্বের আন্দোলন। কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক সমাজকাঠামোর যে অসুখটি ঈশমদের নিঃস্ব করে রেখেছিল সেই অসুখ অর্থাৎ হিন্দু উচ্চবর্গীয়দের শোষণের চিত্র অঙ্কণের পরিবর্তে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ককে যেভাবে ভাবালুতার সঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে এখানে তাতে মনে হয় মধ্যযুগীয় সামাজিক স্তরবিন্যাসের কাঠামোটিকে ঔপন্যাসিকের উচ্চবর্গীয় অবস্থান ভেঙে ফেলতে চায়নি।

এ কথা ঠিকই 'কেয়াপাতার নৌকো' উপন্যাসের মত মুসলিম আত্মসত্তার রাজনীতির রূপরেখাকে সামগ্রিকভাবে নেতিবাচকতায় আবৃত করেননি অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। সামসুদ্দিনের মুসলিম লীগের আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া, তার প্রতিবাদী, আত্মসচেতন, যুক্তিবাদী সত্তার বিকাশকে ঘটনা পরম্পরায় নির্মাণ করেছেন লেখক। কিন্তু এখানেও কিছু অসুবিধা থেকে যায়। সামু ঢাকা থেকে শিক্ষিত হয়ে ফিরে মুসিলম লীগের হয়ে প্রচার করছে গ্রামে। মালতী ও ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক আন্তরিক। উপন্যাসের প্রথমদিকেই লীগ-রাজনীতির জন্য তার অপরাধবোধের উল্লেখ পাই — ''সামসুদ্দিন মনে মনে কেমন এক অপরাধবোধে পীড়িত — যার জন্য সে প্রায় চুপচাপ হাঁটছিল।''[36] এই অপরাধবোধ তার দাস্য মনোভাব সঞ্জাত হতে পারে। কিন্তু ঠাকুরবাড়ি ও হিন্দু প্রভাবশালীদের প্রতি তার বিরূপতা ও বিরোধিতার মনোভাব অথবা দুই বিপরীত মনোভাবের দ্বন্দ্ব কাহিনিতে সম্প্রসারিত রূপ পায়নি। সুতরাং চরিত্রটির সামগ্রিকতা অথবা মুসলমান মধ্যবিত্তের আত্মসত্তা রাজনীতির পূর্ণ যথাযথ উন্মোচন কাহিনিতে রূপায়িত হয়নি। কাহিনির বিন্যাস হিন্দুর প্রেক্ষণ বিন্দু থেকেই গড়ে উঠেছে এবং মূলতঃ তাদের জন্মভূমির প্রতি প্রেম ও দেশত্যাগের সমস্যা ও যন্ত্রণার কাহিনি হয়ে উঠেছে উপন্যাসটি।

সামুর কাহিনির এই সমগ্রতা 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসে উঠে আসা সম্ভব ছিল না, কারণ উপন্যাসের কেন্দ্রে ছিল না সামু অথবা মুসলমান আত্মপরিচয় রাজনীতির জটিলতা। এই উপন্যাসটি অথবা 'কেয়াপাতার নৌকো' অথবা আরও কিছু দেশভাগ বিষয়ক কাহিনি এবং তার সঙ্গে 'ছেড়ে আসা গ্রাম', 'বিষাদবৃক্ষ', গোপালচন্দ্র মৌলিকের স্মৃতিচারণা, এমনকি অন্নদাশংকরের

যুক্তবাংলার স্মৃতি — সব একত্রে দেশভাগের এক উচ্চবর্গীয় মহাআখ্যান নির্মাণ করতে চেয়েছে — যে আখ্যানে হারানো গ্রামের রূপকথারা, হিন্দুপুজো ও ব্রতপালনের আনুষঙ্গিক সকল সঙ্কেত, নিসর্গের নানা সঙ্কেত এবং হিন্দুবিতাড়িত গ্রামের শ্মশানভূমির শূন্যতার বিষাদ — এসবকিছুই মূল কাঠামো হিসেবে উঠে এসেছে। মধ্যযুগে সমান্তরাল-প্রবাহী হিন্দু-মুসলিমগোষ্ঠীর মিলনভূমির জীবনবোধের সমানুপাত এইসব লেখায় রক্ষিত হয়নি। মিলনভূমির বিবাদভূমিতে রূপান্তরের পিছনে সামাজিক অসাম্য ও মুসলিম জনগোষ্ঠীর অসন্তোষও কাহিনিবিন্যাসে ধরা পড়ে নি। উচ্চবর্গীয় হিন্দুর নির্মিত মহা আখ্যানে তাই মুসলমান জনগোষ্ঠীর বিরূপতা আকস্মিক, অপরিচিত এবং অনেক সময় অলৌকিক ঘটনার মত বর্ণিত। কিন্তু এই মহাআখ্যানকে উল্টে পড়তে চেয়েছেন বাংলাদেশের কথাসাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাঁর 'খোয়াবনামা' উপন্যাসে। উপন্যাসে লোকসংস্কৃতির মিথগুলি জাদুবাস্তবতার আঙ্গিকে একটি সার্থক ও পূর্ণাঙ্গ মিলনভূমি রচনা করতে পেরেছে। মিলনভূমির এই আখ্যানের চরিত্র তিনটি — তমিজের বাবা, কেরামত আলি ও বৈকুণ্ঠ। মিলনভূমি বিনষ্ট হয়ে বিবাদভূমিতে পরিণত হচ্ছে — এইভাবে ক্রমানুসারে কাহিনি পরিকল্পনা করা হয়নি। আখ্যানের শুরু থেকেই বিবাদভূমির অবতারণা, মিলনভূমি যেন তার চালচিত্র হিসেবে নির্মিত। বিবাদভূমির চরিত্রগুলি হল মুসলিম লিগ নেতা কাদের, ইসমাইল হোসেন, অন্যদিকে অনিল সান্যাল, মুকুন্দ সাহা, সতীশ মুক্তার, দাঙ্গাকারী নিম্নবর্গীয় হিন্দু কামারপাড়ার যুধিষ্ঠির অথবা মুসলমান নিম্নবর্গীয় কালাম মাঝি, হিন্দু জমিদারের নায়েব, হিন্দু জমিদার অথবা মুসলিম লীগের জমিদার নেতা সকলেই। কাহিনির কেন্দ্রে নেই হিন্দু সামন্তপ্রভুরা। কেন্দ্রে আছে মুসলমান বাঙালির আত্মপরিচয় রাজনীতির জটিল প্রবাহ, তার সার্থকতা অথবা অসম্পূর্ণতা। সামুকে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে পারেননি, কিন্তু আখতারুজ্জামানের লেখনীতে কাদের ও ইসমাইল সম্পূর্ণ — তাদের ক্রোধ, বিক্ষোভ, রাজনৈতিক ভ্রান্তি ও সুবিধাবাদ সমেত। হিন্দু নায়েব চরিত্রটি তার শ্রেণি বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যথাযথ — যে শ্রেণি বৈশিষ্ট্যের অভাবে বিঘ্নিত হয়েছে 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসের নায়েব পরিবার অর্থাৎ ঠাকুর পরিবারের রূপাঙ্কণের সম্পূর্ণতা। অন্নদাশংকরের স্মৃতিচারণায় মুসলমান সমাজের জাত-বিভাজনের রীতির কথা উঠে এসেছে ক্রোধের বাণীতে। মুসলমান সমাজের অন্তবর্তী সেই সমস্যার দ্বিচারিতা ও রাজনৈতিক

পরিপ্রেক্ষিতের আখ্যান এই উপন্যাসে সংঘাতময় হলেও গভীরতাগামী। আখতারুজ্জামানের স্পষ্ট সমর্থন কম্যুনিষ্ট ও তেভাগা আন্দোলনের প্রতি — যে আন্দোলন বর্গাচাষীর মুক্তির পথ নির্দেশ করে। কবি শামসুর রাহমানের স্মৃতিকথাতেও আমরা দেখেছি তেভাগা আন্দোলন ও তাঁর নেত্রী ইলা মিত্রের প্রতি কবির সশ্রদ্ধ আবেগের প্রকাশ। এই আন্দোলনের প্রতিপক্ষ হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে জোতদার, মহাজন ও সামন্তপ্রভুরা। এই উপন্যাসে জমিদার, মহাজন, জোতদার শ্রেণির স্বার্থে ক্রিয়াশীল মুসলিম লীগের সুবিধাবাদী সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রতিপক্ষ হিন্দুরা নয়, তেভাগা আন্দোলনকারীরা। উপন্যাসে দাঙ্গা, হিন্দুদের দেশহারানো, মুসলমান রিফিউজির সমস্যা প্রভৃতি বাস্তব বিড়ম্বনার সকল ঘটনা উঠে এলেও ভূমিহীন তমিজের ভিটে হারানোর ও উৎখাত হওয়ার কাহিনি শ্রেণিবিভক্ত সমাজের মূল ক্ষতটির দিকে অঙ্গুলি সংকেত করে। তমিজই প্রকৃতপক্ষে দেশহীন, তার দেশ-অনুসন্ধানকে ঔপন্যাসিক এইভাবে বর্ণনা করেছেন — ''গাড়ি যেখানকার হোক, তমিজকে যেতে তো হবেই। ... ওখানে তেভাগা কায়েম হয় তো বর্গা সে একটা ঠিকই জোগাড় করে নেবে। ফসলের হিস্যা যা জুটবে তাতে প্রথমেই খালাস করে নেবে ভিটা আর ঘর।''[37] সুতরাং শুধুমাত্র হিন্দু-মহাজন-জমিদারদের প্রতি বিরুদ্ধতার যে স্বর মুসলিম লীগ রাজনীতির মূল অবলম্বন, তা যে আসলে প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়, সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই আখতারুজ্জামান নির্মাণ করলেন তাঁর আখ্যান। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসের ঈশমের ক্ষেত্রে শ্রেণিশোষণের এই সামগ্রিক রূপ দেখানো হয়নি। ওই উপন্যাসের কাহিনিতে এসেছে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী সংঘর্ষ, দাঙ্গাকারীরা খারাপ মুসলমান অথবা খারাপ হিন্দু-এরকম একটি সরলীকৃত সমঝোতা আছে, বঞ্চিত ও 'দেশ'হারা হয়েছে হিন্দু ঠাকুর পরিবারটি এবং হিন্দু বিতাড়নের পাপে ঈশমও। কিন্তু 'খোয়াবনামা'তে তার পরিবর্তে এসেছে শ্রেণি-শোষণ ও দ্বন্দ্বের কাহিনি। বঞ্চিত ও দেশহারা কেবলমাত্র মুসলমান ভূমিহীন চাষী তমিজ। এই উপন্যাসে অবশ্য দেশহারা নিম্নবর্গীয় হিন্দুদের উপর শ্রেণিশোষণের পরিণাম জায়গা পায়নি।

আবুল মনসুর আহমদ তাঁর স্মৃতিকথায় বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয় রাজনীতিকে শোষিত মুসলমান চাষীর উত্থান হিসেবে ব্যাখ্যা করেও ওই রাজনীতির নেতৃত্ব যে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মুসলমানের হাতেই ছিল, সে কথা উল্লেখ করেছেন। তবে সেই রাজনীতির প্রবঞ্চনামূলক ও

সুবিধাবাদী দিকগুলি মনসুর সাহেবের অভিজ্ঞতায় ধরা দেয়নি। আবার মুজিবুর রহমান অর্থনৈতিক শোষণের উল্লেখ করলেও তাঁর স্মৃতিকথার প্রথম অংশে মুসলিম আত্মসত্তা রাজনীতি এবং পরবর্তী অংশে বাঙালি সত্তার মূলধারার রাজনীতিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। বস্তুতঃ দেশভাগের পরবর্তী সময়ে পূর্ব পাকিস্তান ও অধুনা বাংলাদেশে যে প্রধান আখ্যানটি নির্মিত হয়েছে, তা কিন্তু দেশভাগের পরে বাঙালির আত্মসত্তা রাজনীতির প্রাঙ্গণে উত্তরণের গল্পই বলে মূলত। শামসুর রাহমান, আবুল হোসেন, আবু রুশ্‌দ্‌, সনজীদা খাতুন সকলেই ভাষা আন্দোলন, মুক্তি যুদ্ধ এসবের স্মৃতিতে উচ্চকিত। সেলিনা হোসেনের 'যাপিত জীবন' উপন্যাসেও দেখবো পশ্চিমবঙ্গের দাঙ্গায় দেশহারা মুসলমান পরিবারটি পূর্বপাকিস্তানের ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে কেমনভাবে তাঁদের নিজেদের স্বাধিষ্ঠান ভূমিটিকে আবিষ্কার করছে — সেই গল্পই বলা হচ্ছে। কিন্তু এই আখ্যানে মুসলিম লীগ সরকারের কৃষিনীতি, খাদ্যনীতি, আমলাতন্ত্র, পুলিশের জুলুম ইত্যাদি প্রশ্নে কৃষিজীবী সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ, উপজাতিদের আন্দোলন, সংখ্যালঘুদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হওয়ার যন্ত্রণা — অর্থাৎ যে সমস্ত বিষয় দেশভাগের পরবর্তী সময়ে পূর্বপাকিস্তানের রাজনীতির গতিমুখকে নিধারণ করেছিল — তার সব কিছুই বাদ পড়ে গেছে। অথচ দেশভাগ পরবর্তী সময়ে পূর্বপাকিস্তানে সরকারের ভ্রান্ত খাদ্যনীতির কারণে গ্রামে গ্রামে দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। ঐতিহাসিক আহমেদ কামাল বলেছেন — "the Muslim League Performance in the domain of food distribution was indeed more appalling."[38] এই দুর্ভিক্ষের কথা উঠে এসেছে সংখ্যালঘু মিহির সেনগুপ্তের স্মৃতিচারণায়। দুর্ভিক্ষের কারণ মুসলমানী ফৌজী শাসন শুধু, সেটা তিনি বিশ্বাস করতেন বলেই লিখলেন — ''যেখানে চাষির গলায় প্রেমের গান ছাড়া কোনও হুতাশ শুনিনি কোনওদিন, সেই দেশের চাষিরা আজ কোন সুদূর সাগরপাড়ের কোন দেশ থেকে আসা অপরিচিত এবং অশ্রদ্ধার অন্ন মুখে তুলছে ভিখিরির মতো।"[39] অর্থাৎ হিন্দু আধিপত্যের মিলনভূমিতে চাষির কোন কষ্ট ছিলনা — মিহিরের হিন্দুত্ব বোধের 'সত্য' তেমনটিই। তাঁর মতে — ''দুর্ভিক্ষ সংখ্যালঘু অপবর্গীদের জন্যই যেন চরমতম আঘাত ছিল।"[40] মুসলমান ভূমিহীন ভিখারিদের তাঁদের বাড়িতে লঙ্গরখানায় আসতে দেখেও মিহিরের এ হেন ভঙ্গুর কারণযুক্ত সিদ্ধান্ত তাঁর গোষ্ঠীগত সত্তার পরিচয়কেই স্পষ্ট করে তোলে। অন্যদিকে বাংলাদেশের

সাংস্কৃতিক কর্মী সনজীদা খাতুন জানাচ্ছেন, পাকিস্তান শাসনের আমলে তাঁরা পয়লা বৈশাখ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন শুরু করেন ঢাকা শহরে, যে উৎসবকে তিনি বর্ণনা করেছেন এইভাবে — ''... বাঙালির আত্মআবিষ্কারের অঙ্গ হিসেবে উৎসব হয়ে উঠতে চাইছে ...''।[41] উৎসবের উদ্দেশ্য — ''নগরে-গ্রামে আদানপ্রদানের ভেতর দিয়ে শাশ্বত বাঙালি সত্তা পরস্পরের মধ্যে রাখিবন্ধনে বাঁধা পড়বে, ...।''[42] কিন্তু মধ্যবিত্ত পূর্ববঙ্গীয় মুসলমান বাঙালি এই সংযোগের প্রচেষ্টা চালিয়েছিল নাগরিক ধরণেই — ''কয়েকবার চেষ্টার পরে একবার মানিকগঞ্জ থেকে পাটের শিকা, বৈঠকখানার মেঝেতে পেতে সাজাবার মতন পাট দিয়ে বোনা মাঝারি আকারের গোল আর লম্বাটে গোল সুদৃশ্য আচ্ছাদন, খাবার টেবিলের ম্যাট ইত্যাদি নিয়ে এসে পসরা সাজিয়েছিল দু-একজনে।''[43] গ্রাম সম্পর্কে নাগরিক-দূরত্ব ছিল বলেই স্মৃতিলেখা অথবা কাহিনি ঢাকা কেন্দ্রিক বাঙালি সাহিত্য-সংস্কৃতির উদ্‌যাপন, ভাষাআন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের শহীদ সম্মান, — এইসব বিষয়কেই অবলম্বন করে মহা আখ্যানের দেহটিকে নির্মাণ করেছে। সেখানে 'খোয়াবনামা'কে অন্যধারার আখ্যান নির্মাণের কৃতিত্ব দেওয়া যেতেই পারে।

দেশবিভাজন ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সর্বহারার ধর্ম-নিরপেক্ষ দুরবস্থা পশ্চিমবঙ্গের কিছু ছোটগল্পে উঠে এসেছে। যেমন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ইজ্জত' — যেখানে বিবাদভূমির দুটি প্রতিপক্ষ চরিত্র হিন্দু জগন্নাথ ও মুসলমান ধলামন্তাই — বস্ত্রের অভাবে কবর থেকে কাফনের কাপড় চুরি করার সময় দৈন্যের সমভূমিতে মিলিত হয়। নবেন্দু ঘোষের 'ত্রাণকর্তা' গল্পে দেখি নাগরিক এলিট ভদ্রলোক শ্রেণি দাঙ্গাতে আত্মরক্ষার জন্য নিম্নবর্গীয় ডোমদের অবলীলাক্রমে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিচ্ছে। নবেন্দু ঘোষের অপর গল্প 'উলুখড়' গল্পে দেখি দাঙ্গায় নিহত আজিজের বুকের উপর লাল অক্ষরে লেখা — ''ধর্মঘটী ট্র্যামশ্রমিক।''[44] সমরেশ বসুর 'আদাব' গল্পটিতে হিন্দু সুতাকলের শ্রমিক ও মুসলমান মাঝিটি দাঙ্গার সময়ে একই সঙ্গে প্রাণরক্ষার্থে আত্মগোপন করে ও প্রাথমিক সংশয় কাটিয়ে মতৈক্যে এসে উপনীত হয় — ''হইব আর কী, ... তুমি মরবা, আমি মরুম, আর আমাগো পোলামাইয়াগুলি ভিক্ষা কইরা বেড়াইব।''[45] স্বাধীনদেশের রাজনৈতিক নেতারা ভোট রাজনীতির শোষণযন্ত্রে নিম্নবর্গীয় উদ্বাস্তুদের কেমনভাবে শোষণ করে — সেই কাহিনি ধরা আছে প্রফুল্ল রায়ের 'অনুপ্রবেশ' গল্পে। এইভাবে উচ্চবর্গীয় বিষাদ-আখ্যানের পাশে পশ্চিমবঙ্গের

সাহিত্যে দেশবিভাগের মার্ক্সবাদ-প্রাণিত আখ্যান, সংলগ্ন উপগ্রহের মতো গড়ে উঠেছে। একথা ঠিক দেশভাগের পূর্ব থেকেই বাঙালির রাজনীতির অবকাঠামো ছিল সাম্প্রদায়িক, কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে উপরিকাঠামোতে অসাম্প্রদায়িকতা ও প্রগতিশীলতাকে সমার্থক ধরা হয়েছিল। এক্ষেত্রে প্রগতি লেখক আন্দোলনের ভূমিকাকে অস্বীকার করা যাবে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ফ্যাসিবাদী বাহিনীর আগ্রাসী নীতি ও হিংস্র আচরণের বিরুদ্ধে যারা ছাপ-মারা মার্ক্সবাদী হিসেবে পরিচিত নন, এমন লেখকরাও প্রগতি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মার্ক্সবাদের প্রসারিত মানবিক আবেদন বাংলার এলিট সংস্কৃতিকে যে দলমত নির্মিশেষে প্রভাবিত করেছিল, একথা অনস্বীকার্য। সুতরাং প্রগতির আদর্শগত অনুপ্রেরণায় দেশভাগ বিষয়ক সাহিত্য রচনাকে সাম্প্রদায়িকতামুক্ত রাখার একটা দায় স্বীকার করে নিয়েছিলেন বাঙালি লেখককুল। এক্ষেত্রে ভেদবুদ্ধিহীন কাহিনি রচনা করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে সেগুলি বাস্তবের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করতে পারেনি, শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে ত্রুটিপর্ণ হয়ে থেকে গেছে, অসাম্প্রদায়িক মিলনভূমির প্রতি ঝোঁক বিবাদভূমির মূল সমস্যাগুলিকে কিছুটা সরলীকৃত করে ফেলেছে। যেমন নরেন্দ্রনাথ-মিত্রের পালঙ্ক ছোটগল্পটি। 'পালঙ্ক'টি ঐতিহ্যশালী হিন্দু সামন্ত প্রভুর মর্যাদা ও ক্ষমতার প্রতীক হিসেবে নির্মাণ করেছেন লেখক। মুসলমান ভৃত্য সেটিকে লাভ করে তাই হাতছাড়া করতে চায় না। প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্পর্কটি হিন্দু সামন্তপ্রভু ও মুসলমান ভৃত্যের ভিতর শিল্পের ঔচিত্যবোধ অনুযায়ী অনেকটা গড়ে উঠেও পরিসমাপ্তিতে রসাভাস ঘটে — যখন দেখি ভেদবুদ্ধিকে অস্বীকার করতে গিয়ে লেখক আকস্মিক শুভবুদ্ধির উদয়কে প্রাধান্য দিচ্ছেন। পরিসমাপ্তিতে প্রতিস্পর্ধী দুজনের হৃদয়াবেগ তাই আরোপিত মনে হত। রমাপদ চৌধুরীর 'করুণকন্যা' গল্পটিও পরিণামে এমনই আকস্মিক। ধর্ষিতা হিন্দুকন্যার বিধর্মী ধর্ষণকারীর প্রতি যে ঘৃণা ছিল, তা পরিণত হয় ভালবাসাতে, ধর্ষক-ও প্রেমিক হয়ে ওঠে। অসাম্প্রদায়িক মিলনভূমি রচনার ঝোঁকে লেখক মনস্তাত্ত্বিক যুক্তিক্রমকে অনুসরণ করেননি এক্ষেত্রে। বাস্তবের থেকে উপরে উঠে গিয়ে আদর্শবাদিতার জগতের এইধরনের ভারসাম্যের আখ্যানকেও প্রগতি-সংস্কৃতি প্রাণিত বলা যেতে পারে। অশোক মিত্রর স্মৃতিচারণায় দেখেছি মার্ক্স্বাদী মানুষটি অসাম্প্রদায়িকতাকে পরিহার করার জন্য দেশভাগের পরবর্তী উদ্বাস্তু জীবন

সম্পর্কে নীরব থেকেছেন — যদিও দেশভাগের কিছু পরে কলোনী রক্ষার জন্য উদ্বাস্তুদের সংগ্রামকে তাঁর দলই নেতৃত্ব দিয়েছিল, দণ্ডকারণ্যের পুনর্বাসনের প্রসঙ্গে তাঁদের রাজনীতি ছিন্নমূল মানুষদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল, তথাপি ক্যাম্পবাসী নিম্নবর্গীয় উদ্বাস্তুদের জীবনসংগ্রাম, অনাত্মবোধের যন্ত্রণা মার্ক্সবাদ-প্রাণিত বাংলাভাষার মহাআখ্যানে উঠে এল না। সেই প্রান্তীয় আখ্যান নির্মিত হল দলিত লেখক, সাধারণ মানুষদের স্মৃতিকথায়।

যে অবাস্তবতার ঝোঁক 'করুণকন্যা' ছোটগল্পে দেখা গেছে, তার থেকে মুক্ত জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপন্যাসটি। নায়িকা সুতারা বিবাদভূমিতে হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায় দ্বারাই অত্যাচারিত, অপমানিত। ওপারে দাঙ্গাকারী মুসলিমদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে, সে পিতামাতা, মান, দেশ সবই হারিয়েছে। এপারে নিজগোষ্ঠীর সংকীর্ণতা তাকে আশ্রয় দেয়নি, সমাজচ্যুত একঘরে করে রেখেছে। অন্তর্মুখী, নিঃসঙ্গ সুতারাকে দাঙ্গার সময় উদ্ধার করেছিল একটি মুসলমান পরিবার। তথাপি সুতারার অবলম্বনহীন আত্ম সেই পরিবারের ভালবাসাকে পূর্ণহৃদয় দিয়ে গ্রহণ করতে পারেনি, তাদের গোষ্ঠী পরিচয়ও ভুলতে পারেনি। দাঙ্গার ভয়াবহ ট্রমা তাকে বাধা দেয় ওই পরিবারের ছেলে উদারপন্থী আজিজেরকে বিবাহের প্রস্তাব গ্রহণ করতে। 'কেয়াপাতার নৌকো' উপন্যাসের ঝিনুক একইভাবে নির্যাতিত হয়ে হারিয়ে যায়। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসের মালতীও বিবাদভূমির ধর্ষিতা নারী। দাঙ্গা ও দেশভাগে নারী কেবল অত্যাচারের শিকার — এইভাবেই গড়ে উঠেছে নারীকেন্দ্রিক আখ্যান। যদিও মণিকুন্তলা সেন তাঁর স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন, নারী সেই ক্রান্তিকালে দাঙ্গাবাজদের সহায়কও হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে নারীর গৃহসংসারের ব্যক্তিগত পরিসর থেকে গণপরিসরে স্বাধীনতা লাভ ও উপার্জনক্ষম হয়ে ওঠা ছিল দেশবিভাগের সুফল — জানিয়েছেন কম্যুনিস্ট নেত্রী মণিকুন্তলা সেন তার স্মৃতিকথায়। সমরেশ বসুর 'পসারিণী' গল্পে আমরা পেয়ে যাই সেই নারীকে যে উপার্জনের জন্য পুরুষের নির্দিষ্ট কর্মজগতে প্রবেশ করে তাদের সঙ্গেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হকারি করে ট্রেনে, পুলিশের দ্বারা নির্যাতিত হয় কিন্তু তবুও সে ভেঙে পড়ে না। ক্রমশঃ নারীকে পুরুষরাও তাদের কর্মজগতে পথের সঙ্গী হিসেবে জায়গা করে দেয়। নারীর নিষ্ক্রিয় অত্যাচারিত ভূমিকার বিপরীত আখ্যান 'দয়াময়ীর কথা' স্মৃতিচারণাটি। সুনন্দার স্মৃতিচারণা থেকে আমরা জানতে পারি নিজ গোষ্ঠীগত পরিচয় রক্ষা

করে ভূসম্পত্তি দেখাশোনা করার জন্য তাঁর পিসি, যাকে তিনি মা বলে সম্বোধন করতেন, সম্পূর্ণ নিজের সিদ্ধান্তে বালিকা সুনন্দাকে নিয়ে একা বিবাদভূমিতে থেকে গেছিলেন। তিনি দেশত্যাগ করেছেন তাও সম্পূর্ণ নিজ সিদ্ধান্তে — সম্পত্তির সুবন্দোবস্ত করে। তেমনই প্রতিবাদী নারী চরিত্র হিসেবে সার্থক সৃষ্টি হাসান আজিজুল হকের 'আগুনপাখি' উপন্যাসের প্রধান কৃষিবধূ চরিত্রটি। নিরক্ষর বধূটির স্বামী ও সংসার ছাড়া কোন অস্তিত্ব ছিল না। ছিল না নিজস্ব মত ও বিবেচনাশক্তি। তাঁর স্বামী যখন বাইরের জগতের জাতীয়তাবাদ অথবা আত্মসত্তার রাজনীতি নিয়ে ভাবিত, জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দেয়, তখনই তার বিপরীতে বধূটির অজ্ঞতা ও সারল্য তার স্বাতন্ত্র্যকে নির্মাণ করে। বৃহৎ রাজনীতির কূটনীতি সম্পর্কে অজ্ঞানতাই তার বিবেকী অনুভবকে গড়ে তোলে ভালবাসার সঙ্গে এবং তার এই অনুভব তাকে উত্তীর্ণ করে এমন এক সত্যের প্রাঙ্গণে, যেখানে দাঁড়িয়ে সে বুঝতে পারে দেশভাগের অন্তঃসারশূন্যতা। এই তথাকথিত অজ্ঞান-অনুভব তার হারিয়ে যাওয়া নারী সত্তাকেও প্রতিষ্ঠিত করে এবং জীবনে প্রথমবার স্বামীর নির্দেশ, সন্তানদের অনুরোধ, নাতি-নাতনির প্রতি ভালবাসার কর্তব্য অস্বীকার করে সে আত্মসত্যের স্বপক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ও একাই থেকে যায় তার দেশের মাটিতে। নামহীন এই আগুনপাখিটি রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের মৃণালকে মনে করিয়ে দেয়। একথা ঠিক কৃষকবধূটির এই একাকী যাপন কতটা সহজ ও সুরক্ষিত থেকেছিল, অথবা বাস্তবসম্মত কিনা সে প্রশ্ন উঠতেই পারে। কিন্তু উল্লেখ্য যে বিষয়টি, হাসান আজিজুল হক দেশভাগের অর্থহীনতাকে চিহ্নিত করতে এই উপন্যাসে একজন নারীকে কাহিনি-কেন্দ্রে নিয়ে এলেন, তাঁর প্রেক্ষণবিন্দু থেকে জীবন ও সমস্যাকে ব্যাখ্যা করলেন এবং এইভাবে নারীকেন্দ্রিক মহাআখ্যানের প্রতিবাদী বিপরীত আখ্যান রচনা করলেন।

এইভাবে স্মৃতিকথা ও গল্প-উপন্যাসের তুলনা করলে দেখা যাবে উচ্চবর্গীয়দের ক্ষেত্রে স্মৃতিকথার সঙ্গে সৃজিত কাহিনির একটি মিথোজীবিতার সম্পর্ক থাকলেও নিম্নবর্গীয় আখ্যানের ক্ষেত্রে সেটি হয়ে দাঁড়িয়েছে বিপ্রতীপ-সম্পর্ক। ছিন্নমূলের আখ্যান নির্মাণে উচ্চবর্গীয়দের আধিপত্য প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্র ও প্রান্তের রাজনীতির পুরোনো সমীকরণেরই নতুন অভিব্যক্তি বলা যেতে পারে। বাংলাদেশের উপন্যাসদুটি তাঁদের আত্মপরিচয় অর্জনের সংগ্রামের এক নতুন অভিমুখের সন্ধান করতে চেয়েছে — স্মৃতিকথাগুলিতে যা স্পষ্ট নয়। নারীর স্মৃতির

আখ্যান নারীর চিরাচরিত ভূমিকাকে ভেঙে দিতে চায়, যদিও 'আগুনপাখি' উপন্যাসটি প্রতিবাদের স্বর নির্মাণে নারীর স্মৃতির সহযোগী হয়ে উঠতে চেয়েছে। এইভাবে স্মৃতিকথা ও কাহিনির সংবদ্ধ আলোচনা উদ্বাস্তু জীবনের আত্মপরিচয়ের রাজনীতিকে এক নতুন মাত্রা দিতে চেয়েছে।

তথ্যসূত্র

1. অলোক রায়, ''আত্মকথার স্বরূপ সন্ধান'', *কোরক সাহিত্য পত্রিকা, বাংলা আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথা সংখ্যা,* সম্পা-তাপস ভৌমিক, কলকাতা, ২০১৪, পৃ-১৪
2. মুজফ্ফর আহমদ, ''আমার কৈফিয়ৎ'', *আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি,* ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১০, পৃ-১৩
3. যতীন বালা, ''আশ্রয়স্থল না কি নরকের দরজা : শিয়ালদহ রেলস্টেশন ১৯৫০'', *গাঙচিল পত্রিকা, সূচনা সংখ্যা,* কলকাতা, ২০১৭, পৃ-১৯৩
4. তদেব, পৃ-১৯৪
5. তদেব, পৃ-১৯৪
6. তদেব, পৃ-১৯৫
7. তদেব, পৃ-১৯৯
8. বুদ্ধদেব বসু, ''নোয়াখালি'', *রক্তমণির হারে,* সম্পা-দেবেশ রায়, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, ২০১১, পৃ-৬৪
9. তদেব, পৃ-৬৫
10. বাসবী ফ্রেসার, ''পারাপার ও বিবাদভূমি : দেশভাগের গল্পে অনাত্মবোধ'', *পার্টিশন-সাহিত্য দেশ-কাল-স্মৃতি,* সম্পা-মননকুমার মণ্ডল, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১৪, পৃ-৫৯

মূল ইংরাজি প্রবন্ধটির শিরোনাম! "The Crossing and the Conflict Zone : the

Sense of (Un -) Belonging in Bengal Partition Stories"। অনুবাদক সুমন্তপাল। বাংলা অনুবাদে 'মিলনভূমি' ও 'বিবাদভূমি' শব্দদ্বয় অনুবাদক ব্যবহার করেছেন।

11. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, ''পুরী এক্সপ্রেসের রক্ষিতা'', *রক্তমণির হারে,* সম্পা- দেবেশ রায়, সাহিত্য অকাদেমী, কলকাতা, ২০১১, পৃ-৩৪৪

12. তদেব, পৃ-৩৪৫

13. নারায়ণ সান্যাল, *অরণ্যদণ্ডক,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০২২, পৃ-১৮৩

14. তদেব, পৃ-২৪৫

15. মনোরঞ্জন, ব্যাপারী, ''অনন্ত রাত্রির চণ্ডাল'', *দেশভাগ বিনাশ ও বিনির্মাণ,* সম্পা- মধুময় পাল, গাঙচিল,কলকাতা, ২০১১, পৃ-২৩১

16. নারায়ণ সান্যাল, *অরণ্যদণ্ডক,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০২২, পৃ-২৫

17. মনোরঞ্জন, ব্যাপারী, ''অনন্ত রাত্রির চণ্ডাল'', *দেশভাগ বিনাশ ও বিনির্মাণ,* সম্পা- মধুময় পাল, গাঙচিল,কলকাতা, ২০১১, পৃ-২১৫

18. রাধিকারঞ্জন বিশ্বাস, ''দণ্ডকারণ্যে যা দেখেছি, যা পেয়েছি'', *দেশভাগ বিনাশ ও বিনির্মাণ,* সম্পা- মধুময় পাল, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১১, পৃ-১৯৬

19. নারায়ণ সান্যাল, *বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্প,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১২, পৃ-৪২

20. তদেব, পৃ-৬৮-৬৯

21. রাধিকারঞ্জন বিশ্বাস, ''দণ্ডকারণ্যে যা দেখেছি, যা পেয়েছি'', *দেশভাগ বিনাশ ও বিনির্মাণ,* সম্পা- মধুময় পাল, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১১, পৃ-২০০

22. নারায়ণ সান্যাল, *বল্মীক,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৯, পৃ-১৭৪

23. তদেব, পৃ-১৮৩

24. তদেব, পৃ-১৮৩

25. তদেব, পৃ-২০৫

26. দেবেশ রায়, ''ভূমিকা, পুরাণ থেকে পুরাণ'', *রক্তমণির হারে*, সম্পা- দেবেশ রায়, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, ২০১১, পৃ-৩১-৩২

27. অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, *নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩, পৃ-৩৯৩

28. তদেব, পৃ-৩৯৩

29. তদেব, পৃ-৩৯৮

30. তদেব, পৃ-৩৮৬

31. তদেব, পৃ-৩৮৭

32. তদেব, পৃ-৩৯১

33. তদেব, পৃ-৩৯১

34. তদেব, পৃ-৩৬৫

35. তদেব, পৃ-৩৯৬

36. তদেব, পৃ-২১

37. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *খোয়াবনামা*, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ১৯৯৮ পৃ-৩২৬

38. Kamal, Ahmed, *State Against the Nation,* The University Press Limited, Dhaka, 2009, p-20

39. মিহির সেনগুপ্ত, ''বিষাদবৃক্ষ'', *উজানি খালের সোঁতা*, আনন্দ, কলকাতা, ২০০৭, পৃ-১৮৩

40. তদেব, পৃ-১৮৪

41. সন্‌জীদা খাতুন, *স্বাধীনতার অভিযাত্রা*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭, পৃ-৭১

42. তদেব, পৃ-৭১

43. তদেব, পৃ-৭১

44. নবেন্দু ঘোষ, ‘‘উলুখড়’’, *ভেদ বিভেদ*, সম্পা- মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৪, পৃ-২৫৫

45. সমরেশ বসু, ‘‘আদাব’’, *ভেদ বিভেদ*, সম্পা- মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৪, পৃ-৩৩২

ডায়াস্পোরা ও দেশভাগের স্মৃতিকথা

'ডায়াস্পোরা' শব্দটির উৎস একটি গ্রীক শব্দ যার বাংলা মানে ছড়িয়ে দেওয়া। কোন একটি বিশেষ গোষ্ঠীর এক জায়গা থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত হওয়ার বিষয়টিকে 'ডায়াস্পোরা' বলা হয়ে থাকে। সাম্প্রতিক জ্ঞানচর্চায় ডায়াস্পোরার আলোচনাকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এইকারণে — দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর একস্থান থেকে অন্যস্থানে চলে যাওয়ার ঘটনাগুলি বিশেষভাবে প্রশ্ন করা শুরু করেছে জাতীয়তাবাদ এবং জাতিগত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারণাগুলিকে। ডায়াস্পোরার ধারণাটি কিন্তু জ্ঞানচর্চার দুনিয়ায় একটি নির্দিষ্ট স্বতঃসিদ্ধ ধারণা হয়ে থাকেনি। বিভিন্ন বিতর্ক ও আলোচনা ডায়াস্পোরার ধারণাকে গতিশীলতা দান করে বিভিন্ন মাত্রা যোগ করতে পেরেছে। গত শতকে ডায়াস্পোরা কেন্দ্রিক আলোচনার যখন উত্থান, সেই সময় থেকেই দুটি বিপরীত মুখী মতবাদ গড়ে উঠেছে। প্রথম দল সমাজবিজ্ঞানী ইহুদীদের অভিবাসনকেই প্রাথমিকভাবে 'ডায়াস্পোরা' হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। কিন্তু অপর একদল সমাজবিজ্ঞানী বিষয়টিকে আরও বিস্তৃত ও সমৃদ্ধতর করে তুললেন তাঁদের চর্চার মাধ্যমে। তাঁদের বক্তব্য অনুযায়ী পৃথিবী জুড়ে যে কোন ধরণের, যে কোন গোষ্ঠীর অভিবাসন — যা নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমানাকে অতিক্রম করে যায়, তাকেই ডায়াস্পোরা হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

বস্তুতঃ পৃথিবীর একস্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার ইতিহাসটি বেশ প্রাচীন। যদিও এই যে স্থানান্তরিত হওয়া, তার কারণগুলি সকল সময় এক নয়। পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে বহু প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবসায়ীরা নিজেদের জন্মভূমির থেকে বহুদূরবর্তী বিভিন্ন জায়গায় যেতে অভ্যস্ত ছিল। উনিশ শতকের উপনিবেশের সময় থেকে স্থানান্তরিত দ্বিতীয় আর একটি গোষ্ঠীর কথা জানা যায়। বৃটিশদের বিভিন্ন উপনিবেশ থেকে — ভারত থেকেও — ক্রীতদাসদের বাধ্য করা হয়েছিল নিজেদের জন্মভূমি ত্যাগ করে অন্যত্র গিয়ে শ্রমদান করার জন্য। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে পৃথিবীজোড়া পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে আরও বেশ কিছু মানুষ অথবা গোষ্ঠী এছাড়াও বিভিন্ন কারণে স্থানান্তরিত হতে শুরু করল। ভারত থেকে একদল

উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ উন্নততর জীবন, উপার্জন, শিক্ষার আশায় চলে গেলেন পশ্চিমের উন্নত দেশগুলিতে। আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার কিছুদিন পর ভারত উপনিবেশ বিভক্ত হয়ে তিনটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হ'ল। দেশভাগ — বহু মানুষকে তাদের জন্মভূমি ত্যাগে বাধ্য করল। ভারতের পূর্বদিকে বাংলাতেও দেখি তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তান ত্যাগ করে বহুসংখ্যক হিন্দু নবসৃষ্ট রাষ্ট্রসীমা অতিক্রম করে চলে এলেন পশ্চিমবাংলায়, আবার বেশ কিছু সংখ্যক মুসলমানও চলে গেলেন পূর্বপাকিস্তানে। অর্থাৎ অভিবাসন কখনও স্বেচ্ছায় হয়, আবার কখনও মানুষ বাধ্য হয় জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে অন্য স্থানে, অন্য সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে গিয়ে সমঝোতার জীবন যাপন করতে। সুতরাং হেতুর বিচারে অভিবাসন বা ডায়াস্পোরার বিভিন্ন বিভাগ।

বিভিন্ন কারণে স্থানান্তরিত মানুষগুলির ভিতর কতকগুলি বিশেষ চেতনা দেখা যায়। নতুনভূমিতে তারা একভাবে প্রান্তীয় হয়ে থাকেন, নিঃসঙ্গতার অনুভূতি তাঁদেরকে গ্রাস করে। জন্মভূমির জন্য কাতরতা থেকেই ফেলে আসা জন্মভূমির কিছু সাংস্কৃতিক চিহ্নকে এই মানুষেরা নতুন বসতিতে যাপনের অংশ করে তোলেন। অতীত জন্মভূমি, সেখানকার ঐতিহ্য, সংস্কৃতি — এসবই নিয়েই জন্মভূমির স্মৃতি থেকে গড়ে ওঠে নয়া রূপকথার জগৎ। তবে নতুন ভূমিতে মূলধারার অঙ্গীভূত হওয়ার প্রচেষ্টাও অভিবাসী মানুষদের থাকে। ফেলে আসা জন্মভূমি ও নতুন ভূমি — এই দুই জায়গাতে তাদের সত্তা যেন বিভক্ত হয়ে যায়। দুই রাষ্ট্র সীমার মধ্যবর্ত্তী কোন একস্থানে যেন অভিবাসী মানুষজনের বসবাস। এই মধ্যবর্তী স্থান অথবা তৃতীয় পরিসরটিতে দুটি সংস্কৃতির একরকম সমঝোতা যেমন হয়, দ্বন্দ্বও হয়, আবার পুনর্মূল্যায়ণও হয়। তৃতীয় পরিসরের এই মানুষগুলির সত্তাপরিচয় কোন রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমানা-বেড়ির দ্বারা বাঁধা পড়ে না। বস্তুতঃ রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সীমানা অতিক্রম করে নতুন দেশে প্রবেশ করলেও, মনের গভীরে জন্মভূমির সীমারেখা সম্পূর্ণভাবে অতিক্রম করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। সুতরাং এক মিশ্রিত সত্তার অধিকারী হয় এই মানুষগুলি। আমেরিকায় বসবাসকারী অভিবাসী বাংলাদেশী তারিক মাসুদের একটি বক্তব্যে মিশ্রিত সত্তার এই অভিবাসী চেতনা স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়েছে — "I discovered myself in New York as I discovered myself in Dhaka."[1]। অভিবাসনের এই চেতনা অনেক ক্ষেত্রেই আত্মসত্তা পরিচয়ের সংকট তৈরী করে এবং খণ্ডিত সত্তার এই অভিবাসী মানুষটি

নিজের নির্দিষ্ট 'ঘর' হারিয়ে ফেলে। সলমন রুশদির ভাষায় — "Home has become such a scattered, damaged, various concept in our present travel."[2]। অভিবাসী মানুষের অনুভবে তাঁদের নিজস্ব ঘর নেই — কারণ কোন নির্দিষ্ট একক সংস্কৃতির সংলগ্নতা তাঁর আত্মপরিচয়কে সুনির্দিষ্ট রূপ দিতে পারেনি। সুতরাং অভিবাসী জীবনে আত্মপরিচয়ের সংকট প্রধান সমস্যা হয়ে দেখা দিতে পারে।

অভিবাসী চেতনার এইসকল লক্ষণ নিয়ে গড়ে উঠেছে সমৃদ্ধশালী অভিবাসী সাহিত্য অথবা ডায়াস্পোরা সাহিত্য। ভারতীয় অভিবাসী সাহিত্য বেশ কিছু শক্তিশালী লেখকের হাতে গড়ে উঠেছে। অমিতাভ ঘোষ অথবা ঝুম্পা লাহিড়ীর মত বাঙালি অভিবাসী সাহিত্যিক সাহিত্য জগতে বহু আলোচিত দুটি নাম। দেশভাগের পরেও বহুসংখ্যক মানুষ স্থানান্তরিত হয়েছেন — স্মৃতিকথার বয়ানে তাঁদের আত্মপরিচয়ের স্বরূপ সন্ধান আমরা করেছি পূর্ববর্তী অধ্যায়ে। কিন্তু ঝুম্পা লাহিড়ির 'নেমসেক' উপন্যাসের অভিবাসী চরিত্র অসীমা ও অশোক এবং দেশভাগ বিষয়ক স্মরণকর্তার চেতনা ও অনুভব সম্পূর্ণ এক হওয়া কখনই সম্ভব নয়। কারণ 'নেমসেক' উপন্যাসের অসীমা-অশোক পশ্চিম দেশে চলে গিয়েছিলেন স্বেচ্ছায়, উন্নততর জীবনযাপনের আকাঙ্খা নিয়ে। দেশভাগের স্মৃতিকথা যাঁরা লিখছেন তাঁরা স্বেচ্ছায় কেউ জন্মভূমি ত্যাগ করেননি অথবা উন্নততর জীবনের স্বপ্ন তাঁদের ছিল না, পরন্তু কঠোর জীবন সংগ্রাম তাঁদের অসহায় উদ্বাস্তু জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বস্তুতঃ বিতাড়িত জনগণের প্রবাহকে 'পরিযান' অথবা মাইগ্রেশন বলতে রাজী হননি অনেক সমালোচক। এই মর্মস্পর্শী প্রস্থানকে বোঝানো যেতে পারে displacement অথবা স্থানান্তরিতকরণ শব্দের দ্বারা — যে শব্দের ব্যঞ্জনা হ'ল ছিন্নমূল হওয়া। তবে এইভাবে যুদ্ধ অথবা দাঙ্গার কারণে স্থান ত্যাগ করার ঘটনাকে সমাজবিজ্ঞানের পরিভাষায় 'victim diasora' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। 'ভিকটিম ডায়াস্পোরা' পরিভাষাটি প্রথম ব্যবহার করেন Robin Cohen, 1997 সালে। তিনি ডায়াস্পোরার বিভিন্নতার কথা উল্লেখ করেন তাঁর বিখ্যান গ্রন্থ "Global Diaspora" গ্রন্থে। ওই গ্রন্থেই তিনি ভিকটিম ডায়াস্পোরা হিসেবে চিহ্নিত করেন ইহুদি, আফ্রিকান, প্যালেস্টানিয়ান প্রমুখদের অভিবাসনকে।[3] দেশভাগের পরে বাংলার মানুষদের অভিবাসনকেও ভিকটিম ডায়াস্পোরা বলা যায়। উল্লেখ্য, ঐতিহাসিক জয়া চ্যাটার্জ্জী তাঁর গ্রন্থ

"The Spoils of Partitions" গ্রন্থে বাংলার দেশভাগ জনিত আলোচনার পর্বটিকে Bengal diaspora হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বিতাড়িত মানুষগুলির অনেকেই যুদ্ধ অথবা দাঙ্গায় আক্রান্ত হয়ে দেশত্যাগী, এছাড়াও অন্য অনেকের আক্রান্ত হওয়ার বাস্তব অভিজ্ঞতা না হলেও আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে, আতঙ্কে দেশ ছেড়েছে আবার পূর্ববঙ্গের উচ্চবর্ণীয় হিন্দুরা সামাজিক সম্মান ও ক্ষমতা হারানোর ভয়েও অনেকে দেশ ছেড়েছে।

সব হারানো এইসব মানুষদের নিয়ে যে আখ্যান গড়ে উঠবে তার সঙ্গে সাধারণ অভিবাসী আখ্যানের মৌলিক সাদৃশ্য থাকলেও তার আখ্যানদেহ বিতাড়ণের ক্ষত বহন করে স্বতন্ত্র বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যকেও প্রতিফলিত করে। এখন প্রশ্ন হ'ল ভারত বিভাগের পর পশ্চিমপ্রান্তে এবং পূর্বপ্রান্তেও যে সকল উপন্যাস-ছোটগল্প-স্মৃতিকথা লিখিত হয়েছে, সেই সাহিত্যসম্ভারকে কি ভিকটিম ডায়াস্পোরা সাহিত্য বলা যাবে? অথবা দেশভাগ বিষয়ক সাহিত্য হিসেবে একটি স্বতন্ত্র বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করে প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানচর্চা এইসব লেখার মূল্যায়ণ করবে? একথা ঠিক, দেশভাগের পরে ভারতের দুইপ্রান্তে বিশাল সংখ্যক মানুষ রাষ্ট্রসীমা অতিক্রম করে অভিবাসী হয়েছেন। অভিবাসী মানুষের মধ্যে সত্তার দ্বিধাবিভক্তি জনিত যন্ত্রণার মর্মান্তিক আখ্যানরূপ সাদাত হোসেন মান্টোর 'টোবা টেক সিং' ছোট গল্পটি। মান্টো ব্যক্তিগত জীবনেও অভিবাসিত হয়েছেন — যদিও দেশভাগকে তিনি কখনই সঙ্গত মনে করতে পারেননি। পূর্বপ্রান্তেও দেশভাগ বিষয়ক উপন্যাস, ছোটগল্প রচিত হয়েছে। তবে মনে রাখা দরকার, অভিবাসী সাহিত্য হিসেবে বহুচর্চিত ভাণ্ডারটি গড়ে উঠেছে অভিবাসী সাহিত্যিকদের লেখনীর মাধ্যমে। নিজেদের অভিবাসিত জীবনের অনিশ্চয়তা, অসঙ্গতিকে তাঁরা মূর্ত করে তুলেছেন তাঁদের সৃষ্ট কাহিনিরূপের বিভিন্ন কাল্পনিক চরিত্রের মাধ্যমে। কিন্তু দেশবিভাগ বিষয়ক উপন্যাস-ছোটগল্প যে সকল ক্ষেত্রে অভিবাসিত শিল্পীর বোধের প্রকাশ — এমনটি নিশ্চিত করে বলা যাবে না। এই কারণে দেশবিভাগ বিষয়ক সাহিত্য — বিশেষভাবে পূর্বপ্রান্তের লেখাগুলি — অভিবাসী চেতনার পরিধিকে অতিক্রম করে গিয়ে আরও বিভিন্ন স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ভারত উপমহাদেশের মূল স্রোতধারার চিন্তন, ভাবধারা, আদর্শের বৈচিত্র্য প্রভাবিত করেছে দেশভাগ বিষয়ক সাহিত্যকে বিভিন্নভাবে। সেইসকল বৈশিষ্ট্যের কথা বিবেচনা করে এই সকল উপন্যাস-ছোটগল্পকে 'দেশভাগের সাহিত্য' অথবা

'দেশভাগ বিষয়ক সাহিত্য' এইভাবে চিহ্নিত করে চর্চা করা উচিত, — এমনকি কিছু অভিবাসী সাহিত্যলক্ষণ থাকলেও। তবে স্মৃতিকথাগুলি — আমাদের আলোচ্য পূর্বপ্রান্তের স্মৃতিকথাগুলি যাঁরা লিখেছেন, — তাঁরা কিন্তু নিজেরাও অভিবাসিত মানুষজন। দেশভাগের পরে তাঁদের বিতাড়িত হওয়ার যন্ত্রণার সঙ্গেই অভিবাসিত জীবনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সংগ্রাম, স্বপ্ন, আকাঙ্খা রূপ পেয়েছে স্মৃতির আখ্যানে। সুতরাং স্মৃতিকথার উচ্চারণকে ভিকটিম ডায়াস্পোরা সাহিত্য হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এইসকল মানুষ যখন দেশহারানোর স্মৃতিচারণা করেন তখন ভিকটিম ডায়াস্পোরার আখ্যানেও বিভিন্ন রকমের প্রকারভেদ দেখা দেয়। এই প্রকারভেদ অবশ্যই ধর্ম-শ্রেণি-জাত-পাত-লিঙ্গ জনিত কারণে। নিম্নবর্ণীয়দের অনেকেই প্রত্যক্ষ দাঙ্গায় আক্রান্ত হয়ে অথবা আতঙ্কে দেশ ছেড়েছেন। সম্পন্ন বর্ণহিন্দুরা দেশ ছেড়েছেন সম্মানহানির ভয়ে। তাঁরা অনেকেই আবার পরবর্তীকালে ইউরোপ-আমেরিকাবাসী হয়েছেন। সুতরাং দেশভাগ বিষয়ক স্মৃতিকথাগুলিতে অভিবাসী স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য বেদনা অথবা উদ্বাস্তু চেতনাও একইরকমভাবে পরিস্ফূট নয়। অর্থাৎ যাঁরা দেশভাগের কারণে দেশ ছেড়েছেন, তাঁদের সবাইকে সমসত্ত্ব উদ্বাস্তু গোষ্ঠী ধরে নিয়ে আলোচনা করলে তা ভ্রমাত্মক হতে বাধ্য।

Identity crisis অথবা সত্তাপরিচয়ের দ্বিধাবিভক্তি জনিত সংকট অভিবাসীদের অথবা অভিবাসী সাহিত্যের চরিত্রদের একটি সাধারণ স্বাভাবিক লক্ষণ। ঝুম্পা লাহিড়ির 'নেমসেক' উপন্যাসের গোগোল বুঝতে পারে না সে আমেরিকান নাকি ভারতীয়? মিশ্র সত্তার দ্বন্দ্ব গোগোলকে দিশাহারা করেছে। পূর্ববাংলা থেকে যাঁরা পশ্চিমবাংলায় আন্তর্জাতিক সীমা অতিক্রম করে চলে এলেন তাঁদের মধ্যেও সত্তাপরিচয়ের দ্বিধাবিভক্তি ছিল না — এমনটি বলা যাবে না। তবে গোগোল অথবা তার বাবা মা যে দুটি দেশের ভিতর ছড়িয়ে ছিল, সেই আমেরিকা ও ভারতের সংস্কৃতি সম্পূর্ণ পৃথক। কিন্তু পূর্ববাংলা থেকে যাঁরা সীমানা অতিক্রম করে এপারে এলেন অথবা এপার থেকে ওপারে গেলেন, এইদুটি প্রতিবেশী দেশের মানুষের সংস্কৃতি প্রায় সমরূপ; দেশবিভাজনের পূর্বে সমগ্র ভূখণ্ডটির সমাজ-সংস্কৃতির একক পরিচয়-ই ছিল। সুতরাং দেশভাগের পরে যে অভিবাসন, তার সত্তাপরিচয়ের দ্বিখণ্ডতার ধরন পৃথক। এই মানুষগুলির জীবনচারণের সংলগ্নতা ছেড়ে আসা কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে নয়, তাঁদের জন্মভূমি গ্রামের সঙ্গে অথবা জেলার সঙ্গে।

মিহির সেনগুপ্তর ফেলে আসা দেশের স্মৃতিকথাসমূহকে বরিশালের অপর ভূমিপুত্র ঐতিহাসিক তপন রায়চৌধুরী 'বরিশাল সমগ্র' নামকরণ করেছেন। গ্রন্থটির প্রথমে সুরসিক তপন রায়চৌধুরী খাঁটি বরিশালের উপভাষায় মুখবন্ধ রচনা করেছেন। বরিশালের ভাষা, সংস্কৃতি বিষয়ে মিহির সেনগুপ্ত জেলা-সম্পর্কের আত্মীয়তাবোধে পত্র লিখেছেন তপন রায়চৌধুরীকে। তপনবাবু এরপর ভারত ছেড়ে পশ্চিমদেশ প্রবাসী হয়েছেন, মিহির থেকেছেন কলকাতাতেই। কিন্তু বরিশাল এক বিনি সুতোর বাঁধনে দুজনকে যে বেঁধে রেখেছে — তা উভয়ের বরিশাল-যাপন বিষয়ক স্মৃতিচারণার প্রতি পারস্পরিক আগ্রহ থেকেই প্রমাণিত হয়। মিহির সেনগুপ্ত বরিশালের ভাষা, লোকসংস্কৃতি এসব কিছুর প্রতি তীব্র সংলগ্নতার প্রমাণ রেখেছেন ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণার সঙ্গে আরও কিছু অন্য লেখাতেও। তেমনই একটি রচনাতে তিনি লিখেছেন — ''স্থানীয় নিরুক্তিতে সবাই বলত'' ছুডি ধোপাজি''। এখানে 'জি' অর্থে 'ঝি' অর্থাৎ ছুডি ধোপাঝি। এ-স্থানে উচ্চারণে 'ট' কোথায় 'ড' হয় এবং 'ঝ' 'জ', ...। ... আমার এবং ছোডির ... উভয়েরই দেশ বরিশাল। বাংলাদেশ বললাম না এ-কারণে যে, প্রতিটি বরিশালিয়া মনে করে বরিশাল একটি আলাদা দেশ ...।''[4]

মিহির সেনগুপ্তর যে গ্রন্থটিকে তপনবাবু 'বরিশাল সমগ্র' বলে আখ্যা দিয়েছেন, সেই গ্রন্থটির একটি রচনাতে তিনি লিখেছেন — ''বরিশাল নামক ভূভাগটিকে এই রচনায় চন্দ্রদ্বীপ বলে এবং তৎস্থানীয় ভূমিপুত্রদের চন্দ্রদ্বৈপায়ন অভিধায় ভূষিত করলে, আশা করি কেউ আপত্তি করবেন না।''[5] বরিশালকে চন্দ্রদ্বীপ নামে উল্লেখ করে মিহির বরিশাল জেলার হিন্দু রাজবংশের গৌরবময় অতীত ইতিহাসকে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছেন। তাঁর জন্মভূমি জেলার অতীত ইতিহাস সন্ধানকে ন্যায্যতা দিয়ে তিনি উক্ত রচনাটিতে লিখেছেন — ''সবাই মানবেন যে কুল, মেল, শেকড়াদির সুলুক সন্ধান করা মানুষের প্রায় শাশ্বত এক স্বভাব।''[6] উদ্বাস্তু জীবনে জন্মভূমির ইতিহাসচর্চার প্রয়োজনীয়তা প্রকৃতপক্ষে স্থানান্তরিত উদ্বাস্তুদের অনিশ্চিত সত্তাপরিচয়ের যাতনা সঞ্জাত, তাই তিনি বলেছেন — ''নইলে তো সবাই মহানগরের মহাসমুদ্রের জেলিফিস।''[7] চন্দ্রদ্বীপ নামের স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত ভূখণ্ডটির লোকায়ত জীবনের ইতিহাস;— নিজস্ব ভাষা-সংস্কৃতির পরিচয়বহ 'শোলোক-শাস্তর-পল্‌কি'র মহিমার কথা তিনি বিবৃত করেছেন তাঁর রচনায়। আবার অশোক চৌধুরী তাঁর জন্মভূমি-জেলা নোয়াখালির সমৃদ্ধ ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে শক্তিশালী রাজবংশ ও

তাঁদের দ্বারা স্বয়ংসম্পূর্ণ রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। সে ইতিহাসে সংযুক্ত হয়েছে নোয়াখালি জেলার উচ্চবর্গীয় হিন্দু জনজাতির গৌরবময় অধ্যায় এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নোয়াখালির ভূমিকার কথা। অশোকবাবু ও মিহিরবাবু দুজনেই সত্তার পরিচিতিকে জন্মভিটার সঙ্গে অন্বিত করার ক্ষেত্রে যে ভাবে সেই অঞ্চলের গৌরবান্বিত ইতিহাসকে বিবৃত করেছেন — সেই আবেগ জাতীয়তাবাদী আবেগের সঙ্গেই তুলনীয় হয়েও প্রতিস্পর্ধী। কারণ এই আঞ্চলিক সত্তাপরিচিতির আবেগ ভারতরাষ্ট্রের সমসত্ত্ব জাতি কল্পনার ক্ষেত্রে একটি প্রশ্নচিহ্ন হয়ে দাঁড়ায়। মিহির ও অশোকের মত এরকম অনেকেরই সংলগ্নতা ছিল তাঁদের জন্মভূমির জেলার প্রতি এবং তাঁদের আঞ্চলিক পরিচয়কেই তাঁরা প্রাধান্য দিয়েছেন। সুতরাং পূর্ববঙ্গ ছেড়ে তাঁরা যখন পশ্চিমবঙ্গে এলেন, তখন তাঁদের মধ্যে 'দেশ' হারানোর জন্য যে যন্ত্রণা ক্রিয়াশীল, তা রাষ্ট্র হারানোর জন্য নয়, এমনকি উচ্চবর্ণের হিন্দুদের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পরিচয় হারানোর যন্ত্রণাও নয়। তাঁদের এই 'দেশ'-এর ধারণার সঙ্গে পুরুষাণুক্রমিক বংশধারা ও পিতৃপুরুষের ভিটের একটি সুস্পষ্ট যোগ আছে। সেইকারণে বাংলাভাষায় 'দেশ' হারানো মানে নিজস্ব ভূমি হারানো — যে ভূমিতে তাঁদের ভিটে, যে ভূমির চিরপরিচিত প্রকৃতি-সমাজ-সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁদের সংযোগ।

পিতৃপুরুষের ভিটা এবং আজন্মের পরিচিত ভূমির প্রতি নস্টালজিক আবেগ থেকে তাঁরা সেই জেলা, ভূমি অথবা গ্রামের ইতিহাস, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, হিন্দু সংস্কৃতির আধিপত্যময় স্বর্ণযুগ — এ সব কিছু মিলিয়ে এক কল্পনার জন্মভূমি সৃজন করেছেন তাঁদের মনে, তাঁদের স্মৃতিতে, তাঁদের লেখায়। তাঁরা নাগরিক অধিকার ভোগ করেন একদেশের, কিন্তু তাঁদের আবেগ যে ভূমিকে কেন্দ্র করে তা তাঁদের কাছে বিদেশ। এক্ষেত্রে অপর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, উপনিবেশের মানুষ হিসেবে তাঁদের জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেম ছিল ভারতের প্রতি, সেইকারণেই অশোক চৌধুরীর নোয়াখালির বৃত্তান্ততে স্বদেশী আন্দোলনে নোয়াখালির ভূমিকা নোয়াখালির আঞ্চলিক অণু-ইতিহাসের পাশে সমান গুরুত্ব সহকারে জায়গা পেয়েছে। দেশভাগের পরে দেখা গেল তাদের জাতীয়তাবাদী চেতনা ও জন্মভূমির প্রতি আবেগ একটা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করছে, সমান্তরালে আর লালন করা যাচ্ছেনা। অভিবাসী সাহিত্যিক অমিতাভ ঘোষের বিখ্যাত উপন্যাস 'শ্যাডো লাইন্স'-এ কথকের ঠাকুমার চরিত্রটিতে এই দ্বন্দ্বের প্রকাশ দেখি। স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী

ঠাকুমার জাতীয়তাবাদী ধারণা গড়ে উঠেছিল ভারতকে কেন্দ্র করে। দেশভাগের পর দেখা গেল, তাঁর জাতীয়তাবাদী আনুগত্য যে রাষ্ট্রের প্রতি, তাঁর জন্মভূমি সেই রাষ্ট্র থেকে বিচ্যুত; — বিদেশে। দেশবিভাজনের পর ঢাকায় ফিরে গিয়ে ঠাকুমার আবেগ যেন ঘরে ফেরার, নিজেকে তিনি ঢাকাইয়ান হিসেবে চিহ্নিত করে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেও তাঁর পুত্র তাঁকে সদা সতর্ক করে দেয়, ঢাকা এখন বিদেশ। ঘরে ফেরার এই আবেগ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বাংলাভাষার স্মৃতিকথায় উঠে এসেছে। মিহির সেনগুপ্ত দেশত্যাগের অনেক বছর পরে যখন গ্রামে গেছেন, তার বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে — ''ঘাটে যারা আমাদের আপ্যায়ন করে নিতে এসেছে, তারা সব আত্মজন, বেতস-শরীর বৃদ্ধ আমার সৈয়দ আলি চাচা।''[৪] ''সিদ্ধিগঞ্জের মোকাম'' নামক রচনাটির 'প্রাক্-বচন' অংশে তিনি লিখেছেন — ''সব মানুষেরই থাকে এক সিদ্ধিগঞ্জের মোকাম। ... হৃদয়বৃত্তের অলখ বলয়ের সাতরঙের হাতছানিতে সে আমাকে পৌঁছোয় যে স্থানে, সেই আমার মোকাম — আমার সিদ্ধিগঞ্জের মোকাম।''[৯] 'মোকাম' অর্থে বাড়ি। নিজের গৃহহীন দশার বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন — ''১৯৬৩-র কোনও একটা সময়ে এইসব আত্মজনের আবেষ্টনী ছিঁড়ে আমাকে এসে পড়তে হয়েছিল নাগরিকতার এই চক্রব্যূহে।''[10] দেশভাগের পর ভারতের পাসপোর্ট বহন করেও মহানগর কলকাতাতে মিহির তাঁর 'ঘর' খুঁজে পাননি। ঠিক এমনটিই আমরা দেখেছি ঝুম্পা লাহিড়ির 'নেমসেক' উপন্যাসের অশোক-অসীমার ক্ষেত্রে, আমেরিকার নাগরিকত্ব অর্জন করেও নিজেদের বিদেশী মনে হয়েছে, 'ঘর' খুঁজে পায়নি সেখানে। যে ভূমিতে জন্ম, সেই ভূমির থেকে অসীম-অশোক স্বেচ্ছায় চলে গেছে, কিন্তু মিহির চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। যে ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া; অশোক-অসীমার ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক ভাবে তা একেবারেই ভারতীয় সংস্কৃতির বিপরীত, — মিহিরের ক্ষেত্রে তা নয়। কারণ পূর্বপাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির পার্থক্য নেই। পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের সীমানা কোন প্রাকৃতিক ভেদরেখা নয়; — একেবারেই রাজনৈতিক; কিন্তু মিহির বাস্তব জীবনে সেই রাজনৈতিক সীমানা অতিক্রম করতে বাধ্য হলেও, মনের গভীরে বরিশালের সীমানা অতিক্রম করতে পারেননি।

রাজনৈতিক ভেদরেখাটি দুই বঙ্গের মানুষের মনে আরও নানাভাবে অস্তিত্বসংকট তৈরী করেছিল। বাংলাদেশের বিখ্যাত অধ্যাপক আনিসুজ্জামান শৈশবে কলকাতায় থাকতেন। কোন্

জেলা ভারতে পড়বে এবং কোন্‌টি পাকিস্তানে — এই নিয়ে সাধারণ মানুষের অনিশ্চয়তাবোধের কথা আনিসুজ্জামানের স্মৃতিকথায় ধরা আছে — ''১৫ তারিখ খুলনায় ভারতীয় পতাকা এবং মুর্শিদাবাদে পাকিস্তানের পতাকা তোলা হল। দিন দুই পরে বাউন্ডারি কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হলে খুলনা পাকিস্তানভুক্ত এবং মুর্শিদাবাদ ভারতভুক্ত হল। আমলারা নতুন করে আনুগত্যের শপথ নিলেন।''[11] আনিসুজ্জামানের বক্তব্যে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ও শপথ গ্রহণের কৃত্রিমতা ধরা পড়ে যায়। জাতীয় পরিচয় নিয়েও যে দোলাচলতা তৈরী হয়েছিল মানুষের মনে তা-ও ধরা পড়ে অধ্যাপকের পরবর্তী বক্তব্যতে — ''কলকাতা থেকে আমরা যশোরে গিয়েছিলাম ব্রিটিশ ভারতের এক মহানগর থেকে অন্য শহরে, ফিরে এলাম সার্বভৌম পাকিস্তান থেকে স্বাধীন ভারতে।''[12] নাট্যব্যক্তিত্ব মনোজ মিত্রর স্মৃতিচারণাতেও দেখি বিবৃত হয়েছে দেশভাগের সময়ে ভবিষ্যৎ জাতি পরিচয়কে কেন্দ্র করে তাঁদের অনিশ্চয়তাবোধের কাহিনি — ''সাতচল্লিশের মে-জুনে সরকারি কর্মচারীদের কাছে বার্তা গেল : ভারত না পাকিস্তান — ... বাবার অবশ্য দু'বার ভাবার কোনও কারণই ছিল না। পিতৃপুরুষের বাসভূমিটি খুলনায়, আর খুলনা জেলা পড়তে চলেছে ভারতে। শিকড়ের টানেই তাঁর নির্বাচন — ভারত।''[13] সুতরাং পরিবারসহ মনোজ মিত্রর বাবা চাকরিস্থল ময়মনসিংহ ত্যাগ করে খুলনার অভিমুখে যাত্রা করলেন। কলকাতা ঘুরে দেশবিভাজন ও স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরের দিন খুলনা সদর স্টেশনে এসে পৌঁছালেন। তখনও তাঁদের শিকড়ের টান ও জাতীয়তাবাদী আবেগের কোন দ্বন্দ্ব নেই। মনোজবাবু সেই স্টেশনে যাপনের কিছু মুহূর্ত বর্ণনা করেছেন এইভাবে — ''আচার্য প্রফুল্ল রায়ের গাঁয়ের মেয়ে মা। শুনলাম আচার্যের বাড়িটা কাল স্বাধীনতা দিবসে তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। ... গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের খবর নিল মা। স্বদেশি আন্দোলনে বহুবার জেল খেটেছেন তিনি। ... হঠাৎ বন্দে মাতরম্ ধ্বনিতে চমকে দেখি ওই দূরে সাদা ধবধবে খাদির ধুতি পাঞ্জাবি আর গান্ধিটুপিতে সজ্জিত এক সৌম্যদর্শন যুবককে ঘিরে একদল ছেলে রীতি মতো আলোড়িত হয়ে উঠেছে।''[14] কিন্তু সেই মুহূর্তের দ্বিধাহীন মানুষগুলি পরেরদিনই বুঝতে পারলেন তাঁদের পরিচয় আন্তর্জাতিক সীমারেখার দুইপ্রান্তে দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে। মনোজবাবুর বাবা জানালেন — ''দুদিন ভারতে থাকার পর কাল মাঝরাতে খুলনা পাকিস্তানে চলে গেল। মুর্শিদাবাদের সঙ্গে পাল্টাপাল্টি হয়েছে।''[15]

দেশ-বিদেশ নিয়ে আত্মপরিচিতির এই দ্বন্দ্ব স্থানান্তরিত জীবনের অন্যতম প্রধান লক্ষণ। এই দ্বন্দ্বের অন্যতম কারণ আন্তর্জাতিক সীমারেখার দ্বারা পরিবারের দ্বিধাবিভক্তি। অমিতাভ ঘোষ, ঝুম্পা লাহিড়ির অভিবাসী সাহিত্যে দেখেছি এই জীবনের প্রকাশ। 'শ্যাডো লাইন্স্'-এর ঠাকুমা চরিত্রটির বয়োবৃদ্ধ জ্যাঠামশাই পূর্বপাকিস্তান ত্যাগ করেননি, ঠাকুমা ও তাঁর পরিবার ছিন্নমূল হয়ে কলকাতার গোলপার্ক অঞ্চলে বাসা বেঁধেছে, ঠাকুমার বোন ও তাঁর পরিবার আমেরিকা প্রবাসী হয়েছেন। 'নেমসেক' উপন্যাসের শেষে অশোকের মৃত্যুর পর অসীমা ঠিক করেছে সে ছয়মাস আমেরিকাতে কাটাবে, ছয়মাস ভারতে নিজ পরিজনদের সঙ্গে কাটাবে। দেশভাগের পরেও সীমানার এপার-ওপারে ভগ্নপরিবার থেকে গেছে। তবে যাঁরা স্বেচ্ছায় অভিবাসী হয়েছেন, তাঁদের মত সীমারেখা অতিক্রম অথবা অসীমার মত পরিজনদের কাছে ফিরে যাওয়া — কোনটাই ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে সহজ, স্বাভাবিক হয়নি। যে ধোঁয়াশাচ্ছন্ন সীমারেখা বা 'শ্যাডো লাইন্স্' পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তানকে পৃথক করেছিল, তা গড়ে উঠেছিল অবিশ্বাস ও সংশয় দিয়ে। সুতরাং উদ্বাস্তুদের মনে ও স্মৃতিতে রাষ্ট্রের সীমানা কেবল দ্বন্দ্ব, বেদনা, সংশয় ও বিপদ উদ্রেককারী প্রতীক হিসেবে ক্রিয়াশীল থেকেছে। অসীমার মত কোন নিশ্চিন্ত সমঝোতায় আসা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্বপাকিস্তানে চলে যাওয়া মোবারক হোসেনের লেখাতে ভগ্নপরিবারের মর্মান্তিক কাহিনি বর্ণিত হয়েছে — ''ওপার বাংলা থেকে আমার মেজভাই ও মামাতো ভাই বিনা পাসপোর্টে বর্ডার পার হয়ে যশোহর নিউটাউনে আমাদের বাড়িতে বয়ে নিয়ে এল দুঃসংবাদ। ... এপার বাংলায় আমরা চার ভাইবোন স্তব্ধ হয়ে সে খবর শুনি। কাঁদতে পারিনি। মায়ের সঙ্গে আমাদের আর শেষ দেখা হল না। ... এই আফশোস আজও বুকের মধ্যে বহন করে বেড়াই আর মনে করি, দেশভাগ না হলে মা-র থেকে এই বিচ্ছেদ হত না আমাদের।''[16] ঝর্ণা বসুর লেখায় দেখি দেশভাগ হওয়ার পরে কখনও বাঁচার তাগিদে, কখনও নিদারুণ দারিদ্র্যজনিত কারণে নব উদ্ভুত দুই রাষ্ট্রের ভিতর তাঁদের পরিবারের দিশাহারা ছোটাছুটির কাহিনি — ''এরপর আমাদের চার ভাইবোনের বড় দুজনকে ঠাম্মা দাদুর সঙ্গে কলকাতায় রেখে পাসপোর্ট করে মা আমাকে আর ছোড়দাকে নিয়ে ফিরে গেলেন পাকিস্তানে বাবার কাছে। দাঁত কামড়ে কলকাতায় পড়ে রইলেন ঠাম্মা। মনে আশা দেশে যদি আবার ভয়াবহ পরিস্থিতি হয়, বড় নাতি-নাতনি দুটো নিশ্চয়ই বেঁচে

থাকবে। ... কিন্তু দারুণ অর্থাভাবে হাল ছেড়ে তাঁকে ফিরতে হল পাকিস্তানে। পাসপোর্ট নেই, তাই বেআইনি পথে। টাকা দিয়ে দালালের সাহায্যে। ... 'বর্ডার' শব্দটা প্রথম কবে শুনেছি মনে পড়ে না, তবে বর্ডার যে অন্তহীন দুঃখের, সেটা ঠাম্মাকে দেখে বুঝতে পারলাম।"[17] এইসব স্থানান্তরিত মানুষের কাছে 'বর্ডার' তাই অশ্রুসিক্ত 'শ্যাডো লাইন্স্'। এক পা ভারতে, এক পা পাকিস্তানে রাখা এই মানুষগুলির দ্বিখণ্ডিত সত্তার ভিতর কোন আপোস নেই, প্রতিদিনের যাপনের প্রতিকূলতায় তাঁরা কেন্দ্র হারিয়ে বাস্তবে ও অন্তরে যথার্থই গৃহহারা, সততই চেতনায় সংশয়নীল আত্মপরিচয় বহন করে চলে।

দেশভাগের মত দুর্বিপাক সাধারণ মানুষের জীবনে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয়গুলিকে অকিঞ্চিৎকর প্রমাণ করে দিয়েছিল। সীতা সরকার তাঁর সংক্ষিপ্ত স্মৃতিকথার নামকরণ করেছেন — ''শাঁখা খুলতে হবে, সিঁদুর মুছতে হবে।" তাঁর স্মৃতিকথা অনুসারে জানা যায়, দেশভাগের পর তাঁর বিবাহিত জীবন এপারে গড়ে উঠলেও পিতামাতা ও পরিবার থেকে গিয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানে। পিতার মৃত্যুর খবর পেয়েও তিনি যেতে পারেননি। কারণ 'বাড়ি ফেরা' এখন পরিবর্তিত হয়ে গেছে 'বিদেশী রাষ্ট্রে যাওয়া'তে। তাঁর জামাইবাবু তাঁকে তাঁর হিন্দু সধবা নারীর চিহ্নসকল ত্যাগ করে ধর্মীয় পরিচয়ের বিপর্যয় ঘটিয়ে পূর্বপাকিস্তানে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিলেন। পরিস্থিতি এমনই সীতা সরকারের কাছে ধর্ম পরিচয় এবং মায়ের কাছে যাওয়া — এই দুই-এর যেন আড়াআড়ি অবস্থান। গোষ্ঠীভিত্তিক পরিচয়ের এই বিপর্যয়ের কথা অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের স্মৃতিচারণাতেও উঠে এসেছে। — ''আব্বা ... এটিএম মোয়াজ্জমের জায়গায় তিনি নিজের নাম দিলেন এ এম এম মজুমদার। ওই উপাধিধারী হিন্দু হতে পারেন, মুসলমানও হতে পারেন —"[18]। ভেবে নেওয়া যেতেই পারতো, এ এক মধ্যবর্তী মিশ্রিত সত্তা, যা একভাবে অচলায়তনকে ভেঙে ফেলতে পারে, সদর্থক প্রত্যাশা জাগাতে পারে। কিন্তু বস্তুতঃ আধুনিক সভ্যতার 'বর্ডার' রাজনীতি এবং ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হওয়া রাষ্ট্রযন্ত্র — কোনটাই বিধিবদ্ধ প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয়গুলির বাইরে মানুষকে বেরোতে দেয়না। রাষ্ট্রযন্ত্রের এই ভূমিকাই বিভাজিত ভূখণ্ডের মানুষের আত্মপরিচয়ের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তাবোধ সৃষ্টি করে। শাঁখা সিঁদুরের প্রাচীনতাকে ভেঙে ফেললেও তাই সীতা সরকার 'মুক্ত মানুষ' হয়ে উঠতে পারেন না। পূর্ব পাকিস্তান থেকে এদেশে ফেরার সময়

বর্ডারের রাষ্ট্রপ্রহরীদের সম্পর্কে তিনি যে অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন, তা উপরোক্ত মতকেই সমর্থন করে — ''... ওরা ভেবেছে জামাইবাবু একজন হিন্দু হয়ে কোনও মুসলিম মেয়েকে নিয়ে পাকিস্তান থেকে পালাচ্ছে। যা বুঝলাম, আমার ভালর জন্যই জামাইবাবু আমাকে সিঁদুর মুছে ফেলতে বলেছিল, সেটাই কাল হয়েছে এখন। আমার কপালে সিঁদুর না-থাকায় বর্ডারের অফিসাররা বিশ্বাসই করতে চাইছে না যে, আমি এক বিবাহিত হিন্দু বউ, ফিরছি নিজের স্বামীর কাছে।''[19]

দেশভাগ এইভাবেই সত্তার গভীরে প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয়গুলি নিয়ে একটি অনিশ্চয়তার বোধ ও সংশয় তৈরী করেছিল, তথাপি রাষ্ট্রযন্ত্রের 'বর্ডার', পাসপোর্ট ভিসা রাজনীতি সেই পরিচয় থেকে মুক্ত হতেও দিচ্ছিল না। অন্যদিকে ছিন্নমূল মানুষগুলি আক্রান্ত হয়েছিলেন একধরণের বিচ্ছিন্নতাবোধের দ্বারা। বিচ্ছিন্নতাবোধ অথবা নিঃসঙ্গতার এই যন্ত্রণা সুনন্দা সিকদারের 'দয়াময়ীর কথা' নামক স্মৃতির ভাষ্যে দেখতে পাই — ''আসলে যতই অস্বীকার করতে চেয়েছি আমার দাদাকে আমি, সে ততই আমাকে অদৃশ্য বাঁধনে শক্ত করে বেঁধেছে। এই অবস্থায় আমি যদি মনে করতে চাই, আত্মীয়-বন্ধুতে ঘেরা আমার এই সংসারটুকু থাক, আর সঙ্গে থাকুন রবীন্দ্রনাথ, তাহলে আবার আমি মিথ্যের পাঁকে জড়াবো, নিরাময় হবে না আমার গোপন ক্ষতের।''[20] ব্যবহারিক জীবনের অভ্যস্ততার গভীরে অনিশ্চিত সত্তার যে ক্ষত অথবা বিচ্ছিন্নতা তা এক সাগর গভীর অবরুদ্ধ ক্রন্দনের মতো। তাই সুনন্দা দাদার মৃত্যুর খবর পেয়ে লেখেন — ''ত্রিশ বছর ধরে যে কান্না জমাট বরফ হয়েছিল, আমিও তার খবর রাখতাম না। আজ যেন সেই কান্না স্রোতের মতো বেরিয়ে আসছে। সংসারের কাজে কোনও খামতি রাখছি না, তবুও আত্মীয়বন্ধুদের সপ্রশ্ন দৃষ্টি আমার দিকে।''[21] এই কান্না হারিয়ে ফেলার, অনিশ্চয়তার, সত্তার সংকটের। 'আত্মীয়বন্ধু' বলে আখ্যাত মানুষগুলি তাই সুনন্দার কাছে 'অপর', সুনন্দা চেতনার গভীরে তাঁদের থেকে বিচ্ছিন্ন, সেই কারণেই তাঁদের 'সপ্রশ্ন দৃষ্টি' — কারণ তাঁরা সুনন্দার অন্তরকে বুঝতে পারছেন না। দেশভাগের কেন্দ্রাতিগ বলের কারণে যে মানুষরা ছিন্নমূল হলেন অথবা যারা কেন্দ্রমুখী বলের আকর্ষণে জন্মভূমিতে থেকে গেলেন সংখ্যালঘু হিসেবে, উভয়পক্ষই এক অনির্দেশ্য বিচ্ছিন্নতাবোধের দ্বারা আক্রান্ত। মিহির সেনগুপ্ত পূর্ব পাকিস্তানে থাকার সময় তাঁর নিঃস্ব, রিক্ত, একাকীত্বের বর্ণনা

করেছেন — ''এমন জনহীন, নিঃশূন্য সব স্থান পাড়ি দিতে হয় যে, মনে হয় পৃথিবীটা এখানে এসে শেষ হয়ে গেছে, আর এরপরেই এক অতল গহ্বর, একটু অসতর্ক পা, ফেললেই অস্তিত্বহীন হয়ে যাব।''[22] না-অস্তিত্বের এই সংকট সংখ্যালঘু প্রান্তিকের। কিন্তু সীমারেখার অন্যপারে যেখানে গোষ্ঠী পরিচয়ের কারণে তাঁরা সংখ্যাগুরু সেখানেও তাঁরা প্রান্তিক, কারণ তাঁরা ছিন্নমূল, তাঁরা বাঙাল, — যে বাঙালের আত্মপরিচয় ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সঙ্গে অঞ্চলভিত্তিক উপ-জাতীয়তাবাদের দোলাচল-সংঘর্ষে নিয়ত বিষণ্ণ।

বরিশালের অপর ভূমিপুত্র ''তপন রায়চৌধুরী পূর্ববাংলা ছেড়ে কলকাতায় এসে থেমে যাননি, উচ্চশিক্ষার জন্য ও অধ্যাপক হিসেবে বিদেশে গিয়ে বসবাস করেছেন। তাঁর 'বাঙালনামা' গ্রন্থটির নাম 'দুনিয়ানামা' হলে যথার্থ হত — বন্ধুদের এই মন্তব্য তপনবাবু গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণের প্রাক্‌কথনে উল্লেখ করেছেন। বস্তুতঃ এটি যেহেতু কেবল ফেলে আসা দেশের স্মৃতিচারণামূলক গ্রন্থ নয়, তপনবাবুর সমগ্র জীবনবৃত্ত যেহেতু এখানে আখ্যানের বাঁধনে ধরা পড়েছে, সেইহেতু বরিশাল থেকে শুরু হয়ে কলকাতা, কলকাতা থেকে দিল্লী হয়ে অক্সফোর্ড ও সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পরিব্যাপ্ত এই গ্রন্থের চলমানতা। বিদেশে জাতীয়তাবাদী তপনবাবুর ভারতীয় সত্তাপরিচয়ের প্রতি বিশ্বস্ততা ও নষ্টালজিয়া থাকলেও গ্রন্থের শেষে তার প্রব্রজন শেষ হয় পূর্বপুরুষের বাস্তুভিটার গ্রাম বরিশালের কীর্তিপাশাতে এসে। বরিশালের সংস্কৃতির চিহ্ন হিসেবে বরিশালের ভাষাকে তিনি বহন করেছেন আজীবন, তাঁর আন্তর্জাতিক জীবনের বর্ণনা প্রসঙ্গে দু-একবার সেই ভাষাভঙ্গির উল্লেখও করেছেন। তাঁর চলমান জীবনবৃত্তান্তের নাম যে 'বাঙালনামা'-ই হওয়া উচিত এ বিষয়ে তিনি ছিলেন নিঃসংশয়। পরিবর্তিত চলমান আন্তর্জাতিক জীবনকাঠামোর গভীরে শেকড়ের সন্ধান-ও যে তাঁর জীবনে ক্রিয়াশীল ছিল — বই-এর নামকরণ সম্পর্কে তাঁর প্রত্যয়ী উচ্চারণ সেই সত্যকেই প্রতিফলিত করে। যদিও 'ভিকটিম ডায়াস্পোরা'-র উদাহরণ নয় তাঁর জীবন। তাঁর স্মৃতিচারণাতেও সে লক্ষণ নেই।

মার্ক্সবাদীদের স্মৃতির ভাষ্যে দেশভাগের পর স্থানান্তরিত হওয়ার কারণে অভিবাসী উদ্বাস্তু চেতনার এক রকমের অস্বীকার আছে। মুসলমান গোষ্ঠী যাঁরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্বপ্রান্তে চলে গেলেন, তাঁদের স্মৃতির ভাষ্যেও অভিবাসী চেতনার প্রকাশ অবিমিশ্র নয়। আবুল হোসেন

পূর্বপাকিস্তানে যাওয়ার পর তাঁর অনুভূতির কথা লিখেছেন — ''নিঃসঙ্গতা আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। আমি আর পা'র নীচে মাটি খুঁজে পাইনে।''[23] বস্তুতঃ তিনি প্রতিমুহূর্তে বিচ্ছিন্নতাবোধ করছিলেন কলকাতার সাংস্কৃতিক পরিবেশের থেকে। এমনকি ঢাকা শহরের বুদ্ধিজীবী পরিমণ্ডলেও তিনি কলকাতাকেই খুঁজছিলেন — ''... তবে ঢাকাতেই বা কী ছিল? পরিবেশ তেমন না থাকলেও কলকাতার কিছু সহযাত্রী ঢাকায় কাজ খুঁজে নিয়েছিলেন — ... একটা বুদ্ধিজীবী পরিমণ্ডল ওখানেই গড়ে ওঠা সম্ভব।''[24] অভিবাসী জীবনের সত্তার দ্বন্দ্ব তাঁর সৃজনশীলতাকেও যে রুদ্ধ করে দিয়েছিল, তাও তিনি উল্লেখ করেছেন এবং তারপর তিনি লিখলেন — ''অবশেষে আমার অসহায়ত্বের কথাই লিখলাম 'চতুরঙ্গের' জন্য, যেন নির্বাসনে আছি কালাপানিতে।

আমার মন এক ছোট দ্বীপ;
উঠেছে সমুদ্র থেকে জানি না কখন
লতা নেই, পাতা নেই, নেই ঘন বন
শুনিনি পাখির ডাক, বাঘের গর্জন
মানুষ তা আরো দূর।''[25]

আবুল হোসেনের এই অনিশ্চয়তাবোধ কিন্তু স্মৃতির ভাষ্যে এরপর আর ধরা পড়ে নি। তিনি এবং তাঁর মতো আরও অনেক স্থানান্তরিত মুসলমান এক নতুন আত্মসচেতন আত্মপরিচয় নির্মাণের প্রান্তরে উত্তীর্ণ হলেন এবং আদর্শবোধের এক নতুন কেন্দ্র তৈরী করলেন তাঁরা। আবার দেখবো স্থানান্তরিত মুসলমান — যাঁরা দেশভাগকে সদর্থক প্রক্রিয়া বলে মনে করেন — তাঁদের ভাষ্যে পরস্পর বিরোধিতা। মঈন আহমদ তাঁর পশ্চিমবাংলার ভিটে সম্পর্কে নস্টালজিয়াকে অস্বীকার করতে চেয়ে বলেছেন — ''সর্বশেষ ১৯৮০ সালে ভিটেয় গিয়েছি। আর সম্পদ থেকে নিশ্চিত বঞ্চিত হচ্ছি অবহিত হওয়ার পর ওখানে যাওয়ার আকর্ষণ বিরহিত হয়ে গেল।''[26] অথচ নির্মোহ এই বক্তব্যের ঠিক পূর্বেই তাঁর ছেলেবেলার বাড়ি ও জীবনের স্মৃতিচারণার ভঙ্গিতে মায়ার বাঁধনের প্রকাশ — যা তাঁর শেকড়ের টানকে স্পষ্ট করে তোলে — ''প্রথমেই আমড়াগাছটি আমাদের স্বাগত জানাল। আহ; কি তৃপ্তি! জন্মভূমির বুকে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আলোর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম। গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে দ্বিতল বাড়িটি দৃষ্টিগোচর হল। বামপাশে ইটের প্রাচীর। ডান পাশে

পুকুরের জল ছলছল করছে। অন্ধকার হাতড়িয়ে মেঠো পথ বেয়ে গৃহাভিমুখে রওয়ানা দিলাম।"[27] অবচেতনার গভীরে জন্মভিটার সঙ্গে সত্তার সম্পৃক্তি নিবিড় ছিল বলেই, 'দ্বিতল বাড়িটি' তাঁর বর্ণনায় 'গৃহ' হয়ে উঠল। এ-ও এক ফিরে আসার গল্প। হায়াত মামুদের স্মৃতিচারণায় এই স্ববিরোধিতা আরও সুস্পষ্ট — ''এ দেশটাকে কখনও বিদেশে মনে হয়নি। ... বাবা হয়তো বন্ধুবান্ধব 'মিস' করতেন, কিন্তু এখানে এসে ভুল করেছেন এ রকম কখনও মনে হত না তাঁর। ... এপারে এসে কোনও ক্রাইসিস তৈরী হয়নি। 'দেশ' কোথায় জিজ্ঞেস করলে বলতাম 'ঢাকা'। ... দেশ নিয়ে টানাটানি করার দরকার নেই। ঢাকার এই পাড়া একটা স্থায়ী ঠিকানা দিয়েছিল ঠিকই তবে আমি রুটলেস। আমার কোনও শিকড় নেই। এখন অবশ্য গ্রামের ছবিটা মাঝে মাঝে হানা দেয়।"[28] ভেদাভেদের এই ক্ষতকে স্বীকার করে নিয়ে যন্ত্রণার কথা অবশ্য স্বীকার করেছেন মানবতাবাদী হাসান আজিজুল হক। তিনি বলেছেন — ''... প্রবল প্রতাপ রাষ্ট্রই সীমা — তাকে অতিক্রম করার যেন কোনও উপায় নেই। বাংলাদেশের বাঙালি, বাঙালি - জাতীয়তাবাদ বলতে এখন আর কিছুই বোঝাতে পারে না, ... বাস্তবে আমি আজ এক দোমড়ানো মোচড়ানো মানুষ।"[29] দেশভাগ জনিত কারণে স্থানান্তর ও বিচ্ছেদের এই সংকটকে অতিক্রম করতে না পেরেই তাঁর সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণার নামকরণ করেছেন তিনি — ''ক্রমাগত আত্মখণ্ডন।"

উচ্চবর্ণের সম্পন্ন হিন্দুরা ভারতে এসে স্থিত হয়েছেন, রাজনৈতিক জাতিপরিচয়ও লাভ করেছেন। কিন্তু ক্যাম্পবাসী নিম্নবর্ণের মানুষের রাজনৈতিক পরিচয়ের সংকটের কথা দলিত সাহিত্যিক মনোরঞ্জন ব্যাপারীর লেখায় সুস্পষ্ট ক্ষোভের সঙ্গে উচ্চারিত — ''আমি এক নেই - দেশের বাসিন্দা। এখন ও দেশের কেউ নই। এ দেশেরও কেউ নই। ও দেশে আমার পরিচয় বিধর্মী, কাফের, মালাউন, ভারতের চর। এ দেশে আমার পরিচয় রিফিউজি, শরণার্থী, উদ্বাস্তু, অনুপ্রবেশকারী।"[30] নিম্নবর্ণের স্থানান্তরিতকরণ জনিত মনস্তত্ত্ব উচ্চবর্ণের থেকে স্বভাবতই আলাদা। নিম্নবর্গ নিম্নবর্ণীয় ক্যাম্পনিবাসী মানুষদের ভারতভূমিতে নিজেদের নাগরিক অধিকার (fundamental and civil rights) প্রতিষ্ঠার জন্য রক্তক্ষয়ী আন্দোলন করতে হয়েছিল। বস্তুতঃ ইতিহাস বলে সাতচল্লিশের পর থেকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু যারা আসছিলেন ভারতীয় নেতৃবর্গের কাছে তাঁরা ছিলেন অবাঞ্ছিত এবং তাঁরা সেই স্রোতকে প্রতিহত করতে চেয়েছিলেন।

১৯৪৮ সালের একটি চিঠিতে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী লেখেন — "every thing should be done to prevent Hindus in East Bengal"[31]। সম্পন্ন উচ্চবর্গীয়রা অবশ্য এ প্রান্তের রাষ্ট্রকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাচ্ছিল বিভিন্নভাবে। এমনকি ১৯৫১ সালে "eviction bill"-কে পরিমার্জনা করে কলোনির বাসিন্দাদের জমির উপর অধিকারকে মেনে নেওয়াও হয়। কিন্তু নিম্নবর্গীয় ক্যাম্পবাসীদের প্রাথমিকভাবে অবলম্বন ছিল সরকার পক্ষের কাছ থেকে পাওয়া ডোল। কিন্তু 'ডোল' প্রদান প্রকৃতপক্ষে সাময়িক দায়িত্ব গ্রহণ, রাষ্ট্র এবং নিম্নবর্গীয় উদ্বাস্তুদের এতদ্বারা কোন স্থায়ী সম্পর্ক তৈরী হয় না। নিম্নবর্গীয়দের প্রতি রাষ্ট্রের এইরূপ মনোভাব যখন নিছক দয়া প্রদর্শনের, তখন ক্যাম্পবাসী উদ্বাস্তুদের মনোভাব দয়ার পরিবর্তে নাগরিক অধিকার আদায়ের জন্য সংঘবদ্ধ হওয়া। দেশভিখারি এইসকল ক্যাম্পবাসীদের পরিচয়হীনতার যন্ত্রণা অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের সঙ্গে অন্বিত। একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার নাগরিকত্ব প্রাপ্তি সেই নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে অন্নবস্ত্র-বাসস্থানের দাবীকে সুনিশ্চিত করে। সদ্য জন্ম নেওয়া দুটি রাষ্ট্র থেকেই সেই মৌলিক অধিকারের প্রত্যাখ্যান শুধু অস্তিত্বকে নয়, নিম্নবর্গ নিম্নবর্ণের জীবনকেই সংকটের সম্মুখীন করে তুলেছিল।

বহুবছর ধরে সামাজিকভাবে যাঁরা ছিলেন প্রান্তীয়, নিম্নবর্ণীয় সেই সকল মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলন সংঘটিত হয় স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই। বাংলাভাগ বর্ণহিন্দু ও মুসলমানের নিজস্ব দেশলাভের রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার ফলাফল; এ ক্ষেত্রে দুদেশেই নিম্নবর্ণ হিন্দুরা রাজনৈতিক ক্ষমতাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে যে ক্ষতিগ্রস্থ — সেটা তাঁরা মনে করতেন বলেই নমঃশূদ্র নেতা যোগেন মণ্ডল বলেছিলেন — "While schedule castes of eastern Bengal ... [would] be at the mercy of the majority Community [muslim], the schedule caste of Western Bengal ... [would] perpetual slavery of the caste Hindus."[32] আত্মপরিচয় নিয়ে সমস্যা বিশশতকের প্রথমার্ধ থেকেই অর্থাৎ দেশভাগ ও স্থানান্তরিত হওয়ার অনেক পূর্ব থেকেই যে নিম্নবর্ণীয়দের ছিল, তা আমরা বুঝতে পারি মনোরঞ্জন ব্যাপারীর স্মৃতিকথায় উচ্চবর্গীয় জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের প্রতিস্পর্ধী নমঃশূদ্রদের 'অন্য ইতিহাস'-এর বর্ণনা থেকে। — ''সেই স্বদেশি আন্দোলনের সময়, যখন বিলেতি দ্রব্য বর্জনের আন্দোলন চলছিল,

এদের বলা হয়েছিল সে আন্দোলনে যোগ দিতে। এদের এক নেতা গুরুচাঁদ ঠাকুর ... সে বলেছিল, আমাগো মাইনষের শরীলে বসত্রো কোথায় ? ... ত্যাগ তো তারা করতে পারে যারা গেরহন করছে। আমাগো ত্যাগের মতো বসনই নাই।

... গুরুচাঁদ ঠাকুরের এ যুক্তি স্বদেশি নেতাদের মনে হয়েছে, আন্দোলনে যোগ না দেওয়ার একটা ছুতো। এরপর যখন ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু হল তখনও এরা সে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েনি। ... নিজের পেটের চিন্তা ছাড়া জীবনে এরা আর কিছু করে উঠতে পারল না।"[33] উপনিবেশের প্রভুদের থেকে প্রাপ্ত যে জাতীয়তাবাদী চেতনা ও রাষ্ট্রবোধ আধুনিক ভারত সৃষ্টির মূলে ছিল, এই ইতিহাস যেন তাকে অসঙ্গত প্রমাণ করতে চায়। সুতরাং নিম্নবর্ণের উদ্বাস্তুদের চেতনা উচ্চবর্ণের থেকে অনেক ক্ষেত্রেই স্বতন্ত্র হতে বাধ্য। যদিও পূর্ববাংলার প্রাক্-দেশভাগ জন্মভূমি-গ্রামের জীবন-সংলগ্নতার অনুভবও তাঁদের লেখায় আছে — "... ওদেশে আমাদের বিত্তবৈভব না থাকুক চিত্তে ছিল সীমাহীন স্বস্তি। ছিল সংস্কার, নিজস্ব সংস্কৃতি আর স্বাভিমান।"[34] মনোরঞ্জন দেশভাগ পূর্ব জীবনে যে 'স্বস্তি' ও 'স্বাভিমান'-এর উল্লেখ করেছেন, চতুঃবর্ণ সামাজিক কাঠামোর একেবারে নিম্ন স্তরে অবস্থিত প্রান্তীয় মানুষগুলির বঞ্চিত শোষিত জীবনে তা যর্থাথই ছিল কিনা — এ প্রশ্ন অবশ্যই তোলা যেতে পারে। একই সঙ্গে বলা যায়, দেশভাগের পূর্বে জীবনের এমন পরিপূর্ণতার কল্পনা উচ্চবর্গীয় স্থানান্তরিত মানুষের ফেলে আসা গ্রামের স্বপ্নময় রূপ কল্পনারই কাছাকাছি। তবুও একথা অনস্বীকার্য; নিম্নবর্ণীয় উদ্বাস্তুরা ছিলেন প্রান্তীয় মানুষদের ভিতরে আরও প্রান্তীয়। সুতরাং উদ্বাস্তু হওয়ার পর তাঁদের সংগ্রাম উচ্চবর্ণীয় উদ্বাস্তুদের থেকে ভিন্ন রকমের এবং উদ্বাস্তু হওয়ার কারণে আত্মপরিচয় জনিত দ্বন্দ্ব ও সমস্যার স্বরূপ-ও তাঁদের পৃথক। অবশ্য মনোরঞ্জন ব্যাপারী নিজস্ব সংস্কৃতিচ্যুতির যে যন্ত্রণার কথা বলেছেন, অন্য রাজ্যে প্রেরিত ক্যাম্পনিবাসী নিম্নবর্গের মানুষের ক্ষেত্রে তা হয়ে উঠেছিল বাস্তব সত্য। উচ্চবর্গীয়দের ক্ষেত্রে তা হয়নি, যেহেতু উচ্চবর্গীয়রা যে ভূখণ্ডে স্থিত হয়েছিলেন তা ছিল বাঙালি সংস্কৃতিরই অপর প্রান্ত। কিন্তু ক্যাম্পবাসীদের জন্য সরকারের তরফে পুনর্বাসনের যে পরিকল্পনা করা হয়েছিল, সেই পরিকল্পনায় প্রান্তীয় মানুষগুলির সংস্কৃতি, মুখের ভাষাও হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। 'ভিকটিম ডায়াস্পোর'র অস্তিত্ব সংকট তাই প্রখর ভাবে প্রকাশ পায় মনোরঞ্জন ব্যাপারীর স্মৃতিকথাতে — "...

মধ্যপ্রদেশ এবং ওড়িশার জঙ্গল-পাহাড়ঘেরা কাঁকর-পাথর - মোরাম মাটির-জলবিহীন অনুর্বর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অস্বাস্থ্যকর, আদিবাসী জনগোষ্ঠি অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে গ্রহণ করা হয় পূর্ব বাংলা থেকে আগত বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের পরিকল্পনা। যেখানকার জলবায়ু, প্রাকৃতিক পরিবেশ, মানুষ, ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, সব কিছু বাঙালি মন-মনন-শরীর-স্বাস্থ্য, জীবনধারণ পদ্ধতির পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। বলা হয় এখানে পুনর্বাসন দেওয়া হবে হতভাগ্য নিম্নবর্ণের বাঙালি রিফিউজিদের।"[35] পশ্চিমবঙ্গ থেকে দণ্ডকারণ্য অথবা ওড়িশায় স্থানান্তরিত হওয়া সমাজবিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুযায়ী 'ডায়াস্পোরা' বলা হয়তো যায় না, কিন্তু দেশভাগজনিত কারণে নিম্নবর্গ নিম্নবর্ণীয় এই মানুষগুলির সত্তাপরিচয় অন্যপ্রদেশে স্থানান্তরিত হওয়ার কারণে যে চূড়ান্ত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল — তা-ও অস্বীকার করা যায় না। ক্যাম্প অথবা দণ্ডকারণ্য অথবা আরও সেইসব অঞ্চল — যেখানে হারিয়ে গেলেন এইসকল নিম্নবর্গের মানুষ, দেশ-বিভাজন আখ্যানে তাঁদের কাহিনি যেন এক 'অন্য পরিসর' — যে পরিসর চূড়ান্ত ভাবে অবহেলিত, এবং বিস্মৃতপ্রায়। এঁদের সম্পর্কে তাই বলা যায় — "those who live beneath the surface and in the cracks of society; those whose plight fades into history with time, whose stories are not remembered and whose courage and strength go unrecorded ... these third space occupants go against the essentialising national narrative to offer an alternative."[36]।

উত্তর-ঔপনিবেশিক চিন্তাবিদ হোমি কে ভাবার মূল চিন্তাসূত্রগুলি আলোচনা করতে গিয়ে গবেষক বলেছেন — "Bhaba's idea of in-between space is the hybrid interaction between different cultures and histories that makes both negotiation and revision of culture possible. Thus, the in-between space becomes the space of productivity and Bhaba Calls it "Third space"[37]। উক্ত ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি স্বেচ্ছায় স্থানান্তরিত মানুষদের ক্ষেত্রে; — এমনকি দেশভাগের পরে উচ্চবর্গীয় উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রেও কিছুটা, — প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু নিম্নবর্গীয়দের অবস্থান যে 'third space'-এ, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিকভাবে হোমি কে ভাবা কথিত 'third space'-এর থেকে তা স্বতন্ত্র।

'Productivity'-র বিবেচনায় 'তৃতীয় পরিসর' এক মুক্ত পরিসর — যেখানে কৃত্রিম প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয়ের বাঁধন শিথিল, যেখানে সত্তাপরিচয়ের যুগ্ম বৈপরীত্যকে অস্বীকার করা হয়। মুক্ত পরিসরের এই আকাঙ্খা অথবা স্বপ্ন অভিবাসী চেতনার লক্ষণ বলা যেতে পারে। বাংলাভাগের পরে উচ্চবর্গীয় স্থানান্তরিত মানুষদের ভাষ্যে এই মুক্ত পরিসরের স্বপ্নের কথা শুনতে পাই। দেশভাগের অনেক বছর পর বরিশালে ফিরে যাওয়ার আবেগ মিহির ব্যক্ত করে লিখেছেন — ''... ভাগাভাগির এতকালের হুজ্জোত পেরিয়েও, এখনও কিন্তু আমাদের আত্মিক সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়নি, ... এখানের বর্তমান প্রজন্ম কিন্তু তাদের বুকখানা কীর্তনখোলা, ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গার মতোই খুলে পেতে বসে আছে। তারা দ্বিজাতি তত্ত্ব জানে না, মুসলিম জাহান, হিন্দুরাষ্ট্র, পাকিস্তান-হিন্দুস্তান জানে না। তারা উৎসবে একত্রিত হয়ে আনন্দ করে। সে উৎসব ঈদ, মহরম কিংবা দুর্গাপূজা।''[38] এই আবেগ বাস্তবকে তার কাঙ্খিত সত্যের ভূমিতে দেখতে চায়। মুসলমানদের প্রতি বর্ণ হিন্দুর অস্পৃশ্যতা-জনিত ঘৃণার মনোভাবকে অতিক্রম করে এই আবেগ গঠনমূলক বা Productive হয়ে উঠতে চেয়েছে। কিন্তু নিম্নবর্গীয়দের প্রত্যাখ্যাত, বিস্মৃত 'তৃতীয় পরিসর' নেতিবাচক ও ধ্বংসাত্মক — যা বাস্তবে অবহেলিত ও প্রান্তীয়। বস্তুতঃ বিতাড়িত উদ্বাস্তুদের সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতের ভিন্নতা অনুযায়ী তাঁদের অভিবাসী চেতনার রাজনৈতিক প্রকাশও বিভিন্ন রকমের। বিশেষ কতকগুলি নির্দিষ্ট লক্ষণকে বিতাড়িত অভিবাসন অথবা ভিকটিম ডায়াস্পোরার সাধারণ লক্ষণ হিসেবে ধরে নিয়ে স্মৃতিকথাগুলিকে মেলাতে বসলে সংশয় তৈরী হয় এবং সেক্ষেত্রে আলোচনার গতি দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়তে বাধ্য। ভিকটিম ডায়াস্পোরার আলোচনার পথপ্রদর্শক Robin Cohen সুনির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ করেছেন, ভিকটিম্‌ ডায়াস্পোরা অথবা অন্য যে কোন ধরনের ডায়াস্পোরা — কোনটিই ডায়াস্পোরার সকল লক্ষণকে একসঙ্গে প্রতিফলিত করে না। সুতরাং দেশভাগজনিত স্মৃতিকথাগুলিতে সবকটি ডায়াস্পোরার সকল চেতনাকে একইভাবে একই মাত্রায় খুঁজে পাওয়া যাবে না।

পূর্বপাকিস্তানে যে সকল বাঙালি মুসলমান চলে গেলেন, অথবা ওপার থেকে যে সকল মানুষ ভারতে চলে আসতে বাধ্য হলেন, তাঁরা তাঁদের যাপনে, স্মৃতিতে অভিবাসী উদ্বাস্তু চেতনা, বলা ভাল বিতাড়িত অভিবাসী চেতনা নিয়ত বহন করে চলেছেন। সুতরাং এঁদের স্মৃতির ভাষ্য

অবশ্যই ভিকটিম ডায়াস্পোরা অথবা বিতাড়িত অভিবাসনের আলোচনায় বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্যতার দাবী রাখে। অভিবাসী লেখক অমিতাভ ঘোষ তাঁর 'শ্যাডো লাইন্‌স্' উপন্যাসে দেশভাগজনিত যন্ত্রণার কাহিনি বলেছেন। বস্তুতঃ অমিতাভ ঘোষ নিজ জীবনের অভিবাসন জনিত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংশয়ী জাতিপরিচয়ের অনিশ্চয়তা ব্যক্ত করতে গিয়ে বিষয়বস্তু হিসেবে দেশভাগকে বেছে নিয়েছেন। দেশান্তরিত জীবনের শেকড়হীনতার সমস্যা যেমন অমিতাভ ঘোষের, তেমনই তাঁর 'শ্যাডো লাইন্‌স্' উপন্যাসে দেশভাগের কারণে উদ্বাস্তু হওয়া বিভিন্ন চরিত্রেরও। দেশভাগের স্মৃতিকথাগুলিতে আত্মপরিচয়ের রাজনীতি ও সংকট, অন্যভূমিতে প্রতিষ্ঠালাভ — ইত্যাদি বিষয় অনুসন্ধান করার ক্ষেত্রে খুব স্বাভাবিকভাবেই এসে যায় ডায়াস্পোরা বা অভিবাসনের প্রসঙ্গটি। কারণ ডায়াস্পোরা নিয়ে যে আলোচনা, তা-ও মূলতঃ আত্মপরিচয় কেন্দ্রিক। তাই তুলনা স্বাভাবিকভাবে চলে আসে। বস্তুতঃ গোষ্ঠীর রাজনৈতিক পরিচয় ও আত্মপরিচয়ের সংঘাতের রূপকে বহুমাত্রিকতায় অন্বেষণ করা যায় এই দুটি প্রসঙ্গের একত্র আলোচনার মাধ্যমে।

তথ্যসূত্র

1. Louise Harrington, "An-Other Space : Diasporic Responses to Partition in Bengal," https://core.ac.uk,[accessed on – 29.10.2022]
2. Mentioned in H. Abida, "Diaspora in Jhumpa Lahir's the Namesake," www.jetir.org.,2021, [accessed on – 27.10.2022]
3. Md. Shahabul Haque, "Victim Diaspora – Ethnic Minority groups in South Asia : The Case of 'Biharis' and 'Rohingyas' in Bangladesh", 2013, www.researchgate.net/publication/316859928 [accessed on – 27.10.2022]
4. মিহির সেনগুপ্ত, ''বিষাদবৃক্ষ'', *উজানি খালের সোঁতা*, আনন্দ, কলকাতা, ২০০৭, পৃ-৪১
5. মিহির সেনগুপ্ত, ''চান্দ্রদ্বীপি শোলোক শাস্তর পল্‌কি কথা'', *উজানি খালের সোঁতা*, আনন্দ, কলকাতা, ২০০৭, পৃ-৬৯

6. তদেব, পৃ-৬৯

7. তদেব, পৃ-৬৯-৭০

8. মিহির সেনগুপ্ত, ''সিদ্ধিগঞ্জের মোকাম'', *উজানি খালের সোঁতা,* আনন্দ, কলকাতা, ২০০৭, পৃ-৪১৯

9. তদেব, পৃ-৩৭৫

10. তদেব, পৃ-৩৭৫

11. আনিসুজ্জামান, ''আমরা পাকিস্তানে এলাম'', *দেশভাগ বিনাশ ও বিনির্মাণ,* সম্পা- মধুময় পাল, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১১, পৃ-৫১

12. তদেব, পৃ-৫১

13. মনোজ মিত্র, ''নৌকায় আগমন'', *দেশভাগ বিনাশ ও বিনির্মাণ,* সম্পা- মধুময় পাল, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১১, পৃ-২৬৪

14. তদেব, পৃ-২৬৮-২৬৯

15. তদেব, পৃ-২৭০

16. মোবারক হোসেন, ''কদম্বগাছি না যশোহর, কোনটা ঠিকানা'', *পশ্চিম থেকে পূর্ববঙ্গ দেশবদলের স্মৃতি,* সম্পা- রাহুল রায়, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১৫, পৃ-৮৩

17. ঝর্ণা বসু, ''তারে আমি রাখিয়া এলেম'', *দেশভাগ বিনাশ ও বিনির্মাণ,* সম্পা- অধীর বিশ্বাস, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১৬, পৃ-১০৯-১১০

18. আনিসুজ্জামান, ''আমরা পাকিস্তানে এলাম'', *দেশভাগ বিনাশ ও বিনির্মাণ,* সম্পা- মধুময় পাল, গাঙচিল, ২০১১, পৃ-৫৪

19. সীতা সরকার, ''শাঁখা খুলতে হবে, সিঁদুর মুছতে হবে'', *বর্ডার বাংলা ভাগের দেওয়াল,*

সম্পা- অধীর বিশ্বাস, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১৬, পৃ-৩৫

20. সুনন্দা সিকদার, *দয়াময়ীর কথা,* গাঙচিল, কলকাতা, ২০১০, পৃ-১১

21. সুনন্দা সিকদার, *দয়াময়ীর কথা,* গাঙচিল, কলকাতা, ২০১০, পৃ-৯

22. মিহির সেনগুপ্ত, ''বিষাদবৃক্ষ'', *উজানি খালের সোঁতা,* আনন্দ, কলকাতা, ২০০৭, পৃ-৩১৮

23. আবুল হোসেন, *আর এক ভুবন,* অবসর, ঢাকা, ২০০৫, পৃ-২৬

24. তদেব, পৃ-২৬

25. তদেব, পৃ-২৭

26. মঈন আহমদ, ''যুদ্ধটা যদি পাঁচ দিন পরে হত'', *পশ্চিম থেকে পূর্ববঙ্গ,* সম্পা- রাহুল রায়, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১৫, পৃ-১৩২

27. তদেব, পৃ-১৩০

28. হায়াত মামুদ, ''দেশটাকে কখনও বিদেশ মনে হয়নি'', *পশ্চিম থেকে পূর্ববঙ্গ,* সম্পা- রাহুল রায়, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১৫, পৃ-১০৩

29. হাসান আজিজুল হক, ''ক্রমাগত আত্মখণ্ডন'', *দেশভাগ বিনাশ ও বিনির্মাণ,* সম্পা- মধুময় পাল, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১১, পৃ-১৩৫

30. মনোরঞ্জন ব্যাপারী, ''অনন্ত রাত্রির চণ্ডাল'', *দেশভাগ বিনাশ ও বিনির্মাণ,* সম্পা- মধুময় পাল, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১১, পৃ-২০৭

31. Sekhar Bandyopadhyay, *Decolonization in South Asia,* Orient Blackswan, Hyderabad, 2012, p.-35

32. Sekhar Bandyopadhyay, *Caste, Culture and Hegemony,* Saga Publications, New Delhi, 2004, p.-228

33. মনোরঞ্জন ব্যাপারী, ''অনন্ত রাত্রির চণ্ডাল'', *দেশভাগ বিনাশ ও বিনির্মাণ,* সম্পা- মধুময়

পাল, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১১, পৃ-২১৪

34. তদেব, পৃ-২০৮

35. তদেব, পৃ-২১৪

36. Louise Harrington, An-Other Space : Diasporic Responses to Partition in Bengal, https://core.ac.uk.[accessed-29.10.2022]

37. Sanjeev Khobargada, B. Dhote, Dr. Hitendra, "Homi K Bhaba's Thoughts of Postcolonialism and It's Impact on Indian Literature and Writers", 2017, www.puneresearch.com/english, caccessed on – 27.10.2022]

38. মিহির সেনগুপ্ত, ''সিদ্ধিগঞ্জের মোকাম'', *উজানি খালের সোঁতা*, আনন্দ, কলকাতা, ২০০৭, পৃ-৪২১

উপসংহার

স্মৃতিকথা দেশভাগের একাধিক আখ্যানের সন্ধান দেয়। আখ্যানগুলি সমান্তরাল অথবা কখনও পরস্পরবিরোধী — কিন্তু একমাত্র এইভাবেই দেশভাগের অভিঘাতকে সামগ্রিকভাবে বোঝা সম্ভব। দেশভাগ কেবল বর্ণহিন্দুর বিষাদময় আখ্যান নয়, কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের বিভেদনীতির ফলাফল — এই ধারণাও একপেশে। এই গবেষণাপত্রটিতে দেখানো হয়েছে, দেশভাগের পিছনে সক্রিয় ছিল বাঙালি সমাজের ভিতরের এক গভীর অসুখ। সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোতে বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক আধিপত্য ছিল বর্ণহিন্দুদের করায়ত্ত, তুলনায় মুসলমান ও নিম্নবর্ণীয় হিন্দুরা ছিল সমাজের নীচুতলার মানুষ। বিশ শতকের প্রথমে ক্ষমতা দখলের রাজনীতিতে শিক্ষিত মুসলমান গোষ্ঠী বর্ণহিন্দু গোষ্ঠীর প্রধান প্রতিযোগী হয়ে উঠেছিল। রাজনৈতিক প্রতিযোগিতায় দুই পক্ষই অবলম্বন করেছিল ধর্ম পরিচয়কে। সুতরাং বাংলার হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক আদানপ্রদানের সমান্তরাল সম্পর্ক ক্রমশঃ পরিণত হয়েছিল সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষতে — যার পরিণাম দেশভাগ। দেশভাগের স্মৃতিকথার ন্যারেশনে দুই বঙ্গের মানুষ এই ধর্মগোষ্ঠীগত পরিচয়কে লঙ্ঘন করতে পারেননি। দেশভাগের হেতু হিসেবে নিছক মুসলমানদের বিভেদ-রাজনীতির ধারণাকে ভেঙে দেয় পশ্চিমবাংলার বর্ণহিন্দুর স্মৃতিচারণা। জয়া চ্যাটার্জ্জীর বক্তব্য এ বিষয়ে স্মরণ করা যেতে পারে — “Partition is generally believed to have been a consequence of the separatise politics of Muslim minorities, but in the case of Bengal, Hindus evolved a parallal separatism of their own.”[1]। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা পশ্চিমবঙ্গের বর্ণহিন্দুদের স্মৃতিকথায় গোপন থাকেনি। মনে রাখা দরকার আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার সাম্প্রদায়িক রাজনীতি দেশভাগের বেশ কিছু বছর আগে শুরু হয়েছিল, দেশভাগের পরেই যে তা শেষ হয়ে যায় নি, তা বোঝা যায় স্মৃতিকথার মাধ্যমে। কারণ দেশভাগের স্মৃতির বয়ানগুলি দেশভাগের বেশ কিছু বছর পরে সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ধর্মীয় গোষ্ঠীগত অবস্থান তাঁদের স্মৃতিকথাকে নিরপেক্ষ হয়ে উঠতে দেয়নি।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ধর্মীয় আত্মপরিচয়ের এই আবদ্ধতা এপারের বাঙালির জনপ্রিয়

সাহিত্য-সংস্কৃতিতেও প্রভাব ফেলেছিল। দেশভাগ পরবর্তী সময়ে উল্লেখযোগ্য 'জনপ্রিয় উপন্যাস' বিমল মিত্রর 'সাহেব বিবি গোলাম' থেকে টুকরো উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। উপন্যাসের অনেক ক্ষেত্রে ভাবপ্রবণ হিন্দুত্ববাদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। যেমন, হিন্দু বাঙালির উনিশ শতকীয় গৌরবান্বিত অতীতের কথা উঠে এসেছে এইভাবে — ''আজো মনে আছে সেদিন পথ দেখিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। ... তিনিই নতুন করে আবিষ্কার করলেন গীতাকে। নতুন ব্যাখ্যা দিলেন গীতার। ... কবে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে যুদ্ধবিমুখ অর্জুন উৎসাহ দিয়ে শক্তিমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ...।''[2] এই হিন্দুত্বের আবেগ কখনও কখনও প্রগাঢ় কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতার সঙ্গে উপন্যাসে প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র ঘড়িবাবুর মুখে একটি সংলাপের আরোপ সেই সত্যকে প্রকাশিত করে — ''... নইলে ওই লোকটাকে, ওই বিবেকানন্দকে বলে গরুখোর, মুর্গীখোর, নইলে সাতশবছর মোছলমান রাজত্বে ছ'কোটি মোছলমান হয়, একশ বছর ইংরেজ রাজত্বে ছত্রিশ লক্ষ লোক খৃষ্টান হয়।''[3] শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসের গল্পটির মূল ভরকেন্দ্র মুসলমান রাজত্বের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে হিন্দুদের স্বাধীন শক্তিশালী রাজ্য বিজয়নগর প্রতিষ্ঠার ইতিহাসের মধ্যে। কাহিনির প্রধান চরিত্র রাজা দ্বিতীয় দেবরায় আদর্শ হিন্দুরাজার আদলে গড়া। উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র অর্জুন ও তার বন্ধু বলরাম মুসলমানদের অত্যাচারে দেশছাড়া। বলরামের সংলাপে মুসলমান বিদ্বেষ হিন্দুরাজ্য বিজয়নগরের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে ব্যবহৃত হয়েছে — ''দক্ষিণে যবনদের রাজধানী। ওরা বড় অত্যাচারী, বর্বর জাত।''[4] বলরাম বাংলাদেশ ত্যাগ করার কারণ বলতে গিয়ে বলেছে — ''আরে ভাই, বাংলাদেশ কি আর বাংলাদেশ আছে, শ্মশান হয়ে গেছে; সেই শ্মশানে বিকট প্রেত-পিশাচ নেচে বেড়াচ্ছে। তাই দেশ ছেড়ে পালিয়ে এসেছি।''[5] এইভাবেই দেশভাগ পরবর্তী সময়ে কাহিনি-ভাষ্যে ধরা পড়েছে, ভূখণ্ড ও ক্ষমতা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার কারণে বর্ণহিন্দুর আত্মাভিমান। বর্ণহিন্দুদের স্মৃতিকথার গোষ্ঠীগত অবস্থান এবং জনপ্রিয় উপন্যাসের এই সকল ভাষ্য একত্রে দেশভাগ পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের সমাজ-কাঠামোর অন্যতম মূল অসুখটির দিকে অঙ্গুলি সংকেত করে।

তবে সাম্প্রদায়িকতা অতিক্রমণের চেষ্টাও যে পশ্চিমবঙ্গের কিছু সচেতন মানুষের ছিল না

— এমনটি নয়। তপন রায়চৌধুরী এবং অশোক মিত্রর স্মৃতির বয়ানে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যদিও তপনবাবুর জাতীয়তাবাদী আদর্শবোধ ও অশোক মিত্রর মার্ক্স্‌বাদী চেতনা, সাম্প্রদায়িকতা অতিক্রমণের প্রচেষ্টার ভাষ্যেও সুস্পষ্ট পার্থক্য তৈরী করে দিয়েছে। দেশভাগের পরবর্তী সময়ে কলকাতার বাঙালি মানস মার্ক্স্‌বাদী সংস্কৃতির রাজনৈতিক আধিপত্যের প্রভাবে দেশভাগ, উদ্বাস্তু-দুর্ভোগ ও অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা ইত্যাদি বিষয়কেও সাম্প্রদায়িকতা বোধে ভুলে থাকতে চেয়েছে। এইভাবে সাম্প্রদায়িকতা অতিক্রমণের চেষ্টার পিছনে সক্রিয় ছিল একধরণের পলায়নী মনোবৃত্তি — যা বাস্তবের সামাজিক অসুখটিকে মেরামতের চেষ্টা না করে সরিয়ে রাখার পক্ষপাতী। দেশভাগবিষয়ক কিছু গল্প তাই দেশভাগ ও উদ্বাস্তু-দুর্ভোগকে শ্রেণিশোষণের সমস্যা থেকে বিচ্যুত করে পৃথক কোন মূল্য দিতে চায়নি। বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করতে হয় এইসময়ের মূলধারার বাংলা ছবিগুলিও দেশভাগকে প্রায় ভুলেই থেকেছে। ঋত্বিক ঘটকের সিনেমায় উদ্বাস্তু জীবনবোধ উঠে এসেছে; হয়তো এরকম আরও কিছু স্বল্পসংখ্যক সিনেমার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু মূলধারার জনপ্রিয় বাংলা সিনেমা মূলতঃ রোমান্টিক প্রেমের গল্পই শুনিয়েছে। পশ্চিমবাংলায় বাঙাল উদ্বাস্তুদের সঙ্গে এদেশীয় জনগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সামাজিক সংকটটিও ব্যতিক্রমী দু-একটি সিনেমা ছাড়া মূলধারার জনপ্রিয় সিনেমার বিষয়বস্তু হিসেবে উঠে আসেনি। দেশভাগ নিয়ে একপ্রকার নীরবতা পালন করেছে দেশভাগের পরবর্তী দুই দশকের বাঙালি সংস্কৃতি।

গবেষণাপত্রে অধুনা বাংলাদেশের অধিবাসী মুসলমান ধর্মের মানুষদের স্মৃতি কেন্দ্রিক আলোচনা থেকে একটি সিদ্ধান্তে আসা যায় বাংলাদেশের বেশিরভাগ মুসলমান পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের সমান্তরাল অথচ তাঁদের থেকে স্বতন্ত্র আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রগুলির বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। রাজনীতি সচেতন আবুল মনসুর আহমদ অথবা রাজনৈতিক নেতা বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান — এমনকি লেখক আবু রুশ্‌দ্‌ — এঁরা সরাসরি সমর্থন করেছেন পাকিস্তান আন্দোলনকে অর্থাৎ দ্বিজাতিতত্ত্বকে। যাঁরা পাকিস্তান আন্দোলন নিয়ে সংশয়ী ছিলেন অথবা নীরব ছিলেন এমন দুজন মানুষ সাহিত্যিক আবুল হোসেন ও কবি শামসুর রাহমান — তাঁদের স্মৃতিকথাও দেশভাগের পরে মুসলমানের নিজস্ব দেশে সাংস্কৃতিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বর্ণনায়

উৎসাহিত। তাঁরা যে সংস্কৃতি-উজ্জীবনের ইতিহাস-কাহিনি শুনিয়েছেন, তা অবশ্যই ধর্মবোধ সঞ্জাত নয়, পরন্তু বাঙালির ভাষা-সাহিত্য কেন্দ্রিক। কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই ঢাকাতে সংস্কৃতি জাগরণের ক্ষেত্রে মূল উদ্যোগী মুসলমান বাঙালি-ই। সুতরাং হিন্দু বাঙালির আধিপত্যময় কলকাতার সমান্তরালে মুসলমান বাঙালির ঢাকা-কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা ও আত্মজাগরণের যে বয়ান তাঁরা উৎসাহের সঙ্গে স্মৃতি থেকে তুলে এনে বিশিষ্ট করে তুললেন — তাতে বোঝা যায় স্বদেশপ্রাপ্তি ও আত্মপ্রতিষ্ঠা নিয়ে মুসলমান বাঙালি হিসেবে পরিচিত হতে তাঁদের কোন আপত্তি ছিল না।

তবে একথাও ঠিক কোন কোন ক্ষেত্রে দেশভাগ ও দ্বিজাতিতত্ত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব সংশয়ও তাঁদের বয়ানে ধরা পড়েছে। শামসুর রাহমানের স্মৃতিকথায় দেখি দেশভাগ নিয়ে তাঁর স্পষ্ট আক্ষেপ —''এখন মাঝে মধ্যে মনে হয়, যদি এই উপমহাদেশে কখনও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা না হত, ... এই উপমহাদেশে রক্তবন্যা বইত না, দেশ তিন খণ্ডে খণ্ডিত হত না। অসংখ্য সংসার ছারখার হত না। কিন্তু পরম পরিতাপের বিষয়, আখেরে যা হওয়ার তাই হল।''[6] স্মরণকর্তা যখন স্মৃতিচারণ করেছেন, তাঁর সেই 'বর্তমান'-এ তখন তিনি পরিণত বয়সের; তাঁর সেই সময়ের অনুভূতি দেশভাগের বিপক্ষে। যদিও ছয়ের দশকে ভারত-পাক যুদ্ধের সময় পূর্বপাকিস্তানের মুসলমান বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে তাঁর সমর্থনও যে তাঁদের তদানীন্তন 'স্বদেশ' পাকিস্তানের স্বপক্ষে ছিল, সে কথাও তাঁর স্মৃতিচারণায় উঠে এসেছে — ''সংক্রামক এই উত্তেজনা, যার ফলে আমার শান্ত মনেও যুদ্ধের হালকা ধরনের ধাক্কা লাগল। ... আবদুল গাফফার চৌধুরী এবং আরও কোনো সাংবাদিক পশ্চিম পাকিস্তান ভ্রমণ করে যুদ্ধপরবর্তী হাল হকিকত, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর শৌর্য বীর্যের কথা ও কাহিনি শুনে ফিরে এসে, বেশ কিছু লেখালেখি করেন।''[7] পাকিস্তানের জাতীয়তাবাদ দ্বারা সংক্রমিত কবি পাকিস্তান সৈন্যদলকে 'শহীদ' আখ্যা দিয়ে একটি কবিতা লেখেন — যে কবিতার কথা তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন — ''... কেননা শহীদগণ/করেছেন আত্মদান, তাঁদের মহিমা সৃষ্টি করে স্বপ্ন,/বেড়ে ওঠে গাছ, ধ্বংসস্তূপে প্রেমময় হাত সৌন্দর্য জাগায়;/আমার সজীব দেশ কালের স্পন্দিত ডালে রক্তিম গোলাপ।''[8] বস্তুতঃ আবুল মনসুর আহমদ তাঁর স্মৃতিচারণামূলক গ্রন্থটিতে সংশয়হীনভাবে স্পষ্ট বলেছেন — ''অথচ প্রকৃত

অবস্থাটা এই যে বাংলাদেশের স্বাধীনতায় পাকিস্তানও ভাংগে নাই; 'দ্বিজাতিতত্ত্ব' ও মিথ্যা হয় নাই।"[9] আবুল মনসুরের সংশয়হীন দ্বিজাতিতত্ত্বের সমর্থন পাক্-আমলে রবীন্দ্রনাথকে হিন্দুকবি হিসেবে নিষিদ্ধ করার স্বপক্ষে তাঁর মন ও মতবাদকে চালিত করেছিল। পাকিস্তানের সৈন্যদলকে শহীদ আখ্যা দিলেও কবি শামসুর রাহমান এই মতের বিরোধিতা করেন। বস্তুতঃ দেশভাগ ও আত্মপরিচয় নিয়ে বাংলাদেশের নাগরিক মনের দ্বিধাবিভক্তিকেই শামসুর রাহমান তাঁর অন্তরে ধারণ করেছিলেন। শুধু পাকিস্তানী আমলেই নয়, মুসলমান সাম্প্রদায়িক আত্মপরিচয় স্বাধীন বাংলাদেশেও যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি, সে সম্পর্কে অধ্যাপক আনিসুজ্জামানও বলেছেন তাঁর একটি প্রবন্ধে — ''নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘুদের কথা বিবেচনা করে নয়, বরঞ্চ বাঙালি জাতীয়তাবাদের আওতায় অন্য দেশের বাঙালিরা স্থান করে নিতে পারে, এই আশঙ্কায় সংবিধান-সংশোধনের প্রবক্তারা বাঙালির বদলে 'বাংলাদেশি' শব্দ স্থাপন করেন, তাঁদের যুক্তিতর্ক থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। আসলে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের পক্ষে যা যা বলা হয়, তা ১৯৪০-এর দশকে মুসলিম লিগের দ্বিজাতিতত্ত্বের ব্যাখ্যার সঙ্গে অভিন্ন।"[10] বস্তুতঃ দেশভাগকে দুঃখের অথবা আনন্দের — কি ভাবে মনে রাখবেন বাংলাদেশের বাঙালি — সে বিষয়ে তাঁদের কোন স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি নেই। সেই প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে বাংলাদেশের স্মৃতিকথাগুলির সামগ্রিক আলোচনা থেকে। তাঁদের এই সংশয়-এর বিষয়ে সেমন্তী ঘোষ একটি মূল্যবান মন্তব্য করেছেন — ''... আজও বাংলাদেশের মানুষের কাছে ১৯৪৭-এর কোনও স্পষ্ট সংজ্ঞা তৈরী হয়নি, স্পষ্টত আনন্দের কিংবা বিষাদের কোনও উপলক্ষ হয়ে ওঠেনি।"[11] পশ্চিমবঙ্গ থেকে যেসকল মুসলমানরা ওপারে চলে গেলেন, তাঁরাও একই কারণে শেকড় অনুসন্ধানের জন্য পশ্চিমবঙ্গে ফেলে আসা জীবন সম্পর্কে ভাবাবেগকে অথবা আত্মপরিচয় নিয়ে কোনরকম আন্তরিক দ্বিধাকে জোর করে অতিক্রম করতে চেষ্টা করেছেন।

দেশভাগের অভিঘাত নিম্নবর্গ নিম্নবর্ণীয়দের উপর কতটা নিষ্করণ ও ভয়াবহ ছিল, সে বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের গল্প-উপন্যাস নীরব। তবে আধুনিক ইতিহাসচর্চা নিম্নবর্গীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ইত্যাদি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কাজের নজির রেখেছে। ক্যাম্পবাসী নিম্নবর্গীয় উদ্বাস্তু জীবনের পুনর্বাসন ও উদ্বাস্তুদের সঙ্গে রাষ্ট্রের সংগ্রাম — এই পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিপরীত

বিশ্লেষণের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হল ঐতিহাসিক জয়া চ্যাটার্জীর লেখা "Right Or Charity" প্রবন্ধটি। বস্তুতঃ দেশভাগের পূর্বে আত্মপরিচয়ের রাজনীতিতে প্রধান দুই বিরোধী পক্ষ ছিলেন বাংলার মুসলমান ও বর্ণহিন্দু জনগোষ্ঠী। নিম্নবর্ণীয়দের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম প্রান্তীয়ই থেকে গেছে — যদিও প্রধান দুই পক্ষ দেশভাগের পূর্ব থেকেই নিম্নবর্ণীয়দের স্বাধিকারের লড়াইকে নিজগোষ্ঠীর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার রাজনীতিতে ব্যবহার করেছে প্রয়োজন মতো। এইভাবেই নিম্নবর্ণীয়দের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবির রাজনীতিকরণ হয়েছে বিভিন্ন সময়ে হিন্দু অথবা মুসলমানদের দ্বারা। অথচ দেশভাগের পর নবসৃষ্ট দুই রাষ্ট্রই এঁদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে অথবা করতে চেয়েছে। দেশভাগের পর এপার বাংলায় এসে নিম্নবর্ণীয় উদ্বাস্তুদের নাগরিক অধিকারের জন্য সংগ্রাম বস্তুতঃ বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম রসদ সংগ্রহের লড়াই। এই লড়াই ক্রমশ যে একটি রাজনৈতিক রূপ পাচ্ছিল, তা রাধিকারঞ্জন বিশ্বাস, যোগেন্দ্রনাথ রায় এবং মনোরঞ্জন ব্যাপারীর স্মৃতির ভাষ্যে স্পষ্ট ধরা পড়ে। আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক লড়াই দেশভাগের পূর্বেই নিম্নবর্ণীয় হিন্দুগোষ্ঠীর মধ্যে সংহত হয়েছিল। কিন্তু দেশভাগের পরে ভিন্ন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে তাঁদের রাজনৈতিক লড়াই নতুনরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই কারণেই দেখবো রাধিকারঞ্জন বিশ্বাস ও যোগেন্দ্রনাথ রায় স্মৃতিকথায় ক্যাম্পনিবাসের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্গেই ক্যাম্পে নিম্নবর্গীয় উদ্বাস্তুদের আন্দোলনের ইতিহাসও বর্ণনাকেও সমান প্রাধান্য দিয়েছেন। রাধিকারঞ্জন লিখেছেন — ''... ক্যাম্পবাসী উদ্বাস্তুদের মনে দিনে দিনে ক্ষোভ জমা হতে থাকে। ১৯৭৩ সালে সতীশ মণ্ডল, রঙ্গলাল গোলদার প্রমুখের নেতৃত্বে উদ্বাস্তুদের ঐক্যবদ্ধ করে তাদের দাবিদাওয়া সঠিকভাবে তুলে ধরার জন্য 'উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি'র জন্ম হয়।"[12] নিম্নবর্গীয়দের এই রাজনীতির প্রতিপক্ষ অবশ্যই ছিল উচ্চবর্গীয় হিন্দু ও মূলতঃ তাঁদের নিয়ন্ত্রণাধীন রাষ্ট্রব্যবস্থা। নিম্নবর্ণীয় উদ্বাস্তুদের উপর রাষ্ট্রের সন্দেহ ও দমননীতির প্রসঙ্গ এসেছে রাধিকারঞ্জনের স্মৃতিকথায় — ''উদ্বাস্তুরা যাতে সংঘবদ্ধ হয়ে সমিতির পাশে না দাঁড়াতে পারে তার জন্য ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ ভয়ভীতি প্রদর্শন, পুলিশ দিয়ে হয়রানি করা সহ বিভিন্ন চক্রান্তমূলক কাজ শুরু করে।"[13] রাধিকারঞ্জন, বিশেষতঃ মনোরঞ্জন ব্যাপারীর ভাষায় যে ক্রোধ প্রকাশ পেয়েছে তার পিছনে আত্মসত্তা প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক অভিপ্রায়টিকে অস্বীকার করা যায় না। প্রতিপক্ষ শক্তিশালী রাষ্ট্রের

ভূমিকা এবং ক্যাম্পবাসীদের অসহায়ত্ব বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁরা সহিংস সন্ত্রাস, নারীর মর্যাদা নষ্ট হওয়া এবং ধর্ষিত হওয়া এইসকল বিষয়কে স্মৃতিচারণায় তুলে এনেছেন — যে বিষয়গুলিকে হিন্দুরাও দেশভাগের পরে মুসলমান আধিপত্যের স্মৃতিচারণায় প্রাধান্য দিয়েছে। অর্থাৎ দুর্বল ও হেরে যাওয়া অবস্থান থেকে আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার রাজনীতি প্রতিপক্ষের আক্রমণকারী ভূমিকাটিকে বিশেষভাবে মনে রাখতে চায় এবং সবাইকে জানাতে চায়। উচ্চবর্ণীয়রা ওপার থেকে চলে আসতে বাধ্য হ'লেও এপারে এসে শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি — সর্বত্র তাঁদের অবস্থানকে সুনির্দিষ্ট করতে পেরেছিল। কিন্তু নিম্নবর্ণীয় উদ্বাস্তু মানুষগুলির ক্ষেত্রে দেখবো, কৃষক বিচ্ছিন্ন হলেন জমি থেকে, জেলে তাঁর নদীটি থেকে, কামার-কুমোর-নাপিত বিচ্ছিন্ন হলেন তাঁদের বিশেষ পারঙ্গমতা থেকে — যা তাঁরা অর্জন করেছিলেন বংশানুক্রমিকতায় এবং যা তাঁদের জীবিকা অর্জনের মাধ্যম ছিল। এই কারণেই এদেশে এসে তাঁরা সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন প্রত্যাখ্যাত হলেন, তেমনই আর্থিকভাবেও তাঁরা চরম সঙ্কটের মুখোমুখি হ'লেন। স্মৃতির বহুমাত্রিকতা থেকে বাংলার সামাজিক স্তরবিন্যাস ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের স্বরূপ বোঝা যায়। প্রাক্-বিভাজনের বাংলায় সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে যাঁরা কৌলিন্য অর্জন করেছিলেন অথবা যাঁরা প্রান্তীয় ও দরিদ্র ছিলেন, স্থানান্তরিত হওয়ার পরেও তাঁদের অবস্থানের সেইরূপ পার্থক্য থেকেই গেল। স্বাধীন সার্বভৌম দেশে তার কোনরকম পরিবর্তন হ'ল না।

দেশভাগ নিয়ে নারীর স্মৃতিকথা কিন্তু একভাবে একটি সদর্থক সামাজিক পরিবর্তনকে নির্দেশ করে। উনিশ শতক থেকে নারীমুক্তির সংগ্রাম বাংলার সমাজে শুরু হয়েছিল। কিন্তু হিন্দু-জাতীয়তাবাদী মনোভাবের উত্থান নারীর ক্রম-অগ্রসরণে প্রতিবন্ধকতাও সৃষ্টি করেছে অনেক। দীর্ঘ সময় ধরে নারীর সর্বাঙ্গীণ মুক্তির জন্য অনেক আন্দোলন ও প্রচেষ্টা পিতৃতান্ত্রিক ধর্মীয় রক্ষণশীলতার প্রভাবে যা করে উঠতে পারেনি, দেশভাগের আকস্মিক বিপর্যয় সেই সবকিছুকে সম্ভব করে তুললো। উদ্বাস্তু পরিবারের অন্নসংস্থানের প্রয়োজনে নারীকে বেরিয়ে আসতে হ'ল পরিবারের ব্যক্তিগত পরিসর থেকে কর্মজগতের গণপরিসরে। শুরু হ'ল নতুনরকমের লিঙ্গ-সংঘাত, সত্যজিত রায়ের 'মহানগর' সিনেমায় যার পরিচয় পাই। দেশভাগের পরে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ ও সংগ্রামের স্বতন্ত্র চিত্র ধরা আছে স্মৃতিকথাগুলিতে। উদ্বাস্তু হিসেবে কলোনীর

জন্য সংগ্রামে তাঁরা রাজনীতির অংশীদার, আবার পরিবারের অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়ে মান-সম্ভ্রম-জীবনকে বাজি রেখে রাজনৈতিক সীমারেখা পারাপার করার ক্ষেত্রেও তাঁরা দুঃসাহসী। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে বিষয়টি, দেশভাগের সময় থেকে পরিবারের ভাল-মন্দ অথবা অর্থনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কথাও স্মৃতিকথার মাধ্যমে জানা যায়। দেশছাড়ার যন্ত্রণা নারীর জীবনে অবশ্যই ছিল। তবুও দেশভাগ পিতৃতান্ত্রিক অচলায়তনকে ধাক্কা দিয়ে নারী জীবনে একপ্রকারের সচলতা যে আনতে পেরেছিল — এ কথা অস্বীকার করা যাবে না।

দেশভাগ হওয়ার পর প্রথম প্রায় দেড় দশক জুড়ে দেশভাগকে নিয়ে বাংলাসাহিত্যের নীরবতার কারণ হিসেবে অনেকগুলি বিষয় কাজ করেছিল। একটি কারণ যদি হয় মার্ক্সবাদী রাজনীতির প্রভাব, অপর কারণ অবশ্যই বিভাজিত বাঙালি সত্তার আত্মিক গ্লানি। উদ্বাস্তু জীবনের ট্রমা-ও যে তাঁদের নীরব রেখেছিল — একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু ১৯৭১ সালে ভাষার ভিত্তিতে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কিছু বছর আগে থেকে অর্থাৎ যখন থেকে পূর্ববঙ্গে বাঙালির নিজস্ব দেশ-এর জন্য মুক্তিযুদ্ধ একটি নির্দিষ্ট রূপ পেল, সেইসময় থেকে আত্মগ্লানি অথবা ট্রমা কাটিয়ে বাঙালি সত্তার এক নতুন উদ্‌যাপন শুরু হয়েছিল দুই বাংলাতেই। এই সময় থেকেই দেখবো, দেশভাগ গল্প উপন্যাসগুলিতে কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে উঠছে এবং বহুসংখ্যায় প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। দেশভাগের পূর্বের ও পরের জীবনকে আবার নতুন করে মনে করতে শুরু করলেন দুই বঙ্গের বাঙালি। অন্নদাশংকর রায় লিখলে ''যুক্তবঙ্গের স্মৃতি'' (প্রথম প্রকাশ ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ)। আটের দশকে মণিকুন্তলা সেনের আত্মজীবনীতে সমগ্র বাংলাদেশ সহ বরিশালের স্মৃতি বিস্তৃতভাবে জায়গা করে নিল। বিশশতকের নয়ের দশক থেকে পশ্চিমবাংলায় দেশভাগের স্মৃতিকথা আরও বেশি সংখ্যায় লেখা শুরু হয়েছে। অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির আত্মকাহিনির ভিতর দেশভাগের স্মৃতি বিশেষ স্থান করে নিল। তপন রায়চৌধুরীর 'রোমন্থন অথবা ভীমরতি প্রাপ্তর পরচরিতচর্চা' (১৯৯৩) নয়ের দশকে বরিশালী সংস্কৃতির সুরসিক বিবরণে সমৃদ্ধ। মিহির সেনগুপ্তর বরিশাল কেন্দ্রিক প্রথম গ্রন্থ নয়ের দশকেই ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত। তাঁর উল্লেখযোগ্য স্মৃতিগ্রন্থ 'বিষাদবৃক্ষ' প্রকাশ পেল ১৪১০ বঙ্গাব্দে। এই শতাব্দীর প্রথম দুইদশকে দেখি দেশভাগ-কেন্দ্রিক বড় আকারের স্মৃতিকথা অথবা অনু-স্মৃতিকথার সংকলন বাঙালি সমাজে নতুন

আগ্রহের বিষয় হয়ে উঠেছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, পূর্ববাংলাতেও দেশভাগ নিয়ে মুক্ত বক্তব্য প্রকাশের পরিসর তৈরী হয়েছে। বাংলাদেশে যদিও কেবলমাত্র ১৯৪৭ সালের দেশভাগ নিয়ে কোন লেখা নেই। কিন্তু উল্লেখযোগ্য আত্মজীবনীগুলির ভিতর ১৯৪৭ সালের দেশভাগের স্মৃতির বিবরণ নিজস্ব ভঙ্গিমায় জায়গা করে নিয়েছে। পূর্ববঙ্গের মানুষ বস্তুতঃ ১৯৪৭-এ পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর থেকে ১৯৭১ এ স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি পর্যন্ত তাঁদের সামাজিক-রাজনৈতিক -সাংস্কৃতিক যাত্রাপথের রেখাচিত্রটিকে ধরতে চেয়েছেন নিজেদের স্মৃতির বিবরণে। এই দিক থেকে পশ্চিমবাংলার সঙ্গে পূর্ববাংলার স্মৃতিকথার পার্থক্য আছে। কিন্তু গত শতকের নয়ের দশক থেকে দেশভাগের স্মৃতি দুই বাংলাতেই যে ক্রমশঃ প্রান্তীয় বিষয় থেকে কেন্দ্রে চলে আসছে — এই বিষয়টি অবশ্যই লক্ষ্য করার মত।

দেশভাগ নিয়ে আবেগের প্রকাশ প্রথম ধরা পড়েছে কবিতায়। কিন্তু উপন্যাস ছোটগল্পের অর্গলমুক্ত ধারা প্রবাহিত হতে শুরু করেছে ১৯৭১ সালের আগে পূর্বপাকিস্তানে বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও মুক্তিযুদ্ধ যখন থেকে সুসংবদ্ধ হ'তে শুরু করে সেই সময় থেকেই। এইভাবে কবিতা থেকে কথাসাহিত্য — ক্রমশঃ দেশভাগ জনিত বেদনার্ত আবেগের প্রকাশ থেকে বাস্তব জীবনসমস্যা ও যন্ত্রণার কাহিনির দিকে যাত্রা শুরু করল বাংলাসাহিত্য। যদিও উপন্যাস ছোটগল্পের কল্পনার কাহিনির ভিতর দেশভাগকে বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ যাচাই করা সম্ভব ছিল না। পশ্চিমবঙ্গের উপন্যাস-ছোটগল্প মূলতঃ বাঙালির সমাজ জীবনের আধিপত্যবাদী সংস্কৃতির প্রতিফলন হয়ে থেকেছে। সুতরাং বর্ণহিন্দুর বিষাদময়তা, উদ্বাস্তু জীবনে শ্রেণিশোষণ, অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ — প্রভৃতি সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনের উপরিকাঠামোর অনুভূতি ও বোধগুলি উপন্যাস-ছোটগল্পে শিল্পিত রূপ পেয়েছে। কিন্তু নয়ের দশক থেকে স্মৃতিকথার যে উদ্‌যাপন শুরু হ'ল, তা দেশভাগকে বহুমাত্রিকতায় ধরতে চেয়েছে। বিভিন্ন গোষ্ঠীর দৃষ্টিকোণ থেকে দেশভাগের হেতু ও অভিঘাত স্মৃতিকথার বয়ানে যেভাবে ধরা পড়েছে, তাতে বোঝা যায় দেশভাগ বিষয়টি ক্রমশঃ আত্মপরিচয়ের প্রকাশভূমি হয়ে উঠেছে। স্মৃতিকথার বয়ান দেশভাগের বিভিন্ন, বৈচিত্র্যময় এমনকি অনেক সময় পরস্পর বিরোধী আপেক্ষিক সত্যকে প্রকাশ করেছে। দেশভাগের প্রত্যক্ষতা ও অনু-বাস্তবতার স্পর্শে স্মৃতিকথাগুলি স্বতন্ত্র, স্মৃতিকথাগুলির বহুমাত্রিক

সামাজিকতার দ্বন্দ্ব বাঙালির কয়েক দশকের ইতিহাস, সমাজ সংগঠন, মানসিকতা ও সংস্কৃতির বিশেষ আদলটিকে বুঝতে সাহায্য করে।

অধুনা বাংলাদেশের স্মৃতিকথাগুলির যাত্রা জাতিসত্তাপরিচয় নির্মাণের পথ ধরে। তাঁদের স্মৃতিতে ১৯৭১-এর স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মের উদ্‌যাপনের আবেগ বেশি প্রাধান্য পেলেও ১৯৪৭ সালের দেশভাগকে নিয়েও তাঁরা নতুনভাবে চিন্তা শুরু করেছে। বাংলাদেশের ব্যতিক্রমী দুটি কথাসাহিত্য ''খোয়াবনামা'' (১৯৯৬) ও ''আগুনপাখি'' (২০১১) ১৯৪৭-এর দেশভাগকে কেন্দ্রে স্থাপন করে আখ্যানদেহ নির্মাণ করেছে এবং দেশভাগকে কেন্দ্র করে আত্মানুসন্ধানের এক উজ্জ্বল স্মারক হয়ে উঠেছে উপন্যাসদুটি। বাংলাদেশের স্মৃতিকথাগুলির চলন ঠিক এইভাবে গড়ে ওঠেনি। তথাপি ১৯৪৭ সালের দেশভাগকে তাঁরা বিভিন্নভাবে, বিভিন্নধরনে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন — একথাও অনস্বীকার্য। উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হ'ল ১৯৯০ সালে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিসেবে দীনেশ চন্দ্র দেবনাথের স্মৃতিকথা প্রকাশের বিষয়টি। পাকিস্তানী আমলে সংখ্যালঘুর উপরে অত্যাচারের দায় স্বীকারের উদাহরণ হিসেবে গৃহীত হ'তে পারে দীনেশবাবুর আত্মকথা প্রকাশনার বিষয়টি। এইভাবেই দায়পালনের স্পষ্ট অঙ্গীকার বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের স্মৃতিকথাতেও ধরা পড়ে। ২০১২ সালে বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থটির প্রকাশ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশিষ্ট অভিপ্রায়টিকে স্পষ্ট করে তোলে।

দেশভাগকে রাজনৈতিক ভাগাভাগি বলার সঙ্গে মনের ভাগাভাগিও কি বলা যায়? এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর স্মৃতিকথাগুলি থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ পশ্চিমবঙ্গের মানুষের দেশভাগের স্মৃতি প্রধানও নেতিবাচক হ'লেও বাংলাদেশের স্মৃতিতে আত্মসচেতন আত্মনির্মাণের আনন্দ আছে। আবার মুক্তিযুদ্ধের পরে দুইবাংলার কথাসাহিত্যে এবং স্মৃতিসাহিত্যেও শাশ্বত বাঙালিসত্তা অন্বেষণের যে আকাঙ্খা, তার থেকে দেশভাগকে মনের ভাগাভাগি হিসেবে মেনে নেওয়া যায় না। সন্‌জীদার স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ ও পয়লা বৈশাখ — এই দুটি বিষয়কে বিভক্ত দুইপারের বাঙালিসত্তার মধ্যবর্তী সেতু হিসেবে গড়ে তোলার নাগরিক প্রচেষ্টাসমূহ সম্পর্কে। কিন্তু হাসান আজিজুল হক বাঙালির অখণ্ড আত্মসত্তার অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন ভিন্নপ্রকারে — ''কিন্তু বাঙালির লৌকিক জীবন থেকে, তার সাহিত্য আর আচরণীয় কর্ম

থেকে, তার সাংস্কৃতিক সামাজিক ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ড থেকে, তার গৃহনির্মাণে, গৃহসামগ্রী তৈরীতে, অবসর যাপনে আত্মসত্তার যেন দেখা মেলে।"[14] মিহির সেনগুপ্ত তাঁর সত্তার উৎস সন্ধান করতে চেয়ে লিখেছেন — ''একদার সেই গ্রামীণ জীবনযাপন, যেখানে একদিন রকমারি কথাকার, পালাগায়ক, জারিয়াল-কবিয়াল, কামার-কুমোর, ধোপা-নাপিত মাগিমদ্দদের সঙ্গে সম্পৃক্তি ছিল ... তাদের কথা-কহবতের নির্যাসে যে রোমন্থন, তার উৎসার যে অনন্ত পসরা নিয়ে আকুলি-বিকুলি করতে করতে বেরোতে চায়।"[15] এইভাবে লোকজীবনের সংস্কৃতিকে তিনি অবলম্বন করতে চেয়েছেন তাঁর উজানপথের যাত্রায়। যদিও 'বিষাদবৃক্ষ'-তে তাঁর গোষ্ঠীগত অবস্থান স্মৃতির বয়ানে ধরা পড়েছে — যা লোকজীবন থেকে তাঁর দূরত্বকে নির্দিষ্ট করে দেয়। পূর্ববাংলার মুসলমান আত্মজনদের সঙ্গেই নিম্নবর্গের মানুষের চরিত্রগুলি সুনন্দার স্মৃতিচারণায় ভিড় করে এসেছে। তাঁর স্মৃতিতেও এসেছে 'শাস্তর'-এর প্রসঙ্গ। জয়জ্যাঠা ও সমসেরচাচা তাঁকে 'শাস্তর' শোনাতেন। এইভাবে রূপকথার লোকসাহিত্যের প্রেক্ষিতে হিন্দু-মুসলমান বাঙালির ভেদাভেদহীনতার স্মৃতি দয়াময়ী মনে রেখেছেন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নিরিখে।

কিন্তু এতদ্ সত্ত্বেও দেশভাগ ও উদ্বাস্তু জীবনের বাস্তবতাকে অস্বীকার করা যায় না। স্মৃতিকথায় আত্মপরিচয়ের সন্ধান করতে গিয়ে উদ্বাস্তু-চেতনার সংকটগুলিও প্রকট হয়ে ওঠে। স্থানান্তরিত মানুষগুলির আত্মসংকট যদিও গোষ্ঠী অনুযায়ী আলাদা রকমের। উচ্চবর্গীয় মানুষগুলি ভারতে রাজনৈতিক পরিচয় পেয়েও 'দেশ' খোঁজেন তাঁদের ফেলে আসা জেলা অথবা অঞ্চলে। নিম্নবর্গীয় মানুষদের অবস্থান প্রান্তীয় তৃতীয় পরিসরে। তাঁদের রাজনৈতিক পরিচয়-প্রাপ্তিতেও সংকট তৈরী হয়। দুই দেশে ভাগ হয়ে যাওয়া পরিবারের যন্ত্রণা বহন করে চলে দুইপারের হিন্দু অথবা মুসলমানগোষ্ঠী। এইসব মানুষের তথাকথিত বে-আইনী সীমারেখা লঙ্ঘন রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবোধ সম্পর্কিত আধুনিক ধারণাগুলিকে নাকচ করে দিতে চায়, জেরা করে পাসপোর্ট-ভিসা রাজনীতিকে। স্থানান্তরিত মানুষগুলির আত্মপরিচয়ের সংকটকে ভিকটিম ডায়াস্পোরার অন্তর্গত ধরে নিয়ে জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করা যায়। সারা পৃথিবী জুড়ে যুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের কারণে অজস্র মানুষ জন্মভূমি ত্যাগ করে অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করে চলেছেন। সেই প্রেক্ষিতে ভারত উপমহাদেশের পূর্বপ্রান্তের বিতাড়িত মানুষের

স্মৃতিকথার মাধ্যমে 'ভিকটিম ডায়াস্পোরা' অথবা 'বিতাড়িত অভিবাসন' বিষয়ে আলোচনার একটি বাস্তব ভিত তৈরী করার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না।

দেশভাগের স্মৃতিকথাগুলিতে আত্মপরিচয়ের সন্ধান দুই বঙ্গের বাঙালির সমাজসংগঠন ও রাজনীতির চলনটিকে বুঝতে সাহায্য করেছে এইভাবে। দেশভাগ অর্থনীতির ক্ষেত্রে দুই বাংলাকেই দুর্বল করে দিয়েছিল। যে পাটশিল্প ছিল অখণ্ড বাংলার অর্থনীতির ভিত্তি, দেশভাগের কারণে তা পর্যুদস্ত হয়ে যায়। কারণ পাটচাষের ক্ষেতগুলি বেশিরভাগ ছিল পূর্ববঙ্গে এবং কলকারখানাগুলি ছিল পশ্চিমবঙ্গে। খাদ্যাভাব, উদ্বাস্তু সমস্যা পশ্চিমবঙ্গকে আর্থিকভাবে দুর্বল করে দিয়েছিল। পূর্বপাকিস্তানেও দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। দেশভাগের অভিঘাতে চাষী বিচ্ছিন্ন হয়েছে জমি থেকে, জমিদার প্রজা থেকে, উৎপাদক স্থানীয় বাজার থেকে। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের বিক্ষিপ্তচিত্র স্মৃতিকথাগুলিতে থাকলেও, সামগ্রিকতায় এখনও উঠে আসেনি। বস্তুতঃ এই কারণে দরকার আরও বেশি স্মৃতি সংগ্রহ করার — যেখানে দেশভাগের অর্থনৈতিক অভিঘাতের ক্ষয়িষ্ণু রূপটি সামগ্রিকতায় ধরা পড়বে। পাটচাষের কৃষক অথবা পাটজাত পণ্য উৎপাদনের শ্রমিকের স্বর শোনা যাবে, অথবা অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ আরও অনেক গোষ্ঠীর জীবনে দেশভাগের অভিঘাত কি ছিল — সে বিষয়ে জানা যাবে। যে মুসলমান সম্প্রদায় ধর্মনিরপেক্ষ ভারত রাষ্ট্রে থেকে গেলেন, তাঁরা তাঁদের ধর্ম পরিচয় ও জাতি পরিচয়ের মধ্যে কি ভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করলেন, আত্মপরিচয় জনিত কোনরূপ সংকট দেশভাগের সময় অথবা তারপরে তাঁরা অনুভব করেছেন কিনা, অথবা ছিন্নমূল মানুষ যাঁরা — তাঁদের দ্বিতীয় প্রজন্মের উপর দেশভাগের অভিঘাত কি, দেশভাগ ও ধর্মীয় আত্মপরিচয়ের রাজনীতিকে পরবর্তী প্রজন্মের মানুষ কোন্ তাৎপর্যে গ্রহণ অথবা বর্জন করতে চান, দেশভাগকে তাঁরা কিভাবে স্মৃতিতে ধরে রাখতে চান — সেসব বিষয়ে আরও বিস্তৃত আলোচনার জন্যও আরও অনেক স্মৃতি সংগ্রহ অবশ্য প্রয়োজনীয়।

দেশভাগের 'স্মৃতি'র আলোচনায় প্রেক্ষিতকে নেপথ্য থেকে বের করে এনে আলোচনার অন্তর্গত করলে দেশভাগের হেতু ও অভিঘাতকে বহুমাত্রিকতায় আবিষ্কার করা যায়। শুধু

বিষাদময়তা নয়, জাতি নির্মাণের উদ্‌যাপনও দেশভাগেরই পরিণাম, মানুষের রাজনৈতিক পরিচয় ও সামাজিক সংলগ্নতার জন্য নিয়ত লড়াইও দেশভাগের পরিণাম। বিচ্ছিন্নতা ও সাম্প্রদায়িকতার প্রবল প্রকাশের বিপ্রতীপে সাংস্কৃতিক ঐক্যের অনুধাবন ও সত্তার প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্ব দেশভাগের কারণেই। বিভাজনের অস্বাভাবিক বন্দোবস্তের কারণে দেশভাগের এত বছর পরেও সীমান্ত পারাপার, নাগরিকতা ও অনুপ্রবেশ ছিটমহলের মানুষের দেশহীনতা ইত্যাদি সমস্যা দুই ভূখণ্ডের মানুষের কাছে সমান প্রাসঙ্গিক। সুতরাং ১৯৪৭-এর দেশভাগ একটি চলমান ঘটনা। তার স্মৃতি থেকে বাঙালি জীবনের মুক্তি নেই। দেশভাগের বহুমাত্রিক স্মৃতির আলোচনা দেশভাগজনিত কারণে ভারতীয় উপমহাদেশের কতকগুলি অনির্ণীত সমস্যার দিকে অঙ্গুলি সংকেত করে এইভাবে।

তথ্যসূত্র

1. Joya Chatterjee, *Bengal divided,* Cambridge University Press, Cambridge, 1994, p.-266.
2. বিমল মিত্র, *সাহেব বিবি গোলাম,* নিউএজ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৬৩, পৃ-৬৬৪.
3. তদেব, পৃ- ১৪৯.
4. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ''তুঙ্গভদ্রার তীরে'', *শরদিন্দু অম্নিবাস তৃতীয় খণ্ড*, আনন্দ, কলকাতা, ১৪০৪, পৃ-৪৯৯.
5. তদেব, পৃ-৫০০.
6. শামসুর রাহমান, *কালের ধুলোয় লেখা,* প্রতিভাস, কলকাতা, ২০০৮, পৃ-৮০.
7. তদেব, পৃ-১৮৯.
8. তদেব, পৃ-১৯২.

9. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার-দেখা রাজনীতির পঞ্চাশবছর,* খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ২০১৩, পৃ-৬৩৪

10. আনিসুজ্জামান, *বাঙালি ও বাংলাদেশ,* মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৪২১, পৃ-২২.

11. সেমন্তী ঘোষ, ''ভূমিকা : দেশভাগের ইতিহাস আর স্মৃতি-বিস্মৃতি'', *দেশভাগ স্মৃতি আর স্তব্ধতা,* সম্পা-সেমন্তী ঘোষ, গাঙচিল, কলকাতা, ২০০৯, পৃ-২২.

12. রাধিকারঞ্জন বিশ্বাস, ''দণ্ডকারণ্যে যা দেখেছি, যা পেয়েছি'', *দেশভাগ বিনাশ ও বিনির্মাণ,* সম্পা-মধুময় পাল, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১১, পৃ-১৯৬-১৯৭.

13. তদেব, পৃ-১৯৯.

14. হাসান আজিজুল হক, ''ক্রমাগত আত্মখণ্ডন'', *দেশভাগ বিনাশ ও বিনির্মাণ,* সম্পা:-মধুময় পাল, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১১, পৃ-১৩৪.

15. মিহির সেনগুপ্ত, ''বিষাদবৃক্ষ'', *উজানি খালের সোঁতা,* আনন্দ, কলকাতা, ২০০৭, পৃ:-৭০

গ্রন্থতালিকা

আকর গ্রন্থ

1. অর্জুন গোস্বামী সম্পাদিত, *কলকাতা ও নোয়াখালির দাঙ্গা*, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১৬

2. অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, *নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩

3. অধীর বিশ্বাস সম্পাদিত, *বর্ডার বাংলাভাগের দেওয়াল*, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১৬

4. অধীর বিশ্বাস সম্পাদিত, *গাঙচিল পত্রিকা, সূচনা সংখ্যা, বিষয়-শরণার্থী*, কলকাতা, ২০০৭

5. অন্নদাশঙ্কর রায়, *যুক্তবঙ্গের স্মৃতি ও মুক্তবঙ্গের স্মৃতি*, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৪২১

6. অশোক মিত্র, *আপিলা চাপিলা*, আনন্দ, কলকাতা, ২০১৫

7. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *খোয়াবনামা*, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ১৯৯৮

8. আবু রুশ্‌দ্‌, *আত্মজীবনী*, এ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ১৯৯৮

9. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার-দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ২০১৩

10. আবুল হোসেন, *আর এক ভুবন*, অবসর, ঢাকা, ২০০৫

11. বিমল মিত্র, *সাহেব বিবি গোলাম*, নিউএজ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৬৩

12. গোপাল চন্দ্র মৌলিক, *দেশভাগ ও ননীপিসিমার কথা*, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১১

13. জাগরী বন্দ্যোপাধ্যায়, ''মেয়েলি জীবন, ভাগাভাগির পরের যুগ'', *দেশভাগ-স্মৃতি আর স্তব্ধতা*, সম্পা- সেমন্তী ঘোষ, গাঙচিল, কলকাতা, ২০০৯

14. জ্যোতির্ময়ী দেবী, *এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা সংকলন, জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯১

15. তপন রায়চৌধুরী, *বাঙালনামা*, আনন্দ, কলকাতা, ২০১০

16. তপন রায়চৌধুরী, *রোমন্থন অথবা ভীমরতিপ্রাপ্তর পরচিরতচর্চা*, আনন্দ, কলকাতা, ২০১৪

17. দীনেশ চন্দ্র দেবনাথ, *কত কথা কত স্মৃতি*, শুদ্ধস্বর, ঢাকা, ২০১০

18. দেবেশ রায় সম্পাদিত *রক্তমণির হারে*, সাহিত্য অকাদেমী, কলকাতা, ২০১১

19. নারায়ণ সান্যাল, *অরণ্যদণ্ডক*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০২২

20. নারায়ণ সান্যাল, *বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্প*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১২, পৃ-৪২

21. নারায়ণ সান্যাল, *বল্মীক*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৯

22. নীলিমা দত্ত, *উজান স্রোতে*, মাইন্ডস্কেপ, কলকাতা, ২০০৭

23. প্রফুল্ল রায়, *কেয়াপাতার নৌকা*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০২১

24. মণিকুন্তলা সেন, *সেদিনের কথা*, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৩

25. মধুময় পাল সম্পাদিত, *দেশভাগ বিনাশ ও বিনির্মাণ*, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১১

26. মনোরঞ্জন ব্যাপারী, *ইতিবৃত্তে চন্ডাল জীবন*, দে পাবলিকেশন্স্, কলকাতা, ১৪২৬

27. মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *ভেদ বিভেদ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৪

28. মিহির সেনগুপ্ত, *উজানি খালের সোঁতা*, আনন্দ, কলকাতা, ২০০৭

29. যতীনবালা, ''যশোরের স্মৃতি ও উদ্বাস্তু ক্যাম্পের জীবন'', *পার্টিশন সাহিত্য দেশ-কাল-স্মৃতি*, সম্পা- মননকুমার মণ্ডল, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১৪

30. রাহুল রায় সম্পাদিত, *পশ্চিম থেকে পূর্ববঙ্গ দেশবদলের স্মৃতি*, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১৫

31. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, *তুঙ্গভদ্রার তীরে, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয়খণ্ড*, আনন্দ, কলকাতা, ১৪০৪

32. শামসুর রাহমান, *কালের ধুলোয় লেখা, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০০৮*

33. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৩

34. সনজীদা খাতুন, *স্বাধীনতার অভিযাত্রা*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭

35. সাইদা খানম, *স্মৃতির পথ বেয়ে*, যুক্ত, ঢাকা, ২০১৩

36. সুনন্দা সিকদার, *দয়াময়ীর কথা*, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১০

37. হাসান আজিজুল হক, *আগুনপাখি*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৪

38. Jhumpa Lahiri, *The Namesake,* 4th Estate, London, 2019

39. Amitava Ghosh, *The Shadow Lines,* Penguin Books, New Delhi, 2019

সহায়ক গ্রন্থ

1. অনির্বাণ দাশ, ''ভূমিকা'', ১৯৭০, রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়, চর্চাপদ, কলকাতা, ২০১৪

2. অর্পিতা বসু সম্পাদিত, *উদ্বাস্তু আন্দোলন ও পুনর্বসতি সমসমায়িক পত্র-পত্রিকায়*, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১৩

3. অরুণ কুমার বসু, *নজরুল জীবনী*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০০

4. অশীন দাশগুপ্ত, *প্রবন্ধ সমগ্র*, আনন্দ, কলকাতা, ২০০০৮

5. আনিসুজ্জামান, *বাঙালি ও বাংলাদেশ*, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৪২১

6. আবু আল সাঈদ, *ফজরুল রহমান অনুদার ইতিহাসের একদশক ১৯৩৭-৪৭*, আগমনী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭

7. আমিনুল ইসলাম, ''রবীন্দ্রমানস ও মুসলিম সমাজ'', *ভাবে অনুভাবে রবীন্দ্রনাথ*, সম্পা-সিদ্ধার্থরঞ্জন চৌধুরী ও অমিতাভ চক্রবর্তী, একুশে, কলকাতা, ২০১১

8. আহমদ রফিক, *দেশবিভাগ : ফিরে দেখা*, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৪

9. গোলাম খুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, অবসর, ঢাকা, ২০১২

10. তাপস ভৌমিক সম্পাদিত, *কোরক সাহিত্য পত্রিকা বাংলা আত্মজীবনী, স্মৃতিকথা*, কলকাতা, ২০০৯

11. তারক সরকার, *বাংলা উপন্যাসে দেশভাগ-দেশত্যাগ*, অরুণা প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৯

12. দেবেশ রায়, ''ভূমিকা', *রক্তমণির হারে*, সম্পা- দেবেশ রায়, সাহিত্য অকাদেমী, কলকাতা, ২০১১

13. নির্মল কুমার বসু, *বিয়াল্লিশের বাংলা*, কারিগর, কলকাতা, ২০১২

14. ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *দেশবিভাগ পশ্চাৎ ও নেপথ্য কাহিনী*, আনন্দ, কলকাতা, ২০১০

15. মননকুমার মণ্ডল সম্পাদিত, *পার্টিশন সাহিত্য দেশ-কাল-স্মৃতি*, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১৪

16. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ, ঢাকা-কলকাতা কেন্দ্রিক শতবছরের রাজনীতি ও হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক*, কথামেলা, ঢাকা, ২০১০

17. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্ররচনাবলী, ২য়, ৫ম ও ১০ম খণ্ড*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯৬৬, কলকাতা, ১৩৮৩

18. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *শরৎ রচনাবলী*, ৩য় খণ্ড, শরৎ সমিতি, কলকাতা, ১৩৮৩

19. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, *পলাশ থেকে পার্টিশান*, অনুবাদ-কৃষ্ণেন্দু রায়, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, কলকাতা, ২০১২

20. সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, *দেশভাগ দেশত্যাগ*, অনুষ্টুপ, কলকাতা, ২০০৭

21. সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, *দেশভাগ স্মৃতি আর সত্তা*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০১

22. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাদেশের ইতিহাস, ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড*, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, এশিয়াটিক প্রেস, ঢাকা, ১৯৯৩

23. সেমন্তী ঘোষ সম্পাদিত, *দেশভাগ স্মৃতি আর স্তব্ধতা*, গাঙচিল, কলকাতা, ২০০৯

24. Ahmed Kamal, *State Against the Nation,* The University Press Limited, Dhaka, 2009

25. Bashabi Fraser, “Introduction”, *Bengal Partition Stories,* edited by Bashabi Fraser, Anthem Press, London, 2006

26. Benedict Anderson, *Imagined Communities,* Verso/New Left Books, UK/USA, 1991

27. Debjani Sengupta, *The Partition of Bengali Fragile Borders and New Identities,* Cambridge University Press, New Delhi, 2016

28. Gyanendra Pandey, *Remembering Partition,* Cambridge University Press, Cambridge, 2001

29. H. Abida, “Diaspora in Jhumpa Lahir’s the Namasake”, www.jetir.org.2021 [accessed on 27.10.22]

30. Jasodhara Bagchi and Subhoranjan Dasgupta edited, *The Trauma and the Triumph,* STREE, Kolkata, 2007

31. Joya Chatterjee, “Right or Charity”, *The Partitions of Memory,* Edt – Suvir Kaul, Permanent Black, New Delhi, 2001

32. Joya Chatterjee, *The Spoils of Partitions,* Cambridge University Press, New Delhi, 2007

33. Joya Chatterjee, *Bengal Divided,* Cambridge University Press, Cambridge, 1994

34. Louise Harrington, “An – Other space : Diasporic Responses to Partition in Bengal”, https://core.ac.uk, [accessed on - 29.10.2022]

35. Maurice Halbwachs, *The Collective Memory,* translated-Francis J. Ditter and Vida Yazdi Ditter, New York : Harber Coloplon 1950, reprinted 1980

36. Md. Shahabul Haque, “Victim Diaspora — Ethinic Minority Groups in South Asia’, The case of ‘Biharis’ and ‘Rohingas’ in Bangladesh”, 2013,

www.researchgate.net/publication/316859928 [accessed on : – 27.10.22]

37. Pablo Base, “Dilemas of Diaspora : Partition, Refugees, and the Politics of “Home”, https://refuge.journals.yorku.ca,www:academia.edu, [accessed on 27/10/2022]

38. Paul Recoeur, *Memory, History, Forgetting,* The University of Chicago Press, Chicago, 2004

39. Sanjeev Khobargade, Dr. Hitendra B. Dhote, “Homi K. Bhaba’s Thoughts of Postcolonialism and It’s Impact on Indian Lierature and Writers”, 2017, www. puneresearch, com/english, [accessed on : – 27.10.2022]

40. Sankaran Krishna, *Postcolonial Insecurities, India, Sri Lanka, and the Question of Nationhood,* Oxford University Press, New Delhi, 2002

41. Sekhar Bandyopadhyay, *Decolonizaiton in South Asia,* Orient Blackswan, Hyderebad, 2012

42. Sekhar Bandyopadhyay, *Caste, Culture and Hegemony,* Saga Publications, New Delhi, 2004